রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে
রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে
রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে

বরুণ সেনগুপ্ত

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামারচণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৪৪

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রক : শিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০ বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা ৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

জ্যেঠামণি হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
ও
মণিমা হেমলতা সেনগুপ্তের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে

লেখকের অন্যান্য বই

পালা বদলের পালা *

সব চরিত্র কাল্পনিক *

বি-পাকিস্তান *

চিত্র পরিচিতি

এক। চারু মজুমদার

দুই। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিচ্ছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়

তিন। শ্রীজ্যোতি বসু শপথ নিচ্ছেন।

চার। দ্বিতীয় ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ নেওয়ার সময় রাজভবনের ভিতর জনতার ভীড়।

পাঁচ। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নেওয়ার পর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ নির্দেশ দিচ্ছেন।

ছয়। রাজ্যপালের শপথ নিচ্ছেন শ্রীধাওয়ান।

সাত। মুখ্যমন্ত্রীর শপথ নিচ্ছেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

আট। কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের কোয়ালিশন মন্ত্রীরা—শপথ নেওয়ার পর মহাকরণে।

লেখকের বক্তব্য

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে আমি যেসব মন্তব্য লিখেছি এই বই তার সংকলন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্তব্যের মূল্য তাৎক্ষণিক। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত মন্তব্যের কোন সংকলনের ঐতিহাসিক মূল্যও থাকতে পারে। তাছাড়া একটা বিশেষ সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পরিচয়ও মেলে। প্রধানত সেইজন্যই এই সংকলন প্রকাশিত। লেখাগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ার জন্যে আমি আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

বরুণ সেনগুপ্ত

দুর্নীতির প্রশ্নে

নামকরা দুটি সংবাদপত্রে মজার দুটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে সম্প্রতি। একটির শিরোনামা: দি টেন মোস্ট সেক্রেড কাউজ অব আমেরিকা। বাংলায় তর্জমা করলে, আমেরিকার পবিত্রতম দশটি গরু। আর একটির: দি টেন লিস্ট সেক্রেড কাউজ অব আমেরিকা। অর্থাৎ আমেরিকার সবচেয়ে কম পবিত্র দশটি গরু। প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এল এ টাইমস-এ। দ্বিতীয়টি তার কিছুদিন পরেই নিউইয়র্কের টাইমস-এ।

প্রবন্ধ দুটি একে অপরের পরিপূরক। প্রথমটি লিখেছিলেন এক মহিলা। বক্তব্য ছিল: অবাধ সমালোচনার দেশ আমেরিকায়ও এমন দশজন মানুষের নাম করা যায়, যাঁদের বিরুদ্ধে কেউ কোনও কথা শুনতে রাজী নন। সত্যি হলেও না। এদের বলা যেতে পারে মোস্ট সেকরেড কাউ, অর্থাৎ পবিত্রতম গরু। এই পবিত্রতম গরুদের গায়ে কেউ হাত দিতে গেলে বিপদ অনিবার্য—এমন কি মারধরেরও ভয় আছে।

এই বক্তব্যের খেই ধরেই নিউইয়র্ক টাইমস-এর প্রবন্ধ। লেখকের বক্তব্য হলো: সত্যিকথা, আমেরিকায় পবিত্রতম দশটি গরু আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আমেরিকাতেই আবার সবচেয়ে কম পবিত্র দশটি গরুও আছে। সত্যি হলেও যেমন পবিত্রতম গরুর সমালোচনায় বিপদে পড়তে হয়; তেমনি অকাট্য প্রমাণ থাকলেও সবচেয়ে কম পবিত্র গরু দশটি সম্পর্কে খুব কম লোকই প্রকাশ্যে ভাল কথা বলতে সাহস পান! যদি বা কেউ সাহস করে বলতেও যান তো বলতে হয় আগে দশটা কথা জুড়ে দিয়ে। যেমন ধরুন, আমেরিকার দশটির একটি সবচেয়ে কম পবিত্র গরু প্রেসিডেণ্ট জনসনের দৃঢ়তা

সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান। শুরু করতে হবে এইভাবে—যদিও লোকটা টেকসান কাউবয় গোছের, যদিও তাঁর বউ হরেক রকম ব্যবসা ফেঁদে অনেক পয়সা গুছিয়েছে ; যদিও ভিয়েৎনামে সব ভণ্ডুলের জন্য দায়ী এই মানুষটিই, তবু বলতে হবে ভদ্রলোকের দৃঢ়তা আছে। লেখক বলছেন, এত 'যদিও' বলেও শেষ দুটি কথার জন্য আপনি বিপদে পড়তে পারেন। আপনার শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই খোঁচা দিয়ে বলবেন ঃ বেশ মজার মজার কথা শুনছি তো তোমার মুখে, জনসন আবার ভদ্রলোক, তাঁর আবার দৃঢ়তা !

* * *

অবশ্য, এই পবিত্রতম বা সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু খুঁজে বের করে তাঁদের সম্পর্কে একটা যুক্তিহীন একরোখা মনোভাব গড়ে তোলায় মার্কিনীদের কোনও একচেটিয়া অধিকার নেই। গণতান্ত্রিক সর্বদেশে সর্বকালে কম-বেশী এমন কিছু পবিত্রতম বা সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু থাকবেই। নিশ্চয়ই এই মনোভাব গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর। কিন্তু তবু থাকবে, তবু আছে।

যেমন আছে আমাদের দেশেও, এরাজ্যেও। এদেশেও এরাজ্যেও কিছু পবিত্রতম গরু আছেন প্রকাশ্যে যাঁদের সমালোচনা করা মানে বিপদ ডেকে আনা। আবার এমন কিছু সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু আছেন, যাঁদের সম্পর্কে সত্যি জেনেও অনেক ভণিতা করেও আপনি প্রকাশ্যে বিনা বাধায় কোনও ভাল কথা বলতে পারবেন না।

আগেই বলেছি, জনগণের এই মনোভাব গণতন্ত্রের পক্ষে, দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আর এই একরোখামি বা একগুঁয়ে মনোভাব যত কঠোর হয় যত নির্দয় বা অসহিষ্ণু হয় ক্ষতির পরিমাণ ততই বাড়ে। স্বাধীন চিন্তা বা বিচার ক্ষমতার মূলে গিয়ে ঘা পড়ে, ভালমন্দ ভেবে দেখার সুযোগও তেমন থাকে না।

ফলে সবসময়ই যে পবিত্রতম গরুদের সুবিধা হয়, তেমন

নয়। বরং অনেক সময়ই এই মনোভাব তাঁদের বিপদ ডেকে আনে। কারণ আজ যিনি পবিত্রতম কিছুদিন পরে হয়ত তিনিই হয়ে দাঁড়াবেন সবচেয়ে কম্‌-পবিত্র। জনমনে এই পরিবর্ত্তনটা আসেও খুব ধীরে এবং সংগোপনে। পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ যেদিন ঘটে, সেদিন পবিত্রতম গরুও আর চট করে হাল ঘোরাবার সময় বা সুযোগ পান না। বহুকাল পবিত্রতম গরু হওয়ার আত্মম্ভরিতায় বিভোর তিনিই যে ততদিনে সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু।

এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বেশ কিছুদিন যাবৎ কংগ্রেস ছিল এমনি একটি পবিত্রতম গরু। দেশবাসীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসের কোনও সমালোচনা শুনতে রাজী হতেন না। যিনিই তা করতে গিয়েছেন, তিনিই জোর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। ফলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশবাসীরই বিপদ বেড়েছে। দেখা গিয়েছে এই সুযোগে কংগ্রেসের মধ্যে এমন সব লোক বাসা বেঁধেছেন, যে কোনও প্রগতিশীল সমাজে যাঁরা অচল ও অপাংক্তেয়; বা কংগ্রেসের নামে এমন সব কাজ হয়েছে যা দেশ ও দশের পক্ষে চরম ক্ষতিকর, অথবা পবিত্রতম গরু হওয়ার সুযোগে কংগ্রেস বহু ব্যাপারে শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েই দিন কাটিয়ে গিয়েছে।

খুব ধীরে এবং সংগোপনে কিন্তু এই পরিস্থিতিটা একেবারে পালটে গিয়েছে। খুব কম কংগ্রেস নেতাই টের পেয়েছেন ধীরে ধীরে এরকম নিঃশব্দে তাঁদের পায়ের নীচের জমি সরে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন তাঁরা দেখলেন, কংগ্রেসই দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যে সবচেয়ে কম-পবিত্র গরু! অবস্থাটা আজ এমন দাঁড়িয়েছে যে আপনি প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সম্পর্কে একটি খারাপ কথা বলুন, সঙ্গে সঙ্গে আরও দশজন এগিয়ে আসবেন আরও বিশরকম গালিগালাজ দিতে। আবার আপনি অনেক যদি-র পর কংগ্রেস সম্পর্কে একটি ভালকথা বলতে যান, বলে দেখুন 'অনেক না করলেও দেশের অগ্রগতির জন্য ওরা

অন্তত কিছু করেছেন', সবাই দালাল বলে আপনার মুখে কালি দেবে।

দুর্নীতির প্রশ্নেও দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এমনি একটা সবচেয়ে-কম পবিত্র গরুর মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আপনি যে-কোনও কংগ্রেস নেতা বা মন্ত্রীর নামে চুরির অভিযোগ আনুন, প্রমাণ থাক আর নাই থাক, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সমর্থক পেয়ে যাবেন। তাঁদের দুর্নীতির ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণও শুনতে পাবেন। আর বলতে যান: আমার অবশ্য মনে হয় না সবাই খারাপ। এই ধরুন, অমুক চন্দ্র অমুক, যদি দুর্নীতিবাজ বা স্বজন পোষকই হবেন তবে নিজের ছেলের জন্য তো একটা কিছু করবেন। কৈ তা তো করেন নি। তাঁর যোগ্য ছেলে চাকরি করে চারশ মাইল দূরে এক জঙ্গলে। আপনি এতটা বলার সুযোগ পাবেন কিনা সন্দেহ···তার আগেই প্রচণ্ড বাধা আসবে।

কিন্তু সব কংগ্রেসীই কি দুর্নীতিগ্রস্ত? জনসাধারণ বলতে যাঁদের আমরা সাধারণত বুঝি তাঁদের একটা বিরাট অংশের অন্তত ধারণা তাই। যে কোনও কংগ্রেস নেতা সম্পর্কে যেকোনও অপবাদ দিন তাঁরা সোৎসাহে মেনে নেবেন। তাঁরা আরও মনে করেন, এদের রাজত্বের অলিগলিতে দুর্নীতি গিজগিজ করত। তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস, সততা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা করলে এই সব দুর্নীতি এখন ধরাও যায়। তাঁরা চান, ধরে ধরে সেইসব দুর্নীতিবাজদের কঠোর সাজা দেওয়া হোক।

এইখানে এসে পড়েন নতুন সরকার। জনসাধারণের আশাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের। তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এখন তাঁদের সুযোগ ও সুবিধা রয়েছে সব দুর্নীতির ইতিহাস খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাজা দেওয়ার। যখন তাঁরা শুধু বিরোধী ছিলেন, তখন অভিযোগ তোলাই ছিল তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। এখন কিন্তু ভূমিকা একেবারে উল্টো। এখন দায়িত্ব দুর্নীতি রোধের।

দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দেওয়ার। তাই নতুন সরকারকে এখন আর শুধু সবচেয়ে কম-পবিত্র গরুর মনোভাব নিলে চলবে না। তাঁকে বা যাঁদের সবচেয়ে-কম-পবিত্র গরু বলা হয়েছে বা হচ্ছে, তিনি বা তাঁরা কেন সবচেয়ে-কম-পবিত্র, তাও প্রমাণের দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদেরই। এখন এমন একটা সময় এসেছে, যখন তাদের হয়ে বলতে হবে যতটা শোনা গিয়েছে বা যায় এবং আমরা যতটা বলেছি বা বলি, কংগ্রেসীরা ততটা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না ; না হয় সবকিছু আদালতে প্রমাণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই কর্তব্য বা দায়িত্ব যদি তাঁরা যথাযথভাবে পালন করতে না পারেন, তাহলে জনসাধারণের মনে আবার একটা বিরাট হতাশা আসবে এবং সে হতাশার পরিণতি গোটা রাজ্যের পক্ষেই খুব খারাপ হতে বাধ্য।

* * *

বছর তিনেক আগে একবার মেদিনীপুর যাচ্ছিলাম। মেদিনীপুর জেলাকংগ্রেস কর্মী সম্মেলন 'কভার' করতে। সম্মেলনে যোগ দিতে কোলকাতা থেকে যাচ্ছিলেন তিনজন কংগ্রেস নেতা : শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। হাওড়া স্টেশনে পেঁৗছে দেখলাম, ট্রেন তখনও ইন করেনি এবং তিন নেতাই প্লাটফর্মে বসে। নেতাদের কাছে এগিয়ে দিয়ে দেখি শ্রীদেশাই, শ্রী মুখোপাধ্যায়ের পাঞ্জাবিটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমিও তাকালাম। তাকিয়ে দেখার মতই ব্যাপার—শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গোটা পাঞ্জাবিটার যে রঙ, পকেটগুলি সে রঙের নয়, পকেটগুলি বসানোও একটু বেখাপ্পাভাবে। শ্রীদেশাই একটু নড়ে চড়ে বসতেই শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বললাম : মোরারজী ভাই এতক্ষণ নিশ্চয়ই আপনার দর্জির তারিফ করছিলেন।

শ্রীমুখোপাধ্যায় হেসে উত্তর দিলেন : তার মানে আমারই তারিফ করছিলেন। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমিই আমার দর্জি।

সবই নিজের হাতে সেলাই করি। তাই মাঝে মাঝে একটু বাঁকাচোরা হয়ে যায়; কাপড়ের রঙ সব সময় মেলে না।

এই সরল, নিরহঙ্কার, নির্লোভ মানুষটি যেদিন পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্রিয়াকলাপেও তার ছাপ পড়ল। চলে গেল শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ, পাইলট ভ্যান; উর্দিপরা চাপরাশি ও সাদা পোষাকের সিকিউরিটি ম্যানদের ছড়াছড়ি। এপথে শ্রীমুখোপাধ্যায় সরকারের সর্বশেষ হুকুম: দেশে যখন এত অভাব এত দৈন্য, তখন সরকারী পয়সায় ডিনার লাঞ্চ টি-রও ছড়াছড়ি চলবে না—বন্ধ করতেই হবে।

এরকম একটা হুকুম অবশ্য চীনা হামলার পর থেকে কংগ্রেস সরকারও দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক সময় নিজেরাই তা মেনে চলেন নি। বলতে গেলে বিলাসব্যসন প্রায় পুরোদমেই চলেছিল।

সরকার বদলে আমলা বদল

পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একটা বড় রকমের অদল-বদল হতে চলেছে। সম্ভবত আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভায় এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনাও হবে। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাইটার্স বিল্ডিংসের আঠারটি ঘরে নেমপ্লেট পাল্টে ছিল, কিছুদিনের মধ্যে আবার তেমনি অন্তত একডজন ঘরের প্লেট বদলাবে। সেবার পাল্টেছিল মন্ত্রীদের নাম, এবার বদলাবে কিছু কমিশনার, সেক্রেটারী ও জয়েন্ট সেক্রেটারীর ফলক।

অবশ্য সরকার যখন পাল্টেছিল, তখনই বোঝা গিয়েছিল আমলা-কুলেও কিছুটা অদল-বদল অনিবার্য। সাধারণত এটা হয়েই থাকে। উপরতলার সর্বোচ্চ ধাপে পরিবর্তন হলে কাছাকাছি অন্যান্য স্তরেও কিছুটা ওলট-পালট হয়। মন্ত্রীভেদে প্রায়ই আমলাও পালটায়। এবারও পাল্টাচ্ছে।

তবে, এটা সব সময় কোনও নীতিগত অদল-বদল নয়। আমাদের প্রচলিত প্রশাসনিক কাঠামোয় মন্ত্রী স্থির করেন নীতি। সেক্রেটারি (অধুনা বহু ক্ষেত্রেই কমিশনার) সেই নীতিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরী করেন। আর তা কার্যকর করেন ডাইরেক্টর। তাই কাকে কাকে দিয়ে তিনি যথাযথভাবে নীতি কার্যকর করতে পারবেন, সে ব্যাপারে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও চূড়ান্তভাবে মুখ্যমন্ত্রীই স্থির করেন, কোন্ দপ্তরে কোন্ অফিসারকে দেওয়া হবে।

* * *

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন সরকার গঠন করলেন, তখনও পশ্চিমবঙ্গের আমলা-তন্ত্রের উঁচু মহলে

কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। আবার শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরও কতকগুলি অদল-বদল হয়। অবশ্য এবার পরিবর্তনটা যেমন ব্যাপক ও বিস্তারিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে, তেমন কোনও দিনই হয়নি। এবার নাকি অধিকাংশ সেক্রেটারী-কমিশনারই বদলে যাচ্ছেন।

প্রশ্ন উঠবে, এবার হঠাৎ এই ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ল কেন? রাইটার্স বিল্ডিংসে মাস দুয়েকও বসতে না বসতেই অধিকাংশ মন্ত্রীই কেন মনে করছেন তাঁর দপ্তরের কমিশনার বা সেক্রেটারিকে পাল্টানো দরকার।

দুটো উত্তর শোনা যাচ্ছে : (এক) কিছু অফিসার বেশ কিছুদিন যাবৎই কয়েকটি দপ্তরে বা পদে একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসেছিলেন। নতুন মন্ত্রিসভা তাঁদের বদলি চান। (দুই) সব মন্ত্রীই তাঁর 'মনের মত' এবং 'আরও ভাল' কমিশনার বা সেক্রেটারী চান।

নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম অভিযোগের কিছুটা ভিত্তি রয়েছে। তাঁরা যোগ্য না অযোগ্য সে প্রশ্নে যাব না, কিন্তু এ সত্য কে অস্বীকার করবেন যে দু একজন কমিশনার দীর্ঘকাল যাবৎ একই পদে অধিষ্ঠিত। এরকম ঘটনা কিন্তু ইংরেজ আমলেও দেখা যেত না। দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তে চিরস্থায়ী স্বার্থ গড়ে ওঠে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা প্রশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই বদলি প্রথা।

কিন্তু সব মন্ত্রীই যদি 'মনের মত বা আরও ভাল' কমিশনার বা সেক্রেটারি চান এবং সেজন্য যদি উচ্চতম পর্যায়ে ঘন-ঘন রদ-বদল হয়, তাহলে প্রশাসনের মঙ্গল হতে পারে না। 'চিরস্থায়ী ব্যবস্থা' যেমন ক্ষতিকর, তেমনি সর্বনাশা 'চির অস্থির পরিস্থিতি।' মন্ত্রীরা সবসময় 'মনের মত' 'আরও ভাল' অফিসার চাইলে প্রশাসনে বেশ কিছুটা অস্থিরতা আসবেই।

* * *

আরও একটা বিষয় পরিষ্কার। প্রচলিত রীতিতে মন্ত্রীরা নীতি

নির্ধারণ করেন—কর্মীরা তা কার্যকর করেন। কর্মী বা অফিসারদের নীতি নির্ধারণের কোনও অধিকার নেই। সরকার যে নীতি যে ভাবে কার্যকর করতে চান, অফিসার বা কর্মীরা সেই নীতি সেইভাবে কার্যকর করতে বাধ্য। এ অভিযোগ অবশ্য কংগ্রেস আমলেও শোনা গিয়েছে যে আমলাতন্ত্র সরকারী নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী বা উদ্যোগী নন্। উল্টে তাঁরা পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেন। কিন্তু কংগ্রেস সরকার তার উনিশ বছরের রাজত্বে আমলা-তান্ত্রিক নিয়মকানুন পাল্টাবার তেমন চেষ্টা করেননি। নিয়ম কানুন যেমন ছিল তেমনই থেকে গিয়েছে। মাঝে মাঝে শুধু কিছু নেতা বা মন্ত্রী আমলা-তন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন এবং খুব বেশী হলে কিছু অফিসার বা কর্মীকে বদলি করেছেন। নানা দিক দিয়েই এর ফল খারাপ হয়েছে। বিক্ষুব্ধ হতমান অফিসার বা কর্মীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই গিয়েছে এবং প্রশাসনের পক্ষে ক্রমে তাঁরা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমলাতন্ত্রে ওলটপালট করার সময় যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রশাসনিক সমস্যাবলীর এই দিকটাও মনে রাখলে ভাল হয়। বিক্ষুব্ধ অফিসারের সংখ্যা বাড়লে সরকারেরই ক্ষতি হবে।

অবশ্য অফিসাররা রাতারাতি তাঁদের মত পাল্টে কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী বা বাংলা কংগ্রেসবাদী হয়ে যাবেন সেটা আশা করা ভুল। লক্ষ্যণীয়, অফিসাররা সরকার নির্দিষ্ট পথ ধরে চলছেন কিনা। যদি তা না চলেন, তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আর যদি তেমন কোনও স্পষ্ট অভিযোগ মন্ত্রীদের না থাকে, তাহলে অহেতুক অফিসার বা কর্মীদের অপদস্থ করা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়।

ব্যক্তিগতভাবে কোন মন্ত্রী তাঁর দপ্তরের কোন অফিসার সম্পর্কে কী মনোভাব পোষন করেন জানি না। তবে এ আমলে এখনও পর্যন্ত দু'জন কমিশনার ছাড়া আর কারো সঙ্গে কোনও মন্ত্রীর কাজ-

কর্মের ব্যাপারে কোনও মতপার্থক্য ঘটেছে বলে শুনিনি। এবং সংশ্লিষ্ট সেই অফিসার দুজন নিজ উদ্যোগেই বদলির আবেদন করেছেন।

* * *

এই প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীদের কাছ থেকে কর্মী বা অফিসাররা অহেতুক প্রশ্রয় পেলে যেমন প্রশাসন দুর্বল হয়, তেমনি মন্ত্রীরা অফিসার বা কর্মীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের জবাব না দিলেও শাসন ব্যবস্থার ক্ষতি হয়। বহুক্ষেত্রেই সরকারী কর্মীদের ব্যক্তিগত অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সুযোগ নেই। বিশেষ করে অভিযোগ যখন ওঠে আইন সভায়।

বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন, তেমনি অভিযোগ তোলেন অফিসারদের বিরুদ্ধেও। এর কিছু সত্য, কিছু অর্ধসত্য, কিছু সম্পূর্ণ অসত্য। এবং দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সম্পূর্ণ অসত্য অভিযোগের হার দিন দিনই বাড়ছে। প্রাক্তন সরকার বিভিন্ন অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণের প্রশ্নে একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ত মনোভাব অবলম্বন করতেন। ফলে পরিস্থিতিটা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। আশা করি, নতুন সরকার তা করবেন না। অভিযোগ সত্য হলে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। অসত্য হলে তাও জনসাধারণকে জানাবেন। অফিসারদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত : সততা, কর্মনিষ্ঠা ও কর্মক্ষমতা।

অনেক সময় সরকারী কাজকর্মের ব্যাপারেও অফিসাররা অসত্য অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন না। এসব ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা হয় খুব বেশি শোচনীয়। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের আমলের দুটি উদাহরণ দেয়া যাক।

গত বছর খাদ্য আন্দোলনের প্রথম হরতালের দিন কেন জোর করে শহরতলির ট্রেনগুলি চালানো হয়েছিল, সে নিয়ে বিতর্কের ঝড়

বয়ে গিয়েছে। অনেকেই বলেছিলেন, তিন জনের পরামর্শে এই ভুলটা করেছিলেন সরকার। এই তিনজন অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারি শ্রীএম এম বসু, হোম সেক্রেটারি শ্রীকে কে রায় এবং আই জি পুলিশ শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁরাই জোর করে ট্রেন চালাতে বলেছিলেন। অভিযোগটি অসত্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ তিনজন অফিসার আজও তার প্রতিবাদ করার সুযোগ পাননি। আসলে ওঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন "জোর করে ট্রেন চালানো উচিত হবে না।" এবং মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন, "আপনারা না রাজী থাকলে আমি সৈন্য দিয়ে ট্রেন চালাব।"

সম্প্রতি ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ওয়াটার এ্যাণ্ড স্যানিটেশন অথরিটির চেয়ারম্যান শ্রীআর গুপ্তকে খাদ্যমন্ত্রীর 'পরামর্শদাতা' নিয়োগ নিয়েও রাইটার্সে একটা তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, ঐ চেয়ারম্যান পদ সর্বসময়ের হওয়ার পরও আইন দপ্তর শ্রীগুপ্তকে 'পরামর্শদাতা' নিয়োগের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন কি করে? আইন দপ্তরের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ অসত্য, লিগাল বিমানরেনসারের, সেকথা বলার সুযোগ নেই। আসলে তিনি বলেছিলেন, পদটি অবৈতনিক হলেও সি এম ও সি এ-র চেয়ারম্যানকে খাদ্যদপ্তরের পরামর্শদাতা নিয়োগ করা আইন বিরুদ্ধ কাজ। এ ঘটনা মাত্র সপ্তাহ তিনের।

নীতিগত গোঁড়ামি বাধা নয়

অনেকেরই আশঙ্কা ছিল, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার কতক-গুলি নীতিগত গোড়ামি নিয়ে চলবেন এবং ফলে সরকারী কাজকর্মে চরম অসুবিধা দেখা দেবে। তাঁরা ভেবেছিলেন, সরকারের মধ্যে যখন মার্কসবাদী দলও রয়েছেন, আর মার্কসবাদীদের কাছে যখন নীতির মর্যাদা খুব বেশী, তখন স্রেফ 'অবস্থা মত ব্যবস্থা' নিতে এ সরকার কিছুতেই পারবেন না। দলগত বা নীতিগত গোড়ামির ফলে সরকারী কাজকর্মের বহুক্ষেত্রেই অচল অবস্থা সৃষ্টি হবে।

এ আশঙ্কা যে অমূলক, দু মাসের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট সরকার তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। দলগতভাবে যে যা বলুন পার্টি প্লাটফর্মগুলি থেকে নীতি বা ইজমের কথা যত জোরেই ঘোষিত হোক, সরকার কিন্তু প্রায় সকল ব্যাপারেই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কোথাও নীতিগত গোঁড়ামি বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। খাদ্য, পরিবহণ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি বড় বড় প্রশ্নে তাঁরা অবস্থা যেমন বুঝেছেন তেমনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এ ব্যবস্থাগুলি ভুল না নির্ভুল, সে বিতর্ক উঠতে পারে। অনেকে মনেও করতে পারেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার অবস্থা যেমন বুঝেছেন আসলে অবস্থাটা ঠিক তেমন নয়। কিন্তু এমন অভিযোগ কেউ তুলতে পারবেন না, দলগত নীতিগত গোঁড়ামির ফলে সরকারী কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছে বা কোথাও কাজ আটকে যাচ্ছে!

* * *

ধরুন খাদ্যের প্রশ্ন। দলগতভাবে কোন্ দলের খাদ্যনীতি কী সে প্রশ্নের বিচারে কখনও সরকারী খাদ্যনীতি আটকে থাকেনি। বিরোধী পক্ষে থাকতে তাঁরা খাদ্যের ব্যাপারে যেসব কথা বলেছিলেন বা যেসব দাবি রেখেছিলেন সেগুলিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টাও কোনও

দলের পক্ষ থেকে হয়নি। এমন কি, যুক্তফ্রণ্টের আঠার দফা কর্মসূচীতে যে খাদ্যনীতি ঘোষিত হয়েছিল বা মার্চের গোড়ায় ময়দানের জনসভায় খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ যেসব কথা বলেছিলেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকার তার আক্ষরিক ব্যাখ্যা ভরসা করেও কাজে এগোতে যাননি।

বহু বিবেচনার পর ২৯শে মার্চ ডঃ ঘোষ রাজ্য বিধান সভায় নতুন সরকারের যে খাদ্যনীতি ঘোষণা করলেন তাতে খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণের গোঁড়ামির কোনও ছাপও কেউ খুঁজে বের করতে পারে নি। অথচ খাদ্যশস্যের পাইকারি ব্যবসা সম্পুর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কথা যুক্তফ্রণ্ট জন্ম থেকেই বলে এসেছেন। রেশনে ২২০০ গ্রাম খাদ্যশস্য দেওয়া বা মফঃস্বলে নিয়মিত আংশিক রেশন সরবরাহের দাবিতেও কোনও অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। সরকার শুধু অবস্থা উপযোগী ব্যবস্থাগুলিই গ্রহণ করলেন।

অনেক পর্যালোচনার পর যুক্তফ্রণ্ট যে খাদ্যনীতি ঘোষণা করলেন সেটাকেও মন্ত্রিসভা অবুঝের মত আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করেননি এবং করছেনও না। ২৯ মার্চ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের নতুন খাদ্যনীতি ঘোষিত হয়। ২৯ এপ্রিলের মধ্যে সেই নীতির ছোট বড় অন্তত সাতটি সংশোধন হয়েছে। বিধান সভার খাদ্য বিতর্কের পরই সরকার তিন তিনটি সংশোধন গ্রহণ করেছেন। সরকার প্রথমে বলেছিলেন, লেভি তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু যখনই বুঝলেন, তাতে ধান চাল আদায় হবে না, তখনই নামে ঠিক তা না বলেও একধরনের লেভি চালু করলেন। সরকার প্রথমে জেলা বা আন্তঃজেলা কর্ডন তুলে দিয়ে রেশন এলাকা ছাড়া সর্বত্র ধানচাল অবাধ চলাচলের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝলেন, তার ফলে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে অমনি ধানচাল চলাচলের উপর কতকগুলি বাধা নিষেধ আরোপ করলেন।

অর্থাৎ, খাদ্যের প্রশ্নে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কোথাও কোনও দলগত

বা নীতিগত গোঁড়ামির প্রশ্ন তোলেননি। বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে যখন যেমন প্রয়োজন মনে করেছেন ব্যবস্থা নিয়ে চলেছেন। কোনও কোনও নিন্দুক অবশ্য বলার চেষ্টা করেছেন, এইসব পরিবর্তনের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতিও ক্রমেই শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের খাদ্যনীতির দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু এসব কথা বলেও কেউ বাস্তববাদী সরকারকে বিপথচালিত করতে পারছেন না।

পরিবহন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার আরও বাস্তববাদী। কংগ্রেস সরকার স্টেটবাসকে 'ডুবিয়ে' পরিবহন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ বানচাল করতে চেয়েছিলেন, ধীরে ধীরে প্রাইভেট বাসের হাতে আবার সবটা তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং 'টাকা খাওয়ার লোভে' তড়িঘড়ি ভারতরক্ষা আইনে কতকগুলি বেসরকারী বাসকে কলকাতায় চলাচলের পারমিট দিয়েছিলেন: ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা তার কিছু আগে এমন সব অভিযোগ তুলেছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখপাত্ররা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই সরকারই যখন দেখলেন, জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কয়েকটি রুটে স্টেটবাসের পরিবর্তে পুরোপুরি প্রাইভেট বাস চালানো প্রয়োজন এবং শহরে প্রাইভেট বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার তখনই সেই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা করলেন না। তাঁরা প্রয়োজন বোধে কংগ্রেসী পারমিটে-চলা প্রাইভেট বাসগুলির মেয়াদও চার মাস বাড়িয়ে দিলেন।

* * *

এবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রশ্ন। দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে চলেছে। গত দু মাসে অধিকাংশ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা অন্তত পঁচিশ ভাগ বেড়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এর ঘোরতর বিরোধী। ১৮ দফা কর্মসূচীতে তাঁরা ঘোষণাও করেছিলেন, দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি রোধের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন তাঁরা হঠাৎ কিছু একটা কড়া ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছেন না।

কারণ তাঁরা মনে করেন ওতে ফল হবে না। পূর্বতন সরকার যেমন ক্রেতাপ্রতিরোধ বা 'দমদম দাওয়াই' সমর্থন করেছিলেন, অথবা ভারতরক্ষা আইনে বহু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে ছিলেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকার তেমন কিছুও করছেন না। সমগ্র সমস্যাটি ধীরে সুস্থে বিচার করার জন্য তাঁরা একটি ক্যাবিনেট কমিটি নিয়োগ করেছেন। সেই কমিটি খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আসল কারণ কি? দ্রব্যাভাব ও ফাটকাবাজী—এই দুয়ের মধ্যে কোনটা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী?

বেবি ফুডের মূল্য বিনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গেও যুক্তফ্রণ্ট সরকার নীতি-গত গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। সরকার যে মুহূর্তে বুঝলেন দর নিয়ে কড়াকড়ি করলে বেবিফুডই পাওয়া যাবে না, অমনি মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার করলেন। ফলে বেবিফুডের দর শতকরা প্রায় কুড়িভাগ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বাজারে বেবিফুড আসার পথ এখন খোলা।

দুর্নীতি দমনের ব্যাপারেও সরকার চরম বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষমতা হাতে নিয়ে প্রাথমিক তদন্তের পর যখনই তাঁরা দেখলেন, মুখে দুর্নীতির অভিযোগ আনা যত সহজ কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করা ততটা নয়, তখনই এ ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করেন। অবশ্য তা বলে অবস্থা এমন নয় যে, দুর্নীতি দমনের ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছে। আসলে সব দুর্নীতির অভিযোগই সরকার বিচার করে দেখছেন এবং যেখানেই সম্ভব হবে দোষীকে সাজা দেওয়ার নীতিও গ্রহণ করেছেন! শুধু দুর্নীতি দমনের সেই উগ্র আবহাওয়াটা এখন বাস্তব প্রয়োজনেই একটু ঠাণ্ডা হতে দিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, যুক্তফ্রণ্ট সরকার যত সহজে গোঁড়ামি বর্জন করতে পেরেছেন ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত সব দল ততটা পারেনি। তাই দলীয় মুখপত্র বা পাত্রদের কণ্ঠে প্রায়ই নানা সরকারী সিদ্ধান্তের

সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। তাঁরা এখনও বহু ক্ষেত্রে দলগত নীতি-গত গোঁড়ামির পরিচয় দিচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ 'এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির' প্রধান কারণ হলো, দলীয় নেতারা সব সময় সব তথ্য জানতে পারছেন না। তাই বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের বুঝতে অসুবিধা, হচ্ছে সরকার কোন্ বিচারে কখন কোন সিদ্ধান্তটি নিচ্ছেন।

এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হওয়া উচিত। দলীয় নেতারাও যাতে সব তথ্য জানতে পারেন এবং সব সময় সরকারী সিদ্ধান্তের মর্ম বুঝতে পারেন তেমন ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মনে হয়, এজন্য 'সুপার ক্যাবিনেট' অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট কমিটিকে আরও একটু সক্রিয় করা অত্যাবশ্যক। 'সুপার ক্যাবিনেটে' সব দলের প্রতিনিধিই রয়েছেন। সেটা মূলত দলীয় সংগঠন। এমন একটা ব্যবস্থা কী হতে পারে না যে 'সুপার ক্যাবিনেট' অনুমোদন না করলে অর্থাৎ দলীয় নেতারা সম্মতি না দিলে ক্যাবিনেটের বড় কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে না? তাহলে তখন দলীয় নেতারাও সরকারী সিদ্ধান্ত গুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন এবং দলগতভাবে সেই সিদ্ধান্ত পূর্ণ সমর্থনের দায়িত্বও তাঁদের এসে পড়বে।

৪ঠা মে, ১৯৬৭।

অবাঞ্ছিত শরিক বিরোধ

যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত একটি দল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কতটা অস্বস্তি বোধ করছেন পাটনায় অ-কংগ্রেসী নেতাদের সম্মেলনে উপস্থিত না থাকলে এত পরিষ্কার ভাবে সেটা বুঝতে পারতাম না। জানাই বোধহয় যেত না, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের দল বাংলা কংগ্রেসেরও অনেকেই মনে করেন যে, "ছ'মাসের মধ্যেই কমিউনিস্টরা পশ্চিমবঙ্গে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছেন।"

দলের দু'জন বিশিষ্ট নেতা খুব খোলাখুলিভাবেই কথাগুলি রেখেছেন পাটনার সর্বভারতীয় সম্মেলনে। তাঁরা তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, 'কমিউনিস্টরা ক্রমে ক্রমে বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন।' তাঁরা বিস্তারিত ভাবে দেখিয়েছেন কিভাবে কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছেন। এবং, সবকিছু বলে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, 'কংগ্রেসী দুঃশাসন খতম করার সঙ্গে সঙ্গে এই জুলুমবাজীর প্রতিরোধ করাও একান্ত প্রয়োজন।'

'সংবিধানে শ্রদ্ধাবান' ও 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদে' বিশ্বাসী একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের পিছনেও তাঁদের একটা বড় তাগিদ যে 'এই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট, শক্তিগুলিকে' খর্ব করা, পাটনা সম্মেলনে সেকথাও তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেম, এই নতুন দলের মাধ্যমে দুমুখী অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে এর কাজ হবে আদর্শভ্রষ্ট, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস রাজত্বের অবসান ঘটানো, অন্যদিকে দায়িত্ব হবে 'হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ করা'।

এই দুই নেতার একজন হলেন ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র এবং আর একজন এম এল এ শ্রীনলিনাক্ষ সান্যাল।

* * *

দলের মধ্যে ও বাইরে যদি এদের বিশেষ গুরুত্ব না থাকত, যদি দলের আরও বহু নেতা এদের এই মত সমর্থন না করতেন তাহলে. এসব অভিযোগে গুরুত্ব না দিলেও চলত। বলা যেত, ওগুলি নেহাৎ ব্যক্তিগত মতামত, বিভিন্ন ব্যক্তিগত কারণেই তাঁরা যুক্তফ্রণ্টের বিশিষ্ট অংশীদার কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ভিত্তিহীন কতকগুলি অভিযোগ তুলেছেন।

কিন্তু বাংলা কংগ্রেসে শ্রীহরিদাস মিত্র ও শ্রীনলিনাক্ষ সান্যালের গুরুত্ব যথেষ্ট। ডেপুটি স্পীকার হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত শ্রীমিত্র ছিলেন দলের অন্যতম সম্পাদক। আর শ্রীসান্যাল হলেন নদীয়া জেলায় বাংলা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান সংগঠক। সাধারণ নির্বাচনে নদীয়া জেলায় বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই।

আরও একটা কথা। পাটনা সম্মেলনে বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে এঁরা দু'জনই ছিলেন প্রধান বক্তা।

এবং সর্বোপরি, এঁরা যখন পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন, তখন সেখানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরও উপস্থিত ছিলেন। পাটনা সম্মেলনের দুদিনে এই তিন নেতা একবারও বলেননি, ওঁদের দুজনার বক্তব্য ভুল বা অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ভুল বোঝাবুঝির আশংকা দূর করার জন্য শ্রীমিত্র ও শ্রীসান্যালের বক্তব্যের প্রয়োজনীয় অংশ পুরোপুরি তুলে দিতে চাই।

শ্রীমিত্র বলেন ঃ ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা এই নতুন দল গড়তে চলেছি। একদিকে চীন পৃথিবীর উপর বিশেষ করে ভারতের উপর তার নয়া কমিউনিজমের প্রভাব বাড়াতে চাইছে, অন্যদিকে আমে-

রিকানরাও সর্বত্র তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। একদিকে কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়েছে, অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দক্ষিণ ও বাম উগ্রপন্থীরা বেড়ে চলেছে।...এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিম-বাংলার কথা বলা চলে। আমাদের রাজ্যে বাম উগ্রপন্থীরা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে চাইছে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বেড়ে গিয়েছে। তাঁরা যেভাবে হিংসাত্মক গণতন্ত্র বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে চলেছেন, তাতে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক জাতীয়তা-বাদী শক্তিগুলির সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। না হলে কমিউনিস্টরা বাইরে থেকে সাহায্য নিয়ে দেশ তছনছ করে দেবে। শুধু কংগ্রেস বিরোধিতা করা আমাদের নতুন দলের লক্ষ্য হবে না, বিদেশী সাহায্য পুষ্ট অগণতান্ত্রিক দলগুলিকেও আমাদের প্রতিরোধ করতে হবে। নেতাজী এবং গান্ধীজী বহুদিন পূর্বেই এদের সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

নলিনাক্ষ সান্যাল আরও স্পষ্ট ভাষায় কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তাঁর অভিযোগ পেশ করেছেন ; আমরা অনেকেই রাজ্যগুলির হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলি। এটা ভারতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। যদি বিভিন্ন রাজ্য নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজ নিজ মত ও পথে চলতে চান তাহলে রাষ্ট্র হিসাবে ভারত এবং জাতিরূপে ভারতীয়রা শক্তিশালী হতে পারবে না। সোভিয়েট বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই সে জিনিস হতে দেয়নি।...আমাদের আর একটা বড় বিপদ যে, এদেশে সব দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের অনেকেই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট। সবাই যে যার পথে চলার ক্ষমতা পেলে এঁরা দেশের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবেন। আমি এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দিতে পারি। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরা সন্ত্রাসের এক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চাইছেন। বহুক্ষেত্রে গণতন্ত্র বিরোধীরা আইন হাতে নিয়েছেন। রাজ্যের অনেক মন্ত্রীও এর সমর্থন করেছেন। একজন মন্ত্রী তো রেডিও-র মাধ্যমে সংবিধানের

বিরোধীতা করতে গিয়েছিলেন। তিনি আমাদের বিচার বিভাগকেও কটাক্ষ করতে চেয়েছেন। তিনিই কিন্তু আবার সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। .. এঁরা তারপরও মন্ত্রী আছেন এবং মন্ত্রী থাকতে দেওয়া হয়েছে, এঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস না করেও, সংবিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়েও সরকারে যোগ দিয়েছেন! কারণ এঁরা এসবের সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চান। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো এই যে এঁদের স্বার্থ আর দেশের স্বার্থ এক নয়।

* * *

সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের আর যে তিনজন প্রতিনিধি বক্তৃতা করেন তাঁদের দুজনও কমিউনিস্টদের তীব্র সমালোচনা করেন। একজন হলেন আই এন টি সি-র নেতা শ্রীকালী মুখার্জী এবং আর একজন শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার। শ্রীমুখার্জী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতমদের একজন বলে পরিচিত। দুয়ের একজনও অবশ্য বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে নেই।

শ্রীমুখার্জীর অভিযোগ ছিল, পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্টরা যে ভাবে সোস্যাল ডেমোক্রাটের 'খতম করার চেষ্টা করেন' পশ্চিমবঙ্গেও তাই করছেন। তাঁরা একদিকে যখন অ-কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক সমাজ-বাদী দলগুলির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, বন্ধু সাজার ভণিতা করছেন, অন্যদিকে তখনই তাঁদের 'খুন করার জন্য ছুরি সান দিচ্ছেন!' তিনি বলেন, আজ কমিউনিষ্টরা শিল্পে যে 'ঘেরাও' নীতি চালু করেছেন, সেটা কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপকভাবে জনজীবনেও আসবে। এরপর ঘেরাও হবে লোকের বাড়ি-ঘর। তারপর শহরগুলি এবং শেষ পর্যন্ত আজ যাঁরা বন্ধু বলে পরিচিত তাঁদেরও ঘেরাও করা হবে। তাঁর অভিযোগ, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অ-কংগ্রেসীদের ওপর হামলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁর আশংকা, এ হামলা ক্রমেই বাড়বে। পরিশেষে শ্রীমুখার্জী বলেন, এই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট
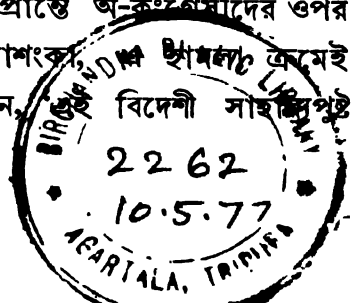
অগণতান্ত্রিক দলগুলিকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজবাদে বিশ্বাসী একটি শক্তিশালী দল চাই।

শ্রীনীহারেন্দু দত্তমজুমদার আন্তর্জাতিক রাজনীতির পটভূমিকায় তাঁর বক্তব্য রাখেনঃ কংগ্রেস পচে গিয়েছে। মানুষের কোনও আস্থা নেই ও দলের ওপর। দেশে আজ চীনা, রুশ এবং মার্কিন এজেন্টদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।...আজ পৃথিবীর সামনে একটা বড় সমস্যা হল বুলেটের রাজনীতি। এই নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উত্তর পর্যন্ত এসে গিয়েছে। নদীটির দক্ষিণেও তাঁদের বহু সমর্থক রয়েছেন। তিব্বত থেকে ভিয়েৎনাম পর্যন্ত এক সুরে বাঁধার চেষ্টা চলছে। পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে, এ চেষ্টাটা প্রকট। এঁরাই আজ আমাদের সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। এঁরা সরকারের মধ্যে ঢুকে বসেছেন বলেই আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলবে না।

নতুন সরকারের বয়স তিন মাস হতে না হতেই যুক্তফ্রন্টের অংশীদার ও সমর্থকরা এমন সব অভিযোগ তুলেছেন কেন কমিউনিস্ট নেতাদের সেটা ভেবে দেখা উচিত। আর এধরনের অভিযোগ যে শুধু বাংলা কংগ্রেসের মুখেই শোনা যায় তেমন নয়, যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য অংশীদারদের কাছেও এরকম কথা শুনেছি।

দিন দিনই যেন পারস্পরিক অভিযোগের মাত্রা বাড়ছে। দিন সাতেক আগে ডান কমিউনিস্টদের দৈনিক মুখপত্র 'কালান্তরে' একটি সংবাদের শিরোনাম ছিল 'মার্কসসিস্ট কমিউনিস্টদের গুণ্ডামী'। তার তিন দিন পরেই একজন ডান কমিউনিস্ট মন্ত্রী 'জয়া কারখানায় বাম কমিউনিস্টদের হামলা' সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন এবং কঠোর পুলিসী ব্যবস্থার দাবী জানান। উত্তরবঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, পি এস পি

এবং গোর্খা লীগ নেতাদের মুখেও এ ধরনের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

*   *   *

এদিকে আবার কমিউনিস্টরা বিশেষ করে বাম কমিউনিস্টরাও সরকারের অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা শুরু করেছেন। সম্প্রতি তাঁদের রাজ্য কমিটিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য করা হয়েছে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পলিটব্যুরোও রাজ্য সরকারকে রেহাই দেন নি। লক্ষণীয়, রাজ্যের সহকারী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুও পলিটব্যুরোর সদস্য।

একটা *বিষয় পরিষ্কার,* বামকমিউনিস্টরা বা যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য অংশীদার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালাচ্ছেন সেটা সর্বক্ষেত্রেই নিজেদের বাদ দিয়ে। প্রায় সবাই বলতে চাইছেন, আমরা যে ভাবে বলছি সেভাবে সরকার চলছে না এবং সেভাবে না চললে সরকার কিছু করতেও পারবেন না। এটা একটা বিচিত্র পরিস্থিতি। পৃথিবীর কোনও দেশের কোয়ালিশন সরকারের কখনও এ হাল হয়েছে কিনা সন্দেহ!

এই প্রসঙ্গে বাম কমিউনিস্টদের সান্ধ্য দৈনিকের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তুলে দিচ্ছিঃ গত মার্চ মাসেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) পঃ বঃ রাজ্য কমিটি খাদ্য সংগ্রহ ও মূল্যহ্রাস সম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পন্থা সুপারিশ করেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার সে নীতি গ্রহণ করে নাই।…কোন্ কোন্ দল ও কোন্ কোন্ মন্ত্রী দর বাঁধার এবং বড় মজুত দ্রুত কঠোর পন্থায় সংগ্রহ করার বিরোধিতা করেছেন, তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। দু'মাস অমূল্য সময় নষ্ট করে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সুবিধা করে দেওয়া হোল কি কারণে? কেন্দ্র থেকেও উপযুক্ত পরিমাণ চাল-গম সময়মত পাওয়া

যাচ্ছে না! অথচ, সময়মত আবেদনপত্র পাঠিয়ে বসে থাকা হচ্ছে কেন?

রাজ্য মন্ত্রিসভায় বাম কমিউনিস্টদের তিনজন প্রতিনিধি রয়েছেন। তিনজনই জবরদস্ত মন্ত্রী। মন্ত্রিসভায় যখন খাদ্যনীতি নির্ধারিত হয়, তখন এঁরা কী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না? মুখ্যমন্ত্রী তো বার বার ঘোষণা করেছেন, মন্ত্রিসভার সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত—যা করা হয় সবারই মত নিয়ে করা হয়। যুক্তফ্রন্ট কমিটি অর্থাৎ 'সুপার ক্যাবিনেটেও' সরকারী খাদ্যনীতি অনুমোদিত। এর পরও মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য বা যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দলকে জনস্বার্থ বিরোধী বলা হচ্ছে কেন?

* * *

যুক্তফ্রন্ট সরকার ও যুক্তফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির কাছে পশ্চিমবাংলার সাধারণ মানুষের বহু আশা। পারস্পরিক দোষারোপের মাত্রা বাড়ানো বা হাঙ্গামায় মত্ত হওয়াব জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসী কংগ্রেসকে সরিয়ে যুক্তফ্রন্ট বা তার অংশীদারদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন নি।

তাঁরা চান, খাদ্য সমস্যার সমাধান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ, দুর্নীতি মুক্ত শাসন ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থান।

যুক্তফ্রন্টেব অংশীদাররা যদি এই লক্ষ্যে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ না করেন এবং যদি শুধু পারস্পরিক কলহে মত্ত হন, তবে বাঙলা ও বাঙ্গালীর মঙ্গল হতে পারে না। তাতে বরং সর্বনাশ আরও দ্রুত এগিয়ে আসবে।

২৩ মে, ১৯৬৭।

জোড়, না বিজোড়

মূল বক্তব্যটা শুরুতেই সোজাসুজি বলে নিতে চাই। যাঁরা মনে করছেন যুক্তফ্রন্ট ভাঙলো বলে, এবং আশা করছেন, তারপরই হয় কংগ্রেস, না হয় অন্য কোনও কোয়ালিশন অথবা রাষ্ট্রপতির শাসনে পশ্চিমবঙ্গে আবার শান্তি শৃঙ্খলা' ফিরিয়ে আনা যাবে, তাঁরা মুর্খের স্বর্গে বাস করছেন।

কিছুদিন যাবৎ কিছু লোকের মনে এমন একটা ধারণা বা আশা দেখা দিয়েছে বলেই এবং কিছু লোক এইদিকে অগ্রসর হচ্ছেন বলেই কথাগুলি বলা প্রয়োজন মনে করছি। যদি এটা শুধু কয়েক জনের ব্যক্তিগত ব্যাপার হত, যদি এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে তথা পূর্ব-ভারতের ভাল-মন্দের সবকিছু জড়িয়ে না থাকত, তাহলে 'কিছু লোকের নিছক ব্যক্তিগত আশা নিরাশার ব্যাপার বলে গোটা জিনিসটাকেই এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তার উলটো বলেই এ বিষয়ে গভীর চিন্তা প্রয়োজন। যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে শুধু ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত চোদ্দটি দলের ভাগ্য জড়িত নয়। এখনই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটা বা ঘটানো মানে শুধু আঠারো জন মানুষের মন্ত্রিত্ব যাওয়ার মত ছোট ব্যাপার নয় বা কিছু বামপন্থী দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়া নয়। তার অর্থ গোটা পশ্চিমবঙ্গে ওলট-পালট, কংগ্রেস গিয়ে যুক্তফ্রন্ট এসে যে ওলট পালট হয়েছে, তার চেয়েও প্রচণ্ড ওলট-পালট। তাই এ আলোচনা প্রয়োজন।

আরও একটা কারণে এই আলোচনা জরুরী। রাজ্য বিধান সভার আসল বাজেট অধিবেশন এসে গেল এবং কিছু লোক এই অধিবেশনেই একটা কিছু করে ফেলতে চান। যুক্তফ্রন্টের বাইরের এবং ভেতরের কিছু লোকও আছেন এর মধ্যে। তাঁদের ধারণা,

সময় এসে গিয়েছে, আমটা পেকে লাল টুকটুকে হয়েছে, একটু ঝাঁকিয়ে দিলেই টুপ করে পড়ে যাবে। তাঁদের কেউ কেউ আর সময় নষ্ট করতে রাজী নন। আশংকা, বিলম্বে একেবারে হতাশ হতে হবে। তখন আমটা পাওয়া গেলেও ভোগে লাগানো যাবে না—ততদিনে হয় পাখি, না হয় পোকা সব নষ্ট করে ফেলবে!

যুক্তফ্রণ্ট যে এখন কিছুটা আলগা ফ্রণ্ট হয়ে গিয়েছে এ সত্য অস্বীকার করে লাভ নেই। মন্ত্রীরা বা বামপন্থী নেতারা যাই বলুন, মার্চে যুক্তফ্রণ্ট যতটা যুক্ত ছিল জুন-এ আর ততটা নেই। ওপর তলার বাঁধুনিতে এখন কিছুটা জোর থাকলেও নীচের তলার জোড় অনেক আলগা হয়ে আসছে। শুধু যে মন্ত্রীরা মাঝে মধ্যে পরস্পর বিরোধি বিবৃতি দিচ্ছেন তেমন নয়, শুধু যে বাম কমিউনিস্ট নেতা সুন্দরায়া ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পদত্যাগ দাবি করেছেন তাও নয়, কেবল মাত্র প্রজা সমাজতন্ত্রী দল বাম কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ আনছেন বা নকশালবাড়ি নিয়ে মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে তেমনও নয়, প্রায় প্রত্যেক জেলায় যুক্তফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে জোর মন কষাকষি চলছে, বিভিন্ন পৌর নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন—এমন কি খোদ সুপার ক্যাবিনেটে জেলা, মহকুমা বা থানা ভিত্তিক যুক্তফ্রণ্ট গঠন নিয়ে এক অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘদীন ধরে।

আর বিরোধ বা মন কষাকষি শুধু দলেদলেই সীমাবদ্ধ নয়। যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রত্যেকটি দলের মধ্যেও ফ্রণ্ট এবং ফ্রণ্ট সরকার নিয়ে বেশ কিছুটা মতভেদ রয়েছে। এইসব মতভেদের কারণ·বা উগ্রতা অবশ্য সর্বত্র সমান নয়। বহুক্ষেত্রেই দলের ভিতরের মত পার্থক্যের কারণ একেবারে পরস্পর বিরোধী। যেমন, বাংলা কংগ্রেসের একদল নেতা ও কর্মী যখন মনে করছেন, "যুক্তফ্রণ্টে থেকে আসলে সব কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে", বাম কমিউনিস্টদের একটি গোষ্ঠীর ঠিক তখনই ধারণা বাংলা কংগ্রেসের

মত দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দলের নেতারা তাঁদের শোধনবাদী মুখোশ খুলে ধরেছেন। বহুক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ চাপেই দলীয় নেতারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন।

একথাও সত্য যে, বাংলার মানুষ গোড়ায় যতটা আশা করেছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার তার খুব কমই পূরণ করতে পেরেছেন। দুর্নীতি প্রথম একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার প্রবল ও সচল। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। খাদ্য সমস্যা খুবই সংকটজনক। বেকারী বর্ধমান। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় মন্ত্রীরা নিজেরাও এ কথাগুলি স্বীকার করছেন। কিছুদিন আগে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী খুব আক্ষেপ করে বলেছিলেন "সবাই তো খুব চেষ্টা করছি, সব মন্ত্রীরাই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছেন, কিন্তু কিছুই যে করতে পারছি না।"

এমনি এতদিনে যুক্তফ্রণ্টের প্রায় সব নেতাই বুঝছেন শত চেষ্টা করেও কাজের কাজ তাঁরা তেমন কিছুই করতে পারছেন না। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় খুব বেশিদূর এগোনো সম্ভব হচ্ছে না। অবশ্য, পারছেন না তার কারণ এই নয় যে, তারা অযোগ্য বা তাঁদের সদিচ্ছা নেই। পারছেন না, কারণ পারা খুব কঠিন। আগে একথা তাঁরা স্বীকারই করতে চাইতেন না। এখন ঠেকে ধীরে ধীরে সত্যটা উপলব্ধি করছেন।

তবে পারছেন না বলেই বা অতটা যুক্ত নেই দেখেই যে সাধারণ মানুষ এঁদের উপর বিরূপ তেমনও নয়। আশাভঙ্গজনিত মন কষ্টের ছাপ জন জীবনে মাঝে মধ্যে কিছুটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা বিক্ষোভ বা বিরোধিতা নয়। সেটা এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভ। এত তাড়াতাড়ি জনসাধারণ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের বিরোধিতা শুরু করবেন বলে যাঁরা আশা বা কল্পনা করেন, তাঁরা ভুলে যান, অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক ব্যর্থতার কারণ

মনে করেও তো এই পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণই পর পর তিনটি সাধারন নির্বাচনে কংগ্রেসকেই জিতিয়েছিল।

গত তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গে যে সব বড় বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলি কংগ্রেস থাকলে সৃষ্টি হত না, জনসাধারণ তেমনও মনে করেন না। বরং অনেকেরই ধারণা কংগ্রেস আমলে এত সব জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়ে রয়েছে, যেগুলির সমাধান করতেই যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। তাই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার আরও অবনতি ঘটছে দেখেও লোকে ধৈর্যবান, আশাবান ও সহিষ্ণু। সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, কংগ্রেসের চেয়ে অনেক ভাল রাজ্য চালাতে পারবেন যুক্তফ্রণ্ট সরকার।

কংগ্রেস বা যুক্তফ্রণ্ট দু' পক্ষেরই অনেকে কিন্তু এখনও বুঝতে পারছেন না যে, ক্ষমতায় যিনিই অধিষ্ঠিত থাকুন আগামী দু'তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গে নানা সংকট আরও বাড়বে। খাদ্য, দ্রব্যমূল্য এবং বেকারির সমস্যা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে! গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সংকট, গ্রাম ও শহরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং শিল্পাঞ্চলে বেকারি বৃদ্ধি অনিবার্য।

ঘাটতি জেলাগুলিতে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। বড় জোত-দারদের ধরে রাখা চাল ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে। ছোট চাষীদের যাঁর যতটুকু খাদ্য সঞ্চয় ছিল শেষ! তাঁরা এখন সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন বাজার এবং বড় চাষীর উপর। হাঙ্গামার ভয়ে দোকানদাররাও চাল আনতে সাহস পাচ্ছেন না। এরপর চাষ শুরু হলে ক্ষেত মজুরের হাতেও কিছু টাকা আসবে। তাঁরাও এক বেলার বদলে দু'বেলার খাবার খুঁজবেন। ফলে বাজারে টানাটানি এবং দ্রব্যমূল্য আরও বাড়বে।

অন্যদিকে দেশব্যাপী যে শিল্পমন্দা দেখা দিচ্ছে তারও কোনও আশু সুরাহার সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে

তো সংকট ঘোরতর হচ্ছে দিন দিন। ছাঁটাই ও বেকারি তাই বাড়বে বই কমবে না।

আবার রাজ্যের উন্নয়ণমূলক কাজগুলিও বহু ক্ষেত্রেই বন্ধ হতে বাধ্য। ভাতা বৃদ্ধি, চালের ভরতুকি, ত্রাণ প্রভৃতি খাতে সরকারী খরচ যেভাবে বেড়েছে, তাতে রাজ্যের উন্নয়ণ পরিকল্পনাগুলির ছাঁটকাট অনিবার্য। এরও বিরূপ প্রভাব পড়বে রাজ্যের অর্থনীতির উপর।

অন্যে পরে কা কথা, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকেই এই সব সমস্যা নিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হবে। যদি যুক্তফ্রণ্টের কোনও অত্যুৎসাহী শরিক অবস্থাটাকে ইচ্ছা করে না জটিলতর করে তোলেন, যদি যুক্তফ্রণ্টের অংশীদাররা অবাস্তব কতকগুলি মুখরোচক দাবি না তুলে মানুষকে দেখাতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, সবারই সমস্যা সমাধানের ঐকান্তিক চেষ্টা রয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ আরও কিছুদিন শান্ত থেকে অনেক দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে নেবেন।

কিন্তু যদি যুক্তফ্রণ্টের বদলে আর কেউ আসেন? যদি অন্য কোনও কোয়ালিশন বা কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়? অথবা, যদি রাষ্ট্রপতির শাসন আসে? তাহলে? আমার আশংকা, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এক অদ্ভুত অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং তখন শুধু পুলিশ দিয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাবে না।

নানা সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবাংলার যে মানুষ আজ শুধু অশান্ত তাঁরাই তখন সংহারমূর্তি ধারন করবেন। আর তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন বিক্ষুব্ধ বামপন্থী দলগুলি। দুয়ে মিলে বিক্ষুব্ধ মানুষের বিক্ষোভ ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। যাঁরা ঘেরাও নিয়ে বিচলিত, তাঁরা বোধহয় কল্পনাও করতে পারছেন না, এখনই যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটলে বা ঘটালে রাজ্যে যে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা, তাতে গোটা রাজ্যের জনজীবনই অচল হওয়ার ভয় থাকবে।

যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত দু-একটি দলের কিছু লোকও হয়ত সেই অবস্থাকে স্বাগত জানাবেন।

*   *   *

কেউ কেউ বলছেন, সে অরাজকতার ঝুঁকি নেওয়াও বরং ভাল, না হলে এভাবে আর কিছুদিন চললে যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আড়ালে থেকে বাম কমিউনিস্টরা সব গুরুত্বপূর্ণ ঘাটিতে ঢুকে বসবে।

এই সব কমিউনিস্ট ভয়ে-ভীতদের কাছে আমার শুধু একটা প্রশ্ন, উনিশ বছরের রাজত্বে, পি ডি এবং সিকিউরিটি এ্যাক্টের দীর্ঘ জীবনে, ভারতরক্ষা আইনের চার বছরে কমিউনিস্টদের কতটা প্রতিরোধ করা গিয়েছে? বাছাই করে, পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করে সরকারী চাকরিতে লোক নেওয়ার রীতি তো দীর্ঘকাল যাবৎ বলবৎ, তবু যে সর্বত্র শুনে এসেছি পশ্চিমবাংলার সব সরকারী দপ্তরে কমিউনিস্টরা ঘাটি করে ফেলেছে! শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রেখে বা পুলিস দিয়ে কে-ই বা কবে কোথায় কমিউনিস্টদের আটকাতে পেরেছেন? আইন ও শৃংখলার প্রশ্নও উঠেছে। অনেকের ধারণা, যুক্তফ্রণ্ট সরকার বা তা থেকে কমিউনিস্টরা সরে গেলেই আইন ও শৃংখলা স্বাভাবিক হবে। আমার প্রশ্ন, ১৯৬৬ সনে যখন রাজ্য বিধান সভায় কংগ্রেসের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যখন কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে পুলিস সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করছে, তখনই বা পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃংখলা কতটা বজায় রাখা গিয়েছিল? আজ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি তার চেয়ে খুব খারাপ?

আসল প্রশ্ন, জনসাধারণের চোখে যুক্তফ্রণ্টের চেয়ে বেশি আস্থাবান কোনও দল বা গোষ্ঠী আছে কি পশ্চিমবঙ্গে? আজকের সংকটজনক পরিস্থিতিতে আর কে পারবেন পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখীন হতে? এককভাবে ডান বা বাম কোনও দল পারবেন না। সাহস পাবেন সরকারী অফিসাররা রাষ্ট্রপতির নামে বিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গের সামনে দাঁড়াতে?

রাজনৈতিক নেতাদের একটা বড় দায়িত্ব জনগণের মনোভাব বুঝে চলা। জনমতের বিরুদ্ধে যদি তাঁরা এগোতে যান, জনগণ প্রস্তুত হওয়ার আগে যদি তাঁরা কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তাহলে সব সময় যে শুধু তাঁরাই ডোবেন তেমন নয়—দেশ এবং জনগণও বিপদে পড়েন। পশ্চিমবাংলার সব দলের সকল নেতা এই সত্য ভুলে গেলে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দুর্ভোগ বাড়বে বই কমবে না।

২০ জুন, ১৯৬৭।

নতুন বাংলা গড়ে তোলার দায়

ভারতে ইংরেজের পর কংগ্রেস যেভাবে চলেছে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পর যুক্তফ্রন্টও কি সেইভাবেই চলতে চাইছে ? স্বাধীনতার পর দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে কংগ্রেস শুধু দেশবাসীকে বোঝাতে চেয়েছিল, আমরা আর কি করব, ইংরেজ যে সব ডুবিয়ে গিয়েছে, আমাদের তো এখনও শৈশবই কাটল না। ক্ষমতা প্রাপ্তির পর গত চার মাস ধরে যুক্তফ্রন্টও যেন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুধু বলতে চাইছে, আমরা কি করব, কংগ্রেস যে সব ডুবিয়ে গিয়েছে—আর আমাদের পদে পদে তো সংবিধান, কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাতন্ত্রের বাধা।

অবশ্য এই তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন হত না যদি দেখা যেত একদিকে তখন যুক্তফ্রন্টের নেতারা কংগ্রেসী সংবিধান, কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাতন্ত্রের বাধার বিরুদ্ধে লড়ছেন, অন্যদিকে ঠিক তখনই পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠনের কাজে হাত লাগিয়েছেন—প্রায় বিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বে যে সব জঞ্জাল জমেছে সেগুলি পরিস্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। দুঃখের বিষয় তা দেখছি না।

আরও একটা বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বেশ কিছুটা মিল দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেস যেমন স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষকে সঙ্গে পেয়েও তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে পারেনি, সঠিক নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টেও তেমনি যেন নবজাগ্রত পশ্চিমবঙ্গবাসীর অকুণ্ঠ আস্থা ও সমর্থন পেয়েও তা কাজে লাগাতে এবং নির্ভুল পথে নিয়ে যেতে পারছে না।

* * *

হয়ত বলবেন, সবে তো চারমাস, একটু সময় দিন। সন্দেহ নেই, ভালো-মন্দ বিচার করার পক্ষে চার মাস মোটেই যথেষ্ট সময় নয়।

কিন্তু ভয় হয়, কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও এই 'সবে তো চার মাসের' যুক্তি শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেই শৈশব কংগ্রেসী আমলে আর ঘোচেই নি। ফলে সমস্যাগুলিও না। জনসংখ্যা বাড়ল—বাড়ল দারিদ্র, খাদ্যাভাব, বেকারি। এল যুদ্ধ। সংকট বেড়েই চলল।

আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় বিচার্য বিষয় হলো শৈশবের লক্ষণ—শিশুর মতিগতি। দেখতে হবে, তার প্রবণতা কোন্ দিকে। সে ঠিক পথে এগোচ্ছে কিনা। শিশু যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যার জন্য উনিশ বছরের কংগ্রেস রাজত্বকে দায়ী করুণ আপত্তি নেই। কংগ্রেস রাজত্বে কতটা কাজ এবং কতগুলি অকাজ হয়েছে, সে বিতর্কেও না হয় নাই গেলাম।

কিন্তু যদি ধরেও নিই কংগ্রেস কিছুই করে নি, তাহলেই কি মেনে নিতে হবে যে, যুক্তফ্রণ্টের এখন কিছুই করার নেই বা তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না? বরং উত্তরটা তো হওয়া উচিত উলটো। কংগ্রেস কিছু না করে থাকলেই তো যুক্তফ্রন্টকে অনেক কিছু করতে হবে। তাই না কংগ্রেসের তুলনায় যুক্তফ্রণ্টের কাছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর আশা অনেক বেশী।

অভিযোগ উঠেছে, কংগ্রেস, কেন্দ্রীয় সরকার ও কায়েমী স্বার্থ যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, ওরা যুক্তফ্রণ্টের পতন ঘটাতে চায়। এসব অভিযোগই ধরা যাক সত্য। কিন্তু তারপরও যে প্রশ্ন উঠবে, যুক্তফ্রণ্টের নেতারা কি আশা করেছিলেন বিরোধীরা সবাই তাঁদের ফুল চন্দন নিয়ে স্বাগত জানাবেন? চিরকালই যার স্বার্থে আঘাত পড়ে সে বাধা দেয়, রুখে দাঁড়ায়। এবং চিরকালই যে এগিয়ে যেতে চায় সে এসব বাধা দু হাতে দূরে ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

আরও শোনা যাচ্ছে, সংবিধান এবং আমলাতন্ত্র যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সামনে দুই বড় বাধা। (যুক্তফ্রণ্টের সবাই অবশ্য সংবিধানকে বাধা মনে করেন না।) নতুন সরকারের কোন্ কোন্ কাজে কীভাবে সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে তালিকা অবশ্য এখনও কেউ দেননি।

আজ অবধি তো শুনিনি মন্ত্রিসভার একটা মহৎ প্রচেষ্টা সাংবিধানিক বাধায় আটকে গিয়েছে!

আমলাতন্ত্র বাধা দিচ্ছে? কংগ্রেসী আমলেও আমলাতন্ত্রে এই দুর্নাম শোনা গিয়েছে। এখনও শোনা যাচ্ছে। আমলাতন্ত্রের সবাই নিশ্চয়ই খারাপ নন। (কয়েকজন অপ্রগতিশীল মন্ত্রী তো এখন নিজ নিজ দপ্তরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আমলার কথায় ওঠেন বসেন বলে মন্ত্রিদের মুখেই শুনতে পাই।) যাঁরা কাজে বাধা দিচ্ছেন, তাঁদের বিদায় করে দিচ্ছেন না কেন? নিজেরা না সরে যেতে চান তাঁদের সরে যেতে বাধ্য করুণ। তা না করে, আমলাতন্ত্র কোথায় কী ভাবে কাজে বাধা দিচ্ছে জনসাধারণের সামনে প্রমাণ না করে শুধু মুখে 'আমলাতন্ত্র সব মাটি করল' বলে চিৎকার করলে সাময়িক ভাবে ব্যর্থতা ঢাকার একটা অজুহাত হয়ত দাঁড় করানো যাবে, কিন্তু কাজ যে এগোবে না।

আর কংগ্রেসী আমলেও তো কেন্দ্রের অবিচারের অভিযোগ শোনা গিয়েছে, তখনও তো সংবিধান, এই আমলাতন্ত্রই ছিল। তখন তো রাজ্যের বামপন্থী নেতাদের আক্ষেপ করতে শুনি নি যে, করবেনই বা কী কংগ্রেসী মন্ত্রীরা—কেন্দ্র, সংবিধান ও আমলাতন্ত্র যে ওদের পদে পদে আটকাচ্ছে!

আরও একটা কথা; এই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থেকে, এই সংবিধানের আওতায় কাজ করে এবং সেই কংগ্রেসী আমলাতন্ত্র নিয়েই তো মাদ্রাজের ডি এম কে সরকার প্রতিশ্রুতি মত সস্তা দরে চাল দিতে পারছে, লক্ষ্যের শতকরা ৯০ ভাগ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং আগামী ছ' মাসে ছ' লক্ষ টন বাড়তি চাল উৎপাদনের এক কর্মসূচী নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে।

* * *

আজকে পশ্চিমবঙ্গের চারটি প্রধান সমস্যা হলো—অন্ন, বাসস্থান, বেকারি এবং দুর্নীতি। এই সমস্যাগুলির কিছুটা সুরাহা আশু

প্রয়োজন। যে সরকার যত জনসমর্থন নিয়েই আসুন এই চার ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রসর হতে না পারলে আজ হোক কাল হোক তার পতন অনিবার্য। এই সত্য যুক্তফ্রন্টের নেতারাও জানেন। তাই তাঁদের আঠারো দফা কর্মসূচীতে এই চারটি সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে এবং সেইজন্যই রাজ্য পরিচালনার ভার হাতে নেওয়ার পূর্বমুহূর্তে ময়দানের জনসভায় তাঁরা বারংবার এই সমস্যাগুলি সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

আমি জানি, আপনি জানেন, এই সব সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছাও যুক্তফ্রন্ট নেতাদের রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যেভাবে তাঁরা এগোচ্ছেন, সেভাবে চললে শেষ পর্যন্ত কিছু করা সম্ভব হবে কিনা।

খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, তিন বছরের মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। এজন্য তিনি বিস্তারিত পরিকল্পনাও রচনা করেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু পরিকল্পনা কংগ্রেস সরকারও রচনা করতেন। কাগজ কলমে ভাল ভাল পরিকল্পনা কংগ্রেস রাজত্বেও কম হয়নি। হয় নি যা তা সেই সব পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। এই ব্যর্থতার কারণ ছিল প্রধানত দুটি। (এক) তাঁরা সরকারী যন্ত্রকে ঐসব পরিকল্পনা রূপায়ণে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারেন নি। (দুই) জনসাধারণকে উৎসাহিত করে পরি-কল্পনা রূপায়ণের কাজে সামিল করার ব্যাপারেও তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস আমলের এই দুটি বড় ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য কী করছেন? সন্দেহ নেই, কৃষিমন্ত্রী ডঃ ঘোষ সরকারী যন্ত্র এবং জনগণকে পূর্ণ উদ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাতে ব্যস্ত। কিন্তু একা ডঃ ঘোষের সাধ্য কি এত বড় কাজে গোটা রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যান। মন্ত্রিসভাও কি এ ব্যাপারে তাঁর মত উৎসাহী? যুক্তফ্রন্টের নানা দল কেন্দ্র বিরোধী, রাজ্যপাল বিরোধী,

জোতদার বিরোধী আন্দোলন করছেন বা করতে চান। করুন ভাল কথা। কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু করার কথা কি আজ পর্যন্ত কোনও দলের মুখে শোনা গিয়েছে? আমন চাষ শুরু হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গে এবার আমনের ফলন বাড়ানো যায়, তা নিয়ে মন্ত্রিসভা বা যুক্তফ্রন্ট কমিটির কটা বৈঠক হয়েছে আজ পর্যন্ত?

ওদিকে মাদ্রাজে দেখুন. ছয় লক্ষ টন বাড়তি চাল উৎপাদনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। কৃষককে বীজ সার ও জল সরবরাহের জন্যই শুধু সরকার চেষ্টা করছেন না। এই বাড়তি ফসল ভাঙাইয়ের জন্য কল, মজুতের জন্য গুদাম এবং পরিবহনের জন্য ট্রাকেরও ব্যবস্থা হচ্ছে এখন থেকেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ডি এম কে গ্রামে গ্রামে দলীয় কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে: তোমরা সর্বতোভাবে চাষীদের উৎসাহ দাও, সাহায্য কর। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি দলের লক্ষ্য শুধু নিজস্ব কৃষক সংগঠনের সদস্য বৃদ্ধি।

বেকারি পশ্চিমবঙ্গে এক বিরাট সমস্যা। গোটা ভারতেই দিন দিন বেকার বাড়ছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেকারি বাড়ছে সবচেয়ে দ্রুতহারে। শিল্পমন্দা পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। সর্বোপরি, পশ্চিমবঙ্গের উপর অ-পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর কর্মসংস্থানেরও একটা বাড়তি বোঝা রয়েছে। গোটা ভারতের প্রায় সব রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে জীবিকান্বেষীর আগমণ সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে।

কীভাবে এই ভয়াবহ বেকার সংকটের সম্মুখীন হওয়া যায়, গত চার মাসে মন্ত্রিসভায় বা যুক্তফ্রণ্টে ক'দিন আলোচিত হয়েছে সে প্রসঙ্গ? আজ পর্যন্ত বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য স্বল্প বা দীর্ঘ-মেয়াদী কোনও পরিকল্পনা রচনার কথা রাজ্য সরকার ভেবেছেন কি? হয়ত বলবেন, আলাদা করে কী আর করবেন এরা; পশ্চিমবঙ্গ তো

ভারতের বাইরে নয়—যা হবে গোটা ভারতে তাই হবে পশ্চিমবঙ্গেও। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস রাজত্বে এ যুক্তি শোনা যেত প্রায়ই। কিন্তু পাঞ্জাবে প্রতাপ সিং কাইরণ এ যুক্তি দেখিয়ে বসে থাকেন নি। ওখানে কৃষি ও শিল্পোৎপাদন দুই পূর্ণোদ্যমে বেড়েছে। কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অনেক দ্রুততালে।

আর দুর্নীতি? মার্চ মাসে মনে হয়েছিল যাক পশ্চিমবঙ্গে একটা বিষয়ে অন্তত এবার কিছুটা সুরাহা হবে—দুর্নীতিবাজরা জব্দ হবেই। যুক্তফ্রণ্টের নেতারা বারংবার ঘোষণা করেছিলেন: আমরা দুর্নীতি-বাজদের সাজা দেবই; দুর্নীতি বন্ধ করবই। চার মাসে কজন দুর্নীতিবাজ সাজা পেয়েছেন? দুর্নীতিই বা কতটুকু বন্ধ হয়েছে? এখনও তো সেই কংগ্রেসী আমলের মতই রোজই সকালে সংবাদপত্রে দেখা যায়: বাইশ কুইন্টাল চাল, দশ কুইন্টাল গম ও বাহাত্তর কেজি চিনি বেআইনীভাবে মজুত রাখার অভিযোগে তিনজন মুদি গ্রেপ্তার। ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তার বেশী কিছু? দুর্নীতি দমনে যুক্তফ্রণ্টের হালচাল দেখে নেহরুর কথা মনে পড়ে যায়। ক্ষমতায় আসার আগে যিনি বলেছিলেন, 'চোরাকারবারীদের আমি নিকটতম ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাব', এবং ক্ষমতা পাওয়ার পর যাঁর আমলে চোরাকারবারীদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আবার বলব, চার মাস মোটেই যথেষ্ট সময় নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দেব, চার মাসেই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেই ইঙ্গিত পাচ্ছি না বলেই শংকিত।

এখনও সময় আছে যুক্তফ্রণ্টের। এখনও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে তাঁদের পেছনে। এখনও জনগণ নতুন সরকারের মুখ চেয়ে অকাতরে বহু দুঃখকষ্ট স্বীকার করতে রাজী। এখনও যুক্তফ্রণ্ট যে পথে এগোতে বলবে জনগণ বিনা বাক্যব্যয়ে সেই পথে এগোবে।

জনগণ জানে, আজই যুক্তফ্রন্ট সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, আজই দুঃখকষ্টের সবটা লাঘব করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে পথে যাত্রা শুরু করাও কি সম্ভব নয়? সেই যাত্রাই শুরু হোক না কেন! দলীয় মারামারিটা থাক না কিছুদিন মূলতুবী। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে, শুধু কংগ্রেসী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ না তুলে, শুধু সংবিধান ও আমলাতন্ত্রকে গালিগালাজ না দিয়ে এগিয়ে চলুন না নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার পথে। যে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, যে পশ্চিমবঙ্গে বেকারি কমবে, যে রাজ্যে দুর্নীতিবাজরা কিলবিল করবে না এবং যেখানে ভিনদেশীয় শোষণ চলবে না সেই পশ্চিমবঙ্গ গড়ার কাজে দ্রুত তালে এগিয়ে চলুন না। হলফ করে বলতে পারি, আরও বেশী দুঃখকষ্ট সহ্য করে পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ হাসিমুখে ফ্রন্টের সঙ্গে এগিয়ে যাবে।

১১ জুলাই, ১৯৬৭।

ক্ষমতা দখল : সংগঠন পুনর্গঠন
রাজ্য কংগ্রেসে স্পষ্ট দুই মত

সে এক সময় ছিল যখন দিল্লীর যন্তর মন্তর রোডের কর্তারা বলতেন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেসের চেয়ে স্বতন্ত্র। এ রাজ্যে যাঁরা সরকার চালান এবং যাঁরা সংগঠন পরিচালনা করেন, তাঁদের মধ্যে কোনও ঝগড়া নেই ; একে অপরকে ব্যতিব্যস্ত করতে চান না, সব সময়ই সহযোগিতা করে চলেন।

পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে নেতৃত্ব যে বেশ কিছুটা আলাদা ধরণের সেটা প্রমাণিত হয়েছে দল সরকারী ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরও। অন্যান্য রাজ্যে নেতৃত্ব ক্ষমতায় থাকার সময় ঝগড়া করেছেন, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সব ঝগড়া ধামাচাপা দিয়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় এক হয়েছেন, হাত মিলিয়েছেন। এখানে কিন্তু যাঁরা ক্ষমতায় থাকতে মোটামুটি এক ছিলেন, ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই তাঁরা একেবারে বিপরীতমুখী।

দুটো বড় দল হয়ে গিয়েছে এখানে এবং এই দু'দল হওয়ার ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁদের স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। অধিকাংশ অ-কংগ্রেসী রাজ্যেই যখন কংগ্রেসীরা ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টায় এক, এখানে তখন নেতৃত্ব সেই ক্ষমতায় ফিরে আসার প্রশ্নেই দ্বিধাবিভক্ত।

রাজ্য কংগ্রেসে এখন মোটামুটি শিবির দুটি। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরি-স্থিতিতে এবং আলাদা কারণে এই দুই শিবিরের পুষ্টি হলেও এঁদেরও অনায়াসে সেই বহু পুরাতন 'প্রো-চেঞ্জার' এবং 'নো-চেঞ্জার' নামে অভিহিত করা যায়। একটি শিবির চাইছেন, অবিলম্বে রাজ্যের বর্তমান সরকারের 'চেঞ্জ' বা পরিবর্তন ঘটাতে। আর এক শিবির এখনই কোনও পরিবর্তনে বিরোধী।

বিরোধের এই মূল কারণের সংগে অবশ্য সুবিধা এবং সুযোগ মত যে যেমন পারছেন অন্যান্য কয়েকটি গৌণ কারণও জুড়ে দিচ্ছেন।

রাজ্য কংগ্রেসে এই অন্তর্বিরোধের এখন দ্বিতীয় অংক চলছে। প্রথম অংক শেষ হয়েছে ২৬ জুলাই। শুরু হয়েছিল ২৫ ফেব্রুয়ারী। প্রথম অংকে সবে সূত্রপাত, তাই উচ্চতম পর্যায়ে সে বিরোধ তেমন প্রকাশ্যে আসেনি। দ্বিতীয় অংকের সূত্রপাত বেশ কিছুটা আশাভঙ্গ এবং অনেক তিক্ততার মধ্য দিয়ে। এই বিরোধ এখন প্রায় প্রকাশ্যে। তলওয়ার না দেখা গেলেও খাপের ঝংকার এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

২৫ ফেব্রুয়ারী প্রথম অংক শুরু হয় শ্রী নির্মলেন্দু দে'র একটি বিবৃতি নিয়ে। সেই সকালেই শ্রীদের বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্য ছিল: রাজ্য বিধানসভার ২৮০ টির মধ্যে কংগ্রেস যখন ১২৭ টির বেশি আসন পান নি এবং যখন অ-কংগ্রেসীরা ১৫৩টি আসন পেয়েছেন, তখন ওঁদেরই প্রথম সরকার গঠনে সুযোগ পাওয়া উচিত। জনসাধারণ ওঁদের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। এই বিবৃতি প্রকাশে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ।

কংগ্রেস ভবনে উচ্চতম পর্যায়ের সকল কংগ্রেস নেতার উপস্থিতিতে এই বিবৃতি তৈরী হলেও সকলের সেটা মনঃপুত ছিল না। অনেকে চেয়েছিলেন: অপেক্ষা করা হোক। দেখা যাক ১৪ জন পাওয়া যায় কিনা এবং সরকার গঠন সম্ভব কিনা। কিন্তু ২৪ ফেব্রুয়ারী রাত্রে তাঁরা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পান নি। সেদিন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও ওই বিবৃতি সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। বিবৃতি নিয়ে আলোচনার সময় সেদিন কংগ্রেস ভবনের সেই ঘরে শ্রীসেন ও শ্রীঘোষ ছাড়াও সর্বশ্রী অশোক সেন খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বিজয়সিং নাহার, রবীন্দ্রলাল সিংহ, বিজয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিরাও উপস্থিত ছিলেন। সবাই সেদিন ওই

বিবৃতি প্রচারের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। বিবৃতিটি শ্রীদের নামে প্রকাশিত হয়, কারণ তখন দলের নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পরাজিত এবং সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিম মামলায় বাধাপ্রাপ্ত।

২৫ ফেব্রুয়ারী বিবৃতিটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে চাপ আসে কংগ্রেসের ওপর। যাঁরা এতদিন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ছিলেন, বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীসেন ও শ্রীঘোষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও এসে হাজির হলেন। দুটি প্রস্তাব দিলেন তাঁরা: (১) শ্রীসেন ও শ্রীঘোষকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হোক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে। বলা হোক 'আপনি নিজ ইচ্ছা মত সরকার ও দল পুনর্গঠিত করুন।' (২) তা না হলে অ-কংগ্রেসী অন্তত ১৪ জন এম এল এ-কে নিয়ে এসে সরকার গঠন করা হোক।

প্রথম প্রস্তাবে দুদিক থেকেই বাধা এল। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজী হলেন না। শ্রীসেন ও শ্রীঘোষকে সরিয়ে দেওয়ার কথা মুখে উচ্চারণ করতেও কোনও কংগ্রেস নেতা বা কর্মী সাহস পেলেন না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়েও ২ মার্চ পর্যন্ত বহু চেষ্টা চলল। কিন্তু সেখানেও বাধা দিলেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকেও প্রস্তাবের সমর্থনে নামানো গেল না। সেই কটা দিনের দৃশ্য মনে পড়ে। রথী মহারথীরা বা তাঁদের সর্বজন বিদিত প্রতিনিধিরা কংগ্রেস ভবনের করিডরে টুলের ওপর বসে আছেন। আর এক-একজন করে শ্রীঘোষের ঘরে গিয়ে আছড়ে পড়ছেন 'এ কিয়া হো রাহা অতুলবাবু'। এলেন ধেবর ভাই, এলেন জয়প্রকাশ, কিন্তু কাজ হল না। যুক্তফ্রন্ট সরকার যথা সময়ে গঠিত হল। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নব নির্বাচিত নেতা খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে রাজ্যপালের কাছে জানিয়ে আসতে হল, কংগ্রেস সরকার গড়তে পারছে না।

এইবার প্রো-চেঞ্জারেরা নতুন পথ ধরলেন। একদিকে তাঁরা দাবি তুললেন, যাঁরা এতদিন সংগঠন চালিয়েছেন, তাঁদের সরে যেতে হবে ; অন্যদিকে চেষ্টায় থাকলেন কী করে অ-কংগ্রেসীদের কয়েক-জনকে সরিয়ে নিয়ে এসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানো যায়। প্রথম লক্ষ্যে এঁরা প্রায় তিন মাসের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন, প্রদেশ কংগ্রেসে নতুন নেতৃত্ব এল। দ্বিতীয় লক্ষ্যেও কিছুটা এগোলেন। পাঁচ জনকে দলে পেলেন।

কিন্তু পুরোপুরি তাঁদের কোনও আশাই সফল হল না। পুরানো নেতৃত্ব পদ ছাড়লেন, কিন্তু সংগঠন ছাড়লেন না। অ-কংগ্রেসী এম এল এ কয়েকজন এলেন কিন্তু এত সংখ্যায় এলেন না, যাতে যুক্তফ্রণ্টের পতন ঘটে।

প্রো-চেঞ্জারদের অভিযোগ, এই দুটো কাজেই তাঁরা এখনও পর্যন্ত সফল হতে পারছে না শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্য। প্রথমত, শ্রীঘোষের সমর্থন পাচ্ছেন বলেই দলের প্রাক্তন কর্মকর্তারা এখনও সংগঠনে থাকতে পারছেন। দ্বিতীয়ত, শ্রীঘোষ বাধা দিচ্ছেন বলেই সরকারে পরিবর্তন ঘটানো যাচ্ছে না।

এই দ্বিতীয় অভিযোগ চূড়ান্তভাবে প্রকট হয় ২৬ জুলাই কংগ্রেস ভবনের এক বৈঠকে। ঠিক ছিল ঐ দিনই বিধান সভায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটানো হবে। কীভাবে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তাও পাকা হয়েছিল। কিন্তু নো-চেঞ্জাররা চাপ দিলেন একটা বৈঠক ডাকার জন্য। ২৬ জুলাই সকালে প্রো-চেঞ্জাররা সেই বৈঠক ডাকতে বাধ্য হলেন। শ্রীঘোষ সেই বৈঠকেও আবার বাধা দিলেন। (প্রো-চেঞ্জারদের একটা বড় অসুবিধা, তাঁরা পুরাতন অভ্যাস ছেড়ে এখনও মুখোমুখী বসে শ্রীঘোষের বিরুদ্ধাচারণ করতে ভরসা পান না।) নেপথ্যে আরও কিছু ঘটনা ঘটল। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতন ঘটানো গেল না।

সেদিন যে শুধু শ্রীঘোষের বিরোধিতার জন্যেই ফ্রণ্ট সরকারের

বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সমর শুরু হল না, তেমন নয়। নেপথ্যের অন্যান্য ঘটনারও কম গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু প্রো-চেঞ্জাররা মনে করলেন, সবটার জন্যই দায়ী শ্রীঘোষ। এর পরই শুরু হল দ্বিতীয় অংক।

সেই অংক এখনও চলছে। এবং দিন যতই যাচ্ছে বিরোধ ততই প্রকট। এখন কংগ্রেসের যে কোনও সভা-সমিতির তালিকা দেখলেই বোঝা যায় কে কোন পক্ষে। অনেকের ব্যক্তিগত সম্পর্কও এখন তিক্ত। যাঁরা একে অপরের সঙ্গে দিনে অন্তত একবার কথা না বলে থাকতে পারতেন না, তাঁদের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ।

কংগ্রেসের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এখন একটা নতুন দাবি উঠেছে। দাবিটা অবশ্য তুলেছেন নেতারাই। তাঁরা বলছেন, তরুণদের হাতেই দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রস্তাবটা যে কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সমর্থন করবেন। যাঁরা এতদিন মন্ত্রিত্বে ছিলেন বা যাঁরা সংগঠন চালিয়েছেন তাঁদের পরিবর্তে একটা নতুন নেতৃত্বে আসতে পারলে সম্ভবত বহু কংগ্রেস কর্মী খুশী হবেন।

কিন্তু এটাকে শুধু রাজনৈতিক লড়াইয়ের একটা কৌশল হিসাবে বেছে নিলে শেষ পর্যন্ত উদ্যোক্তাদেরই ঠকতে হবে। যেমন, কামরাজ প্ল্যানে মোরারজী, পাতিলকে তাড়িয়েও শেষ পর্যন্ত নেহেরু জিততে পারেন নি। কংগ্রেসেরও সব মুশকিল আসান হয় নি।

প্রদেশ কংগ্রেসে এখন যাঁরা কর্মকর্তা তাঁদের মধ্যে একমাত্র সভাপতি অধ্যাপক রেজাউল করিম ছাড়া আর কাউকেই ঠিক প্রবীন বলা চলে না। করিম সাহেবকে এখনই সরাবার কথা বোধ হয় কেউই ভাবছেন না।

এই সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পরিষদীয় দলেও তরুণ নেতৃত্ব এলে ভাল হয়। ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা করার একটা প্রস্তাব ছিল গোড়ায়। এখনও নেতারা সবাই একমত হলে সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব। অনেক অ-কংগ্রেসী সাধারণ মানুষ তাঁর নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানাবে।

ভুলে গেলে চলবে না, সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে সেটা প্রধানত কংগ্রেস সরকারের ক্রিয়াকলাপেরই বিরুদ্ধে। দীর্ঘকাল যাঁরা সেই সরকার চালিয়েছেন, তাঁদের মুখগুলি জনপ্রিয় নয়। কংগ্রেসকে আবার জনপ্রিয় করতে হলে, পুনরায় ক্ষমতায় আসার কথা ভাবতে গেলে সর্বাগ্রে ওইসব পুরানো মুখের পরিবর্তন প্রয়োজন। কিছু উৎসাহী উদ্যোগী সৎ চরিত্রের তরুণ ভাবী কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব নেবেন, এটা না বুঝতে পারলে মানুষ আবার কংগ্রেসকে সমর্থন করবে কোন ভরসায়?

আর একটা প্রস্তাব এই: যাঁরা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়েছিলেন, তাঁদের সরাতে হবে দল থেকে। এ প্রস্তাবটা খুব বাস্তব বলে মনে হয় না। কারণ, শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বিতাড়নের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন সকল কংগ্রেস নেতা। প্রথমদিকে কয়েকজন হয়ত শ্রীমুখোপাধ্যায়কে গোপনে কিছুটা সমর্থন জানিয়েছিলেন কিন্তু সময় মত তাঁরা সবাই সরে পড়েছিলেন। যারা প্রকাশ্যে শত্রুতা করেন, তাঁদের চেয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা নিন্দনীয়, যারা বিপদে পাশ থেকে স্রেফ কেটে যান। যেদিন শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জরুরী সভা ডাকা হল, সেদিন কংগ্রেস ভবনে আগে প্রাণ দেবার যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল, সেটা মনে পড়লে এখনও নেতা বলে পরিচিত কয়েকজন কংগ্রেসী সম্পর্কে কৌতুক ছাড়া আর কিছু মনে জাগে না। এদের একজনের তরফ থেকে তো সেদিন ফোন করে করে হাতের ছুটি ছাড়া আর সব সংবাদপত্রকে বলা হয়েছিল: দেখবেন যাতে ওঁর নামটা ছাপা হয়। উনিও টেলিফোনে প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়েছেন।

তবে যদি শ্রীমুখোপাধ্যায়-বিরোধী সকলকেই আজ কংগ্রেস কর্মীরা দল থেকে বিতাড়িত করেন, তাহলেই বা জনসাধারণ তাতে আপত্তি করবে কেন?

কোনও দিন আত্মকলহে কারও লাভ হয়নি। কংগ্রেসেরও হবে

না। কংগ্রেস নেতারা যেন ভুলে না যান, পশ্চিমবাংলায় যারা তাঁদের প্রধান প্রতিযোগী, তাঁরা জনসংঘ নয়, এস এস পি নয়, স্বতন্ত্রও নয়। তাঁরা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট। এদের আদর্শ নিষ্ঠা সে আদর্শ যাই হোক, স্বার্থত্যাগ এবং বুদ্ধিমত্তা এখনও অনেক দলের কর্মীরই ঈর্ষার বস্তু।

দলের নেতৃত্ব নিরংকুশ হলেই বা রাইটার্স বিল্ডিংস পুনর্দখল করে পারমিট লাইসেন্স বিতরণের ক্ষমতা পেলেই যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায় না এখনও কি সব কংগ্রেস নেতা তা বোঝেন নি? এখনও কি বোঝেন নি সেজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী আদর্শনিষ্ঠ রাজনৈতিক দল? সেই প্রয়োজনে দলের পুনর্বিন্যাস হয় যদি হোক; কিন্তু এখনই ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের আগ্রহের সঙ্গে এই ইস্যুকে গুলিয়ে দিয়ে সর্বসাধারণকে যেন বিভ্রান্ত না করা হয়।

১২ সেপটেমবর, ১৯৬৭।

উত্তেজিত কণ্ঠেই কথাগুলি বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ঃ দল এবং ব্যক্তির চেয়ে দেশ অনেক বড়। দেশের কল্যাণেরজন্য অনেক সময় দল ওব্যক্তিকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। আমিও মনে করি বাম কমিউনিস্টদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার চালালে দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ হবে। তাই এ সরকার আমি ভেঙে দেবই।

স্থান ঃ মুখ্যমন্ত্রীর বেলভেডিয়ারের ফ্ল্যাট। সময় ঃ ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা। উপস্থিত সর্বশ্রী সুশীল ধাড়া, সুকুমার রায়, কানাই ভট্টাচার্য, অমল গাঙ্গুলী প্রভৃতি বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ। একেবারে আলাদা একটা বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সে আলোচনা হতেই দিলেন না। শুরুতেই বললেন ঃ আলোচনা থাক। এ সরকার ভেঙে যাবে।

হতবাক বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সকলেই। ব্যতিক্রম শুধু শ্রীসুশীল ধাড়া। তিনি ইতিমধ্যেই কিছুটা জেনে ফেলেছিলেন। প্রথমে আপত্তি করলেন শ্রী অমল গাঙ্গুলী। বললেন বাংলা কংগ্রেস এবং আপনি তাহলে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। একটু ঠাণ্ডা মেজাজের লোক শ্রীসুকুমার রায়। তাই আরও একটু আস্তে তিনি বললেন কথাগুলি।

বাধা পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাগলেই তাঁর মুখ একটু লাল হয়। কথায় মেদিনীপুরের টান এসে যায়। বললেন ঃ যাই ঘটুক দলের আর আমার, কমিউনিস্টদের হাতে আমি বাংলাদেশ তুলে দিতে পারি না। তারপর কথার শেষাংশে তাঁর কণ্ঠস্বর আরও কঠোর হয়ে উঠল ঃ যখন কংগ্রেস থেকে ওরা আমায় তাড়িয়ে

দিয়েছিল, তখন কে কে এসেছিলেন আমার সঙ্গে? পরে এসেছেন অনেকেই। আজও আপনারা কেউ না এলেও আমি এগিয়ে যাব। ওদের বাদ দিয়ে নতুন সরকার গঠন করব।

আস্তে আস্তে বেলভেডিয়ারের সরকারী বাড়ির করিডরে বেরিয়ে এলেন বাংলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা।

* *

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার কথা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই তাঁরা প্রথম শোনেন নি। এর আগেও অন্তত দুবার শুনেছিলেন কথাগুলি। তবে ঠিক এতটা দৃঢ়ভাবে নয়।

৩রা সেপ্টেম্বর প্রথম তিনি খোলাখুলিভাবে কথাগুলি জানালেন ফ্রণ্টের অ-কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের। মুখ্যমন্ত্রী বললেন: এ সরকার এভাবে চালিয়ে আর লাভ নেই। রাজ্যের ক্ষতি ছাড়া ভাল হচ্ছে না। এখন দুটো ব্যবস্থা নেওয়া যায়: (১) একটি বিকল্প অ-কমিউ-নিস্ট, অ-কংগ্রেসী নতুন কোয়ালিশন গঠন। এবং (২) বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের সুযোগ করে দেওয়া। ফ্রণ্টের অ-কমিউনিস্ট নেতাদের অনুরোধে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী—এবার আপনারা স্থির করুন কি করবেন।

সবাই সময় চাইলেন ভেবে দেখার। আর বললেন: কাল থেকে ফ্রণ্টের আচরণবিধি রচনার আলোচনা শুরু হচ্ছে। দেখা যাক, কমিউনিস্টরা কী বলেন।

আচরণবিধি হয়ে গেল। দুই কমিউনিস্ট পার্টিই সব মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অন্যান্য দল ভাবলেন যাক, মুখ্যমন্ত্রী আপাতত শান্ত হলেন।

কিন্তু শান্ত যে তিনি হন নি ৫ সেপ্টেম্বরই পরিষ্কার বুঝেছিলাম সেটা। জানতে চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, আচরণবিধির পর আপনি কি আশ্বস্ত? মুখ্যমন্ত্রী হেসে জবাব দিলেন, একটি কথাও বলব না।

এর এগারো দিন পরই খবর পাওয়া গেল রাজভবনের মধ্যাহ্ন-ভোজের। জানা গেল, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের কী আলোচনা হয়েছে সেখানে। এই আলোচনার কথা শ্রীমুখোপাধ্যায় কাউকে বলেছেন কি না জানি না। তবে, এটা জানি, শ্রীসেন সেকথা জানিয়েছিলেন তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মীকে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে চলতে পারছেন না, এ মন্ত্রিসভা আর চালাতে চান না। যদি কংগ্রেস থেকে অতুল্যবাবুকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কংগ্রেসী সমর্থনে অ-কমিউনিস্ট সরকার গঠনে সম্মত। শ্রীসেন বললেন, ভেবে দেখি।

চারদিন পরে অ-কমিউনিস্ট যুক্তফ্রণ্ট শরিকদের বৈঠকে আবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর অস্বস্তির কথা জানালেন। আবার বললেন, এ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে চান। ছটি দলের প্রতিনিধি ছিলেন সে বৈঠকে। বাংলা কংগ্রেস সহ পাঁচটি দল বললেন, না, আমরা তাতে রাজী নই। বৈঠকের রায় হলো, যুক্তফ্রণ্ট যুক্তই থাকুক। তবে কঠোর হাতে আইন শৃংখলা বজায় রাখা হোক।

পরদিন যুক্তফ্রণ্টের খাদ্য বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত। অ-কমিউ-নিস্টরা আবার ভাবলেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে ঠেকানো গেল। তাঁরা জানতেন না, অন্যদিকে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। জানতেন না, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং কলকাতার প্রভাবশালী গোষ্ঠী-গুলির সমর্থনপুষ্ট শ্রীসেন কংগ্রেসকে ঢেলে সেজে যুক্তফ্রণ্ট সর-কারের পতনের পথ পরিষ্কার করতে অসম্মত নন।

২৩ সেপ্টেম্বর পাকা কথা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, হ্যাঁ তিনি যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে চান। পাকা কথা দিলেন কংগ্রেস নেতৃত্বও, কালই এ্যাডহক কংগ্রেস ঘোষণা করা হবে।

২৪ সেপ্টেম্বর শ্রীনন্দ এসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ভেঙে এ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করলেন। নন্দজীও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় কথা বলেছিলেন।

এ্যাডহক কমিটি ঘোষণার কাজটা কিন্তু এত সহজে হয় নি। চার পাঁচ মাস আগেও এ প্রস্তাব এসেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে। কিন্তু তখন তাঁরা রাজী হতে পারেন নি। দিন যত এগোল, তাঁরা মনে করলেন কমিউনিস্টরা সরকারী ক্ষমতার সুযোগে পশ্চিমবঙ্গকে বেঁধে ফেলছে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর কমিউনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যত বেশী আশঙ্কাজনক বিবরণ পাঠাতে লাগলেন, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যত মনে করলেন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, শিল্প-বাণিজ্যের পরিচালকেরা যত বেশী ভীত হয়ে উঠলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর তত বেশী চাপ এল। ধীরে ধীরে তাঁরা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে রাজী করালেন প্রস্তাবে।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় ২৩ সেপ্টেম্বর রাত্রে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর শ্রীসেন ও শ্রীনন্দ স্থির করলেন, পরদিনই কলকাতায় এ্যাডহক কমিটি ঘোষণা করা হবে। যেন ২৫ তারিখ দিল্লী পৌঁছেই শ্রীমুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাকা কথা দিতে পারেন।

সেই রাত্রেই শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রথম প্রস্তাবটা জানান শ্রীঅতুল্য ঘোষকে টেলিফোনে। শ্রীঘোষ কিন্তু এ্যাডহক কমিটির প্রস্তাবে রাজী হলেন না। পরদিন সকালে মুখোমুখি কথা হল। সে আলোচনায় শ্রীবিজয়সিং নাহারও উপস্থিত ছিলেন।

অনেক কথার পর শ্রীসেন বললেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এ প্রস্তাবে অতুল্যবাবুর সম্মত হওয়া উচিত।

শ্রীঘোষ: পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থেই আমি এ প্রস্তাবে অরাজী। এতে কংগ্রেসেরও ক্ষতি হবে, পঃ বঙ্গেরও।

শ্রীসেন: অজয়বাবু আমাকে বলেছেন, এ্যাডহক কমিটিতে কাকে কাকে নেওয়া হবে, সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলতে চান না। তিনি শুধু এ্যাডহক কমিটি চান এবং তাহলেই কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে নতুন সরকার গড়তে রাজী। অতুল্য, কমিউনিস্টরা আর

কিছুদিন থাকলে এদেশে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হবে। তুমি রাজী হলেই সব ব্যবস্থা পাকা করা যায়।

শ্রীঘোষ: আমারও আপত্তি নাম নিয়ে নয়। নীতিগত। আমি মনে করি না, এ্যাডহক কমিটি গঠন নীতিসম্মত হবে। আমি কংগ্রেসের উদ্যোগে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার বিরুদ্ধে। ওরা ভাঙতে চান ভেঙে দিন। আমরা তারপর ওদের সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থন করব।

শ্রীসেন: অজয়বাবু তাতে রাজী নন। উনি আগে এ্যাডহক কমিটি চান।

শ্রীনাহারের কথা: কমিউনিস্টদের বাড়তি এক ঘণ্টাও সরকারে থাকতে দিলে দেশের ক্ষতি। বললেন, এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতেই হবে।

শ্রীঘোষ: আমাকে Sacrifice করেও আপনারা যুক্তফ্রন্টের পতন ঘটাতে চান। আমি সম্মতি দিই, না দিই আপনাদের কী এসে যায়।

বৈঠক এখানেই ভেঙে যায়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে নন্দজী সাংবাদিকদের সম্মেলনে এ্যাডহক ঘোষণা করেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় দিল্লী গেলেন। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হল। তারপর থেকেই দিনক্ষণ এক রকম পাকা।

কিন্তু কেউ এ সম্পর্কে একটি কথাও স্বীকার করতে চান নি। সংবাদপত্রে যখনই কোনও ইংগিত প্রকাশিত হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সব অস্বীকার করেছেন। সবারই ভয় ছিল, জানাজানি হয়ে গেলে হুলস্থূল পড়ে যাবে এবং গোটা পরিকল্পনাটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তাই, বহু প্রতিবাদ, অনেক অসত্য কথন।

* * *

কিন্তু, তবু সব ভেস্তে গেল শেষ মুহূর্তে। সোমবার অর্থাৎ সেই বহু ঘোষিত ২ অক্টোবর রাত্রি ৮ টায় শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

পেছিয়ে গেলেন। রাজ্যপালকে বললেন, আমি দুঃখিত, আজকে পদত্যাগ করতে পারছি না। ৫ তারিখ রাত দশটায় জানাব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে মন্ত্রিসভার ও দলের সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে নেব।

এদিকে কিন্তু সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে রয়েছে। জেলায় জেলায় সৈন্য চলে গিয়েছে। ভিন্ন রাজ্য থেকে আসা পুলিশ শহরে গঞ্জে মোতায়েন। প্রথম দফার গ্রেপ্তারী পর্বও হয়ে গিয়েছে। এমন কি, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ও নতুন কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘোষণা করে গেজেট ছাপার জন্য বি জি প্রেসে রাজ্য সরকারের প্রচার অধিকর্তা শ্রীঅমূল্য মুখার্জিও উপস্থিত। এদিকে রাজভবনের সামনে তৈরী শ্রী পি এস মাথুরও। তাঁকেও জানিয়ে রাখা হয়েছে, প্রস্তুত থাকুন। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিও তৈরী।

দুপুরে একবার রাইটার্স বিল্ডিংসে এসে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও সব ব্যবস্থা দেখে গেলেন। চীফ সেক্রেটারী শ্রীএম এম বসুকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: যেমন যেমন বলেছিলাম সব ঠিক আছে তো? জবাব পেলেন: হ্যাঁ সব ঠিক আছে।

তবু তিনি শেষ মুহূর্তে পেছিয়ে গেলেন। কিন্তু কেন? কেন এই আকস্মিক মত পরিবর্তন? দীর্ঘদিনের এই প্রস্তুতি হঠাৎ কেন ভণ্ডুল হয়ে গেল?

এর জবাব পাওয়া যাবে সোমবার সকাল থেকে যদি আপনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এগোতে পারেন। যদি আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন কী চিন্তা নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল সেদিন তাঁর। যদি বিচার করে দেখেন, কোন পরিবেশে কাটাতে হয়েছিল সেদিনটা তাঁকে।

ভোরে, অতি ভোরে মুখ্যমন্ত্রীর যখন ঘুম ভাঙলো তখন কি তাঁর কানে বাজছিল না ছোট ভাই দামুর কথাগুলো? রবিবার মধ্যরাতে বেলভেডিয়ার ছেড়ে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বহু তর্ক বহু যুক্তি

বহু অনুরোধ-উপরোধের পর শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বলে এসেছিলেন, ছোড়দা, ভেবে দেখ, তোমার গুরুর জন্মদিনে তুমি কি করতে যাচ্ছ পশ্চিমবাংলার মানুষের সঙ্গে। ভেবে দেখ, তুমি আজ নিঃসঙ্গ কিনা। ভেবে দেখ, তুমি কার সঙ্গে যাচ্ছ পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণকে ছেড়ে। প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে নয় কি? যে প্রফুল্লচন্দ্র একদিন তোমাকে ভাসিয়েছিলেন, যে প্রফুল্লচন্দ্র এই মন্ত্রিসভাকে ভাঙার জন্য তাঁর অত বছরের ভাই অতুল্য ঘোষকেও ডুবিয়ে দিল?

তিনি একা

ভাবতে ভাবতেই সেদিন নাকি উঠেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেউ তো তাঁর সঙ্গে আসছেন না। আসছেন না ডঃ ঘোষ, আসছে না পি এস পি। আসছে না নিজের দল বাংলা কংগ্রেসেরও অনেকে। সত্যিই তো, তিনি যে একা।

এই একাকিত্বেরই সুযোগ নিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুশীল ধাড়া। সোমবার সকালে আবার গিয়ে ধরলেন তাঁকে। সংগে পেলেন মুখ্যমন্ত্রীর বহু দিনের বন্ধু শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্তকেও। সবাই আবার বললেন, না, তুমি যেতে পারবে না—তোমার পদত্যাগ করা হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তখনও বাহ্যত অটল। 'না, আমি দেশটা কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিতে পারব না। আমার যা হয় হবে।'

কিন্তু কথাগুলি বলতে গিয়েও তাঁর কণ্ঠস্বরে কি দুর্বলতার একটু আভাস ফুটে ওঠেনি? না হলে, ও-কথার পরও শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীসুশীল ধাড়া কেন বলবেন, সতীশদা, আপনি আর একটু চাপ দিন, কাজ হবে।

শ্রীসামন্ত চাপ দিলেন আরও। আবার বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রীকে, বললেন, কমিউনিস্টদের জব্দ করার পথ এটা নয়। তুমি শক্ত হও, তাহলেই ওরা জব্দ হবে।

কিন্তু একা তিনিও পারেন নি। তিনিও সাহায্য নিয়েছিলেন আর একজনের। শ্রীসামন্ত জানতেন, সঙ্গে যদি তাঁকে পান, তাহলে আর ভয় নেই। পেলেনও। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর অজয়বাবুর বৌদি, সতীশ বাবুরও বৌদি, রাজী হলেন। ছুপুর ছুটো নাগাদ সোজাসুজি বললেন তিনি কথাটাঃ ওরা সবাই যখন না বলছে, যখন বলছে কাজটা ভাল হবে না, তখন করারই বা কী দরকার।

এরপর মুখ্যমন্ত্রী আর কিছু বলতে পারেন? না পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে খবর গেল শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাড়া খবর দিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে। তখন সেখানে পি ইউ এল এফ-এর নেতারা সমবেত। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী বললেন, এখুনি সবাই চলে আসুন বেলভেডিয়ারে, সঙ্গে হেমন্তদাকে আনবেনই।

সওয়া তিনটে নাগাদ সবাই পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রীর ফ্ল্যাটে। প্রথম কথা বললেন শ্রীহেমন্ত কুমার বসু। তাঁর প্রথম কথাঃ অজয়, তুমি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে? ছু'জনের চোখেই তখন জল।

অনেক আলোচনা হল সেখানে। অনেক তর্ক। অনেক যুক্তি। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আচ্ছা কাল এ নিয়ে আরও কথা বলব। কাল ক্যাবিনেটও বসবে। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন শ্রীসতীশ সামন্ত এবং বৌদিও। রাজভবন পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন তাঁরা।

গাড়ি যখন রাত আটটা বাজার তিন মিনিট আগে রাজভবনে ঢুকল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তখনও তাঁরা। এই ছুজনের স্নেহ ও প্রীতি-ডোর থেকে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারও নেই।

সবার উপরে গদিই সত্য

তিন পক্ষই অটল। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসবেই, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হবেনই এবং যুক্তফ্রণ্ট রাইটার্স বিল্ডিংস কিছুতেই ছাড়বে না। এই তিন পক্ষের মনোবাসনা যদি একই সঙ্গে পূরণ করা যেত তাহলে অবশ্য মুশকিল আসানে তেমন অসুবিধা হত না। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় বলেই পশ্চিমবঙ্গে আজ এক অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সেইজন্যই এত গণ্ডগোল।

রাজ্যের এই রাজনৈতিক অস্থিরতা কবে শেষ হবে তাও বলা কঠিন। শেষ পর্যন্ত কার মনোবাসনা কী ভাবে কতটা পূর্ণ হবে, একমাত্র জ্যোতিষী ছাড়া কারো পক্ষে এখনই তা বলা সম্ভব নয়। আজও চূড়ান্ত একটা কিছু ঘটতে পারে, আবার দেড় দু-মাসও এই দোদুল্যমান অবস্থা চলতে পারে।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলছে এবং প্রবাদবাক্য অনুসারে যথারীতি উলুখাগড়াদের প্রাণ যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর দফা বেশ ভালভাবেই রফা হচ্ছে। সরকারী কাজকর্ম প্রায় অচল। মন্ত্রিসভা যেমন প্রধানত আত্মরক্ষার কাজেই ব্যস্ত, সরকারী কর্মীকুলও তেমনি কাজের চেয়ে কী হবে জানার জন্যেই বেশী ব্যগ্র। ফাইলগুলি যেখানকার যেমন দাঁড়িয়েই থাকছে। রাজ্য উন্নয়ের কাজকর্ম তো ইতিমধ্যে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। যে খাদ্য সংগ্রহের জন্য সকল পক্ষের চিন্তার অন্ত নেই, তারও ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ধান কাটার মুখোমুখি এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। প্রশাসনই যখন প্রায় অচল তখন খাদ্য সংগ্রহ ব্যবস্থাই বা সচল হয় কী করে?

যুক্তফ্রণ্ট গদিতে থাকুক আর নাই থাকুক ডঃ ঘোষ মুখ্যমন্ত্রী হোন

আর নাই হোন, কংগ্রেস সোজা বা বাঁকা যে পথেই ক্ষমতায় আস্থক—এই অস্থিরতার ঘূর্ণিতে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে। সবচেয়ে আশংকার, যে জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য সকলেরই বুকফাটা কান্না, সেই জনসাধারণ বা সাধারণ মানুষ কিন্তু এই পশ্চাৎ-গতিটা চাক্ষুষ দেখতেই পাচ্ছে না। বুঝতেই পারছে না, মঙ্গলের নামে হিতৈষীরা কী অমঙ্গলটাই করছেন।

যে যাই বলুন, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের প্রবীণ নেতৃত্বের অধ্যবসায়ের তারিফ না করে পারছি না। এঁদের এ যুগের রবার্ট ব্রুস বলা যায়। লক্ষ্য স্থির—যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবই; রাইটার্স বিল্ডিংসে আবার ফিরে যাবই। ২৪ ফেব্রুয়ারী যখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ সবাইকে বোঝালেন, এই অবস্থায় যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করা মূর্খতা, তখন থেকেই এঁরা ক্ষুন্ন। মুখোমুখি শ্রীঘোষের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস না পেলেও আড়ালে অনেকেই সখেদে বলেছিলেন, 'কাজটা ভাল হলো না।' সেইদিন থেকেই এঁরা দুটি মহৎ কাজে লেগে পড়লেন: (১) যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটাও; এবং (২) সে পথে 'ভেতরের কাঁটা' অতুল্য ঘোষকে খতম কর।

সঙ্গীসাথীও পেলেন অনেক। 'ঘাবড়াইয়ে মৎ'-এঁরাও পাশে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম প্ল্যানে টারগেট ডেট ১৬ জুলাই। ডাঃ ঘোষ পদত্যাগ করবেন, তাঁর সমর্থকরা বিধানসভায় যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন, (তখন বিধানসভায় অর্থ-বিলের আলোচনা চলছে), এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার পতন ঘটবে। নতুন কোয়ালিশন হবে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। মন্ত্রীদের নামও একরকম পাকা। কংগ্রেসের ১৩২ জন সদস্যই সভায় উপস্থিত হলেন নির্দ্ধারিত দিনে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব ভেস্তে গেল। স্বয়ং ডঃ ঘোষ কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। তাঁর সমর্থকরাও কেউ কেউ ভয় পেলেন।

আবার ঠিক হল ৮ আগস্ট হবে। কিন্তু ফ্রণ্টের নেতারা সব

টের পেয়ে ৪ আগস্টই বিধানসভার অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতারা একটু চিন্তায় পড়লেন।

কিন্তু তবু দমলেন না তাঁরা। কাজ শুরু হল শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্র করে। টারগেট ডেট ২ অক্টোবর। সব ঠিকঠাক। দুপুর পর্যন্ত ঘড়ি ধরে কাজ এগোল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে দেখা গেল নির্দ্ধারিত শিল্পী বিগড়ে গিয়েছেন। তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, রাজভবনেও যথাসময়ে গেলেন, কিন্তু চরম মুহূর্তে ভূমিকা গ্রহণে রাজী হলেন না। কংগ্রেস পরীষদীয় দলের নেতাদের বুকে শেল বিঁধল।

আবার শুরু হল নতুন পথে যাত্রা। শুরু হল নতুন আলোচনা। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতারা আবার ডঃ ঘোষের দ্বারস্থ হলেন, ধরলেন আবার অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরকে। সেই পরিকল্পনারই পরিণতি খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং আরও ষোলজন বিক্ষুব্ধ এম এল এ-র ফ্রণ্ট ত্যাগ। সেই পরিকল্পনা মত কাজকর্ম ঠিকই এগিয়েছে। পথে অবশ্য কিছু বাধা-বিপত্তি এসেছে। কিন্তু এখনও মোটামুটি সব ঠিক আছে। এবার তাঁরা ধরেই নিয়েছেন, লক্ষ্যে পৌঁছবেনই। কেউ তাঁদের রুখতে পারবে না।

* * *

বিরোধী পক্ষ ক্ষমতায় আসতে চাইবেন, তাতে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু বিরোধী পক্ষের একমাত্র লক্ষ্য যদি হয় যেভাবে সম্ভব ক্ষমতায় ফিরে আসা, অর্থাৎ সরকারকে গদিচ্যুত করা, তাহলে রাজ্যের যেমন ক্ষতি হতে বাধ্য তেমনি ক্ষতি নিশ্চিত বিরোধী দলের।

গণতন্ত্রে বিরোধী পক্ষের প্রধান দায়িত্ব সরকারের দোষত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া, তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং চরম মুহূর্তে তাকে সজোরে আঘাত হানা। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এই দায়িত্ব কতটা পালন করেছে?

কংগ্রেস তার সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিরই বা কতটা চেষ্টা করেছে এই আট মাসে? কংগ্রেসের 'কাম ব্যাক' গ্রুপের নেতাদের সকল চেষ্টা রাইটার্সের উদ্দেশ্যে বলেই এ্যাডহক কমিটির এত ঢক ঢক আওয়াজ শোনা গিয়েছিল।

আর, যাঁরা মনে করেন সরকারী ক্ষমতায় না ফিরে আসা গেলে দল রাখা যাবে না, কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হবে না, একটানা উনিশ বছর রাইটার্সে থেকেও তাঁদের নিশ্চয়ই শিক্ষা হয়নি যে, ওভাবে কোনও রাজনৈতিক দলকে বাঁচানো যায় না; কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করাও সম্ভব হয় না।

কংগ্রেস নেতাদের আগে স্থির করে নিতে হবে তাঁরা কী চান—কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই, না রাইটার্সের গদি? যদি তাঁরা সত্যিই কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করতে চান তাহলে এরপর তাঁরা কোন পথে লড়াইটা চালাতে চান—পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুসারে, না বন্দুকের জোরে?

যদি পার্লামেণ্টারি পথই শ্রেয় মনে হয়, তবে ধীরে ধীরে এগোতে হবে, জনমতকে সঙ্গে পেতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। এ পথে সর্টকাট নেই। দীর্ঘ পথ। কষ্টের পথ। কলে কারখানায়, মাঠে ময়দানে মানুষের পাশে দিয়ে দাঁড়াবার পথ। শুধু রাইটার্স বিল্ডিংস দখল করে এ পথের মোক্ষ লাভ হবে না।

আর যদি তাঁরা মনে করেন বন্দুকের পথই শ্রেয়, তাহলে ডঃ ঘোষ বা অধ্যাপক কবিরের দ্বারস্থ হওয়া ভুল। তাহলে জেনারেল কুমারমঙ্গলম বা মানেকশর কাছে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কংগ্রেস নেতাদের ভুলে গেলে চলবে না দীর্ঘকাল স্বদেশে ও বিদেশে কমিউনিস্টদের ক্রিয়াকলাপ দেখেও যাঁরা আজ পশ্চিমবঙ্গের কমিউ-নিস্টদের রাইটার্সে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কবির এবং ডঃ ঘোষের অবদানও কম নয়।

আমার মনে পড়ে ১৯৫৭ সনে সাধারণ নির্বাচনের মুখে মনু-মেন্টের পাদদেশে ডঃ ঘোষের বক্তৃতা, 'কমিউনিস্টরাও ডাইন হাত দিয়া ভাত খায় আমরাও তাই খাই—তফাৎ মৌলিক নয়।' এই মৌলিক আবিষ্কারের মূল কারণ ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির আশ্বাস। তাঁরা ডঃ ঘোষকে বলেছিলেন, বামপন্থীরা জিতলে আপনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

মনে পড়ে, এবারের নির্বাচনের মুখে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছবার জন্য অধ্যাপক কবিরের আকুলতা এবং ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তর সঙ্গে তাঁর 'বন্ধুত্বপূর্ণ' 'ভাইভাই' বৈঠকগুলির কথা।

শিশুরা যদি বলে, আমরা কমিউনিস্টদের চিনতাম না, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু প্রবীণ রাজনীতিবিদরা যখন কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ঘড়ি ঘড়ি মত পাল্টান, তখন তাঁদের রাজনৈতিক সততা সম্পর্কেই সন্দেহ উদ্রেক হয়।

* * *

কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং ডঃ ঘোষ ও কবির গোষ্ঠী এমন বলেই কিন্তু মনে করার কারণ নেই যে, যুক্তফ্রন্টের নেতারা বা দলগুলি মহৎ কোনও আদর্শ অনুসরণ করে চলছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমারের মনোভাব ছিলঃ তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? যুক্তফ্রন্টের নেতাদের মনোভাব ঠিক তার উল্টোঃ তুমি অধম, আমিই বা উত্তম হইব কেন?

যেভাবেই হোক, ফ্রন্ট যে এখন বিধানসভায় লঘিষ্ঠ, তাতে ফ্রন্ট নেতাদের মনেও সন্দেহ নেই। হিসাব দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতাও তাঁরা দেখাতে পারেন নি। তবু আইনের সুযোগ নিয়ে এঁরা গদি আঁকড়ে থাকবেন। এমন কি দলত্যাগীদের মন্ত্রিত্ব দিয়েও নাকি মন্ত্রিসভাকে বাঁচাতে চান। এঁরা বিধানসভায় আলোচনা না করেই খাদ্যনীতি চালু করেন। এঁরা কাজ নেই বলে বিধানসভা

বন্ধ রাখেন, অথচ অর্ডিন্যান্স করে কর বসান। এঁরা জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে এক হতে পারেন না, কিন্তু গদি রক্ষার তাগিদ এলেই অটুট ঐক্য গড়ে তোলেন।

একমাত্র কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলারদের সঙ্গে এঁদের কিছুটা তুলনা চলে। পৌরকল্যাণে তাঁরা কখনও এক নন; কিন্তু সরকার যে মুহূর্তে হুমকি দেন পৌরসভা বাতিল করে দেবে—সঙ্গে সঙ্গে সব এক প্রাণ। অসাধারণ একতা! যুক্তফ্রন্ট তেমনি। কাজের চেয়ে ঝগড়া বেশী। কিন্তু মন্ত্রিসভা ভাঙার মুখে এলেই সেই একতা, সেই একপ্রাণতা।

জনহিতে তাঁরা একপ্রাণ হতে পারলে কিন্তু আজ জনসাধারণই প্রাণ দিয়ে ফ্রন্টটাকে রক্ষা করতো—কেউ আঁচড় কাটতেও সাহস পেত না।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৭

ভয়াবহ ঘূর্ণি

অবশেষে আবার স্বর্গের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, মর্ত্যের বহুশক্তিমান রাজ্যপাল, কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের সহ-যোগিতায় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাকরণের মহাসনে সমাসীন। প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার তিনি পশ্চিমবাংলায় মুখ্যমন্ত্রী হতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে পূর্ণ হয়েছে কংগ্রেস পরিষদীর দলের নেতাদেরও মনো-বাসনা—আপাতত তাঁরা ঠেকনো হয়েছেন, পরে হয়তো খুঁটিও হবেন। সন্তুষ্ট হয়েছেন হুমায়ুন কবিরও—শ্রীঅজয়কুমার মুখো-পাধ্যায়কে ক্ষমতাচ্যুত করা গিয়েছে। 'রাম নাম যে সৎ হ্যায়' তাও প্রমাণিত সঙ্গে সঙ্গে—কারণ যাঁরা 'সত্যনাশ' করতে বসেছিলেন, তাঁরা বিদায় হয়েছেন।

এক কথায় যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা মৃত। প্রায় সাড়ে আটমাস নিরলস প্রচেষ্টার পর ফ্রণ্ট বিরোধীরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন। বারংবার ব্যর্থকাম হয়েও হাল ছাড়েন নি বলেই আজকের সাফল্য। একেবারে রবার্ট ব্রুস। শেষ পর্যন্ত পাশুপাত অস্ত্রে বাজীমাৎ করতে হল।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার 'হত', কিন্তু পারলৌকিক ক্রিয়া দূরের কথা, দাহই এখনও সম্ভবপর হয়নি। কবে নাগাদ ডঃ ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীরা এই কাজটি সুসম্পন্ন করে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচার সুযোগ পাবেন (এবং আদৌ পাবেন কি না) কেউ জানে না। মনে পড়ে কিছুদিন আগে ফ্রণ্টের একজন অ-কমিউনিস্ট নেতার মুখে শোনা সতর্কবাণী। ভদ্রলোক হাসতে হাসতেই বলেছিলেন: এখনই আমাদের মারা খুব সহজ। কিন্তু এখনই যদি আমাদের মারে তো দেখ ওরা মৃতদেহ সৎকার করতে পারবে না। মৃতদেহের বিষাক্ত গ্যাসে কিছুদিনের মধ্যেই ওদের দমবন্ধ হবে।

নিরপেক্ষ অনেক নাগরিকের পক্ষেই অবশ্য ডঃ ঘোষ, রাজ্যপাল বা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপকে বিনা দ্বিধায় 'জয়মস্তু' বলা কঠিন। নিজেরই সাম্প্রতিক সকল বক্তব্যকে অস্বীকার করে কিছু অনিশ্চিত মতিগতি ব্যক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডঃ ঘোষ আজ যে ভাবে পশ্চিমবাংলার মসনদে বসলেন, তা অস্বস্তিকর। অন্তত ডঃ ঘোষের কাছে সাধারণ মানুষ তা আশা করেনি। এতদিন পর্যন্ত অনেকের কাছেই নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদী বলে তিনি পরিচিত ছিলেন।

যদি শুধু ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কার্যকলাপে বা কমিউনিস্টদের আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়েই তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতেন, তাহলেই অনেকেই তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনতেন, তাঁর বক্তব্যের যথেষ্ট মূল্যও দিতেন। কিন্তু কম লোকের পক্ষেই এখন তা করা সম্ভব। কারণ, খাদ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়তে না ছাড়তেই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন যে। সেজন্যেই কি রাজ্যপালের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্যে তিনদিন অপেক্ষা না করেও তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র শ্রীআশু ঘোষের জনৈক ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর হাতে অর্পণ করেছিলেন? রাজভবনে পাঠান নি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও জমা দেন নি? অনেকেই কমিউনিস্ট বিরোধী, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্যের দোহাই পেড়ে সব উপায়ের কি সাফাই হয়?

১৯৪৮ সনে মুখ্যমন্ত্রীত্ব যাওয়ার পর থেকেই বরাবর ডঃ ঘোষের মুখে শোনা গেছে, কংগ্রেস পূতিগন্ধময়। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পর্কে তিনি বলেন নি এমন কথা নেই। এঁদের এবং কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯৫৭ এবং ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে তিনি অন্যপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কংগ্রেস নেতারা তাঁকে ১৯৪৮-এ ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, একথাও তিক্তভাবে উক্ত হয়েছে। ১৯৬৭-র নভেম্বরে সেই কংগ্রেসেরই বরাভয়ে মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে জানলে তিনি নিশ্চয়ই বাক্য ব্যবহারে আরও হিসাবী হতেন।

আরও একটা কথা। কিছুদিন আগে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষ কলকাতার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সঙ্গী সাথীদের দেখে একজন মানুষকে চেনা যায়—a man is known by the company he keeps. এই কথাটা এখন বোধহয় রাজ্যপাল এবং তাঁর মুখ্যমন্ত্রীরই বেশি মনে রাখা উচিত। ইদানীং রাজভবন, মুখ্যমন্ত্রীর ফ্ল্যাটে এবং রাইটার্স বিল্ডিংসে যাঁদের আনাগোনা বেড়েছে, তাঁদের সকলের সামাজিক পরিচয় বা কৌলিন্য কি প্রশ্নাতীত বা নৈকষ্য !

*　　　*　　　*

কংগ্রেসীদের ক্ষেত্রে অবশ্য গুড বা ব্যাড কম্প্যানীর প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। ১৯৪৭ সন থেকে তাঁদের একমাত্র সাধ সিংহাসনে আসীন থাকা এবং অধুনা একমাত্র সাধনা, সিংহাসন ফিরে পাওয়া। সরকারী ক্ষমতায় থাকতে থাকতে তাঁদের এখন সরকারী ক্ষমতার সঙ্গে অনেকটা মাছ ও জলের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। জল ছাড়া মাছ বাঁচে না, ডাঙ্গায় তুললেই ধড়পড় করে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসেরও সেই দশা হয়েছে। সেই জন্যেই পশ্চিমবঙ্গে জুন-জুলাই মাস থেকেই তাঁদের উদ্যোগ পর্বের উদ্বোধন হয়েছে। প্রথমে তাঁরা ডাঃ ঘোষ, তারপর অধ্যাপক কবির, অতঃপর শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এবং সর্বশেষে আবার ডঃ ঘোষ ও অধ্যাপক কবিরের শরণাপন্ন হয়েছেন। সে প্রয়াস পুরস্কৃত।

এই প্রয়াসের কথাটা অবশ্য কংগ্রেস নেতারা স্বীকারই করতে চান না। তাঁরা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিপন্ন গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই এইভাবে তাঁদের এগোতে হল। উত্তম, চরৈবেতি, গণতন্ত্র সম্যকরূপে রক্ষিত হোক! কিন্তু তাঁরা যেন ভুলেই গিয়েছেন যে, জনগণকে সঙ্গে না নিয়ে গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। বন্দুকের সাহায্যে হয়তো অপরপক্ষকে অনেকটা জব্দ করা যায়, সদস্য ভাঙ্গিয়ে নিশ্চয়ই কোনও সরকারকে গদিচ্যুত করা সম্ভব, কিন্তু ওপথে

গণতন্ত্রকে বাঁচানো যায় না। আপনা-বাঁচার আশাও আখেরে সফল হয় কি ?

কংগ্রেস নেতারা ইতিহাসের প্রায় সব শিক্ষাই ভুলে গিয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ শুধু বুদ্ধিমান নয়, রাজনীতির মারপ্যাঁচেও ওস্তাদ এবং সাধারণ মানুষকে নিমেষে নিজের কাছাকাছি নিয়ে আসার কৌশলে অদ্বিতীয়। ভুলে গিয়েছেন, এই প্রতিপক্ষের সঙ্গে গণতন্ত্র ও বন্দুকতন্ত্রের জগাখিচুড়ি দিয়ে লড়াই চালানো সম্ভব নয়—এদের সঙ্গে লড়তে গেলে জনগণকে সঙ্গী পেতে হয়, জনগণকে সঙ্গী পেতে হলে জনমনকে বুঝাতে হয়। বাহু অথবা মন, দু'য়ের একটাকে বেছে নিতে হবে।

কংগ্রেসের যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন ছিল, সেটা হল একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন—যে সংগঠন রাজনৈতিক পর্যায়ে সকলের সঙ্গে সমানে সমানে লড়তে পারবে। রাজ্য কংগ্রেসের মধ্যেও যে এই চিন্তাধারা ছিল না তেমন নয়। কিন্তু 'রাইটার্স বিল্ডিংস চল' দলের চালে আজ তাঁরা পরাস্ত। আজ আবার তাই সরকারই মুখ্য, সংগঠন গৌণ। কংগ্রেস আবার রাইটার্স বিল্ডিংসের দুর্গে বসে অপর পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার স্বপ্নে মসগুল!

কংগ্রেস যেমন গণতন্ত্র রক্ষার নামে গণতন্ত্রের দফারফা করছে, যুক্তফ্রণ্ট তেমনি 'গণতন্ত্র বাঁচাও' অভিযানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক 'স্পিরিট' একেবারে উবিয়ে দিতে চাইছেন। পৃথিবীর সকলেই সংসদীয় গণতন্ত্রের পূজারী হবেন, তেমন কোনও কথা নেই। ভিন্ন মতও থাকতে পারে। আছেও তা। কিন্তু মুখে যাঁরা গণতন্ত্র বাঁচাও বলবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে চলবেন। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট কিন্তু ঠিক উল্টো কাজটা করেছেন এবং করছেন। তাঁরাও দীর্ঘকাল বিধানসভাকে এড়িয়ে গিয়েছেন; তাঁরাও দল ভারি করতে চেয়েছেন, তাঁরাও সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে

জনকল্যাণের চেয়ে দলগত স্বার্থসিদ্ধির দিকে বেশী নজর দিয়েছিলেন। এখনও তারা জনমত গঠনের চেয়ে উত্তেজনা ছড়াবাব ব্যাপারে বেশী উৎসাহী। এর একটা কাজও গণতন্ত্র সম্মত নয়।

যুক্তফ্রন্ট যদি এভাবে না চলতেন, যদি সত্যিই জনহিতে কায়-মনোবাক্য হতেন, তাহলে কংগ্রেস, অধ্যাপক কবির বা ডঃ ঘোষ কেউই এতদূর এগোতে পারতেন না। মার্চ মাসেও কংগ্রেস নেতাদের সামনে এই প্রস্তাব ছিল, মার্চ মাসেও কংগ্রেসেরও হয়ে কেউ কেউ দু'একজন ফ্রন্ট নেতার কাছে বিকল্প বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনতার রুদ্ররোষের ভয়ে সে সাহস সেদিন কারও হয়নি। আজ হল। কারণ, আজ জনগণ যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কেও অনেকটা আশাহত। তাঁদের আত্মকলহের নগ্নরূপ দেখে, তাঁদের দলগত স্বার্থসিদ্ধির স্পৃহা দেখে জনগণও অনেকটা বীতশ্রদ্ধ। যদি তাঁরা সঠিক পথে চলতেন, যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসীকে দেখাতে পারতেন যে, তাঁরা জনহিতে একপ্রাণ, একমন ও সচেষ্ট, তাহলে আজ বলতেও হত না 'লাগাও'—জনসাধারণ নিজেই লেগে যেত।

যুক্তফ্রন্ট নেতাদের বুদ্ধি ছিল। তাঁদের কর্মক্ষমতারও অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু সমবেত সদিচ্ছার। বারংবার তাই আবেদন-নিবেদন করা সত্ত্বেও তাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারেন নি। শুধু চটকদারী কথা বলে বাজার মাত করতে চেয়েছেন। তাঁদের অনেকেই আজ কংগ্রেস, ডঃ ঘোষ এবং অধ্যাপক কবিরের সাহসের শিকড়।

সন্দেহ নেই, আজ পশ্চিমবাংলা এক ভয়াবহ রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে পড়েছে। এর শেষ কোথায়, অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কেউ জানে না। সবচেয়ে দুঃখের এবং হতাশার বিষয় এ রাজ্যে আজ মানুষের কল্যাণের কথা খুব কম নেতাই ভাবছেন। তাঁদের প্রধান চিন্তা হয় ব্যক্তি, না হয় দল।

যেখানে দল ও ব্যক্তির স্বার্থ ই প্রধান, যেখানে সরকারী ক্ষমতাই *মোক্ষ, যেখানে সবার উপর গদি সত্য, সেখানে সাধারণ মানুষের* দুর্ভোগ বাড়তে বাধ্য। বাড়ছেও।

২৮ নভেম্বর, ১৯৬৭।

গণতন্ত্র রক্ষার বিষম এই প্রতিযোগিতা

একদা এক রাজা পরিহাস ছলে তাঁর মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : ওহে মন্ত্রী, আমি একটা খারাপ কাজ করব, তুমি তা মুছে দিতে পারবে? নিমেষে মন্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন, কেন পারব না মহারাজ, নিশ্চয়ই পারব। একটু আশ্চর্য হয়েই রাজা জানতে চাইলেন, কী করে? মন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, আপনার চেয়েও জঘন্য একটা কাজ করে। রাজা তারপরও বলেছিলেন, আমি যদি তার চেয়েও খারাপ একটা কাজ করি? মন্ত্রী আবার জবাব দিয়েছিলেন, আমি আরও জঘন্য একটা কাজ করব—যেন আপনার কাজের কালিমাও ম্লান হয়ে যায়।

সেই রাজার বুদ্ধি ছিল, বিবেচনা ছিল। সেই মন্ত্রীও মূর্খ বা অপরিনামদর্শী ছিলেন না। সেদিন তাই রাজা এবং মন্ত্রী খারাপ কাজের প্রতিযোগিতায় নামেন নি। তাই সে যুগের মানুষেরও সেই প্রতিযোগিতা দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

এ যুগের মানুষ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার মানুষ কিন্তু সে তুলনায় অনেক বেশী সৌভাগ্যবান। খারাপ কাজের প্রতিযোগিতা দেখার একটা অসাধারণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন তাঁরা। উদ্দাম গতিতে সেই প্রতিযোগিতা চলেছে। একজন এক কদম এগোচ্ছেন তো আর একজন তিন কদম যাচ্ছেন। কেউই কোথাও থামতে রাজী নন, হার মানায় দুপক্ষেরই আপত্তি।

আরও মজার, নিন্দনীয় কাজ করেও দু' পক্ষই বলেছেন, আমি আমি যা করছি তা দেশের এবং দশের মঙ্গলের জন্যই, তার সবটাই আইনসম্মত। দুপক্ষেরই দাবি, আমরা গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যই সবকিছু করে যাচ্ছি। দু'পক্ষেরই যুক্তি, আমরা যা করছি তা না করলে গণতন্ত্র ও দেশ গোল্লায় যাবে।

বাহ্যত পশ্চিমবঙ্গে এই গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিযোগিতা সাম্প্রতিক মনে হলেও এর মূল কিন্তু বহু দূরে। আসলে এই লড়াই শুরু হয়েছে বহুদিন পূর্বেই। যেদিন যুক্তফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বড় দল স্থির করেন, রাইটার্স বিল্ডিংসকে প্রধানত দলগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হবে এবং যেদিন কংগ্রেস সংকল্প করে, যে কোনও ভাবে ফ্রন্ট সরকারকে গদীচ্যুত করতে হবে—সেদিন থেকেই পশ্চিমবঙ্গে এই বিদঘুটে গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিযোগিতা শুরু। সেই জন্যই কিছু অ-কংগ্রেসী এম এল এ-কে সরিয়ে এনে ফ্রন্টকে সংখ্যালঘু হয়েও ফ্রন্ট ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চেয়েছে।

বলব না, যাঁরা ফ্রন্ট ত্যাগ করেছেন তাঁদের সকলেরই ফ্রন্ট ত্যাগের পেছনে প্রধান কারণ কংগ্রেসের উস্কানী। কিন্তু কয়েকজনার ক্ষেত্রে যে প্রধান কারণ সেইটাই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য এই সত্যটা স্বীকারই করতে চান না। জানি স্বীকার করা তাঁদের পক্ষে খুব সহজ নয়। কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করলেই সত্যকে চাপা যায় না। যেমন অসত্য বলা যায় না মধ্য কলকাতার একটি ফ্ল্যাট বাড়ীতে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সরবরাহ করে কয়েকজন ফ্রন্টত্যাগীকে ধরে রাখার ঘটনাকে।

ঠিক এইভাবেই অস্বীকার করা যায় না প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে ফ্রন্টত্যাগীদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টাকে। মন্ত্রী করার লোভ দেখিয়ে দলত্যাগীদের ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা বা নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করে কারও মত বদলাবার কৌশল নিশ্চয়ই গণতন্ত্রসম্মত নয়। এর কোনও প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। কিন্তু এমন প্রচেষ্টা যে হয়েছিল, সে কথা অস্বীকার করার নৈতিক অধিকার কোনও ফ্রন্ট নেতার আছে কি?

এর পরই শুরু হল এক বিচিত্র লড়াই। সংখ্যালঘু ফ্রন্ট বললেন, নেতারা একবারও দেখাতে পারেন নি, তাঁরা সংখ্যালঘু নন। আমরা মাস দেড়েকের মধ্যে বিধানসভা ডাকবই না, আমরা গদিতে অধিষ্ঠিত

থাকবই। কংগ্রেস ও ফ্রন্টত্যাগীরা বললেন, যে কোনও ভাবে ওদের গদিচ্যুত করতেই হবে।

শেষ পর্যন্ত জিতলেন কংগ্রেস ও ফ্রন্টত্যাগীরা। মহাশক্তিমান রাজ্যপাল পাশুপত অস্ত্র ছেড়ে ফ্রন্ট সরকারকে শেষ করলেন। এই পর্যায় থেকেই গণতন্ত্র রক্ষার অগণতান্ত্রিক লড়াই প্রকাশ্যে।

* * *

সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল প্রচণ্ড দ্রুততার সঙ্গে ফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করলেন এবং ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কংগ্রেস সমর্থনপুষ্ট ফ্রন্টত্যাগীদের নেতা ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষের মুখ্য মন্ত্রীত্বে নতুন এক সরকারকে গদিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে ১৬৪ ধারা বলে একটি সরকারকে গদিচ্যুত করার ঘটনা এই প্রথম। কংগ্রেস বলছে, কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন, এই কাজ সম্পূর্ন গনতন্ত্র সম্মত। তাঁরা পৃথিবীর আর কোথাও এমন কোনও নজীর না খুঁজে পেয়ে নাইজেরিয়ার এক ঘটনাকে দেখিয়ে দাবি করছেন, কোনও সরকার সংখাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন মনে করলে রাজ্যপাল নিশ্চয়ই সেই সরকারকে বাতিল করতে পারেন।

নাইজেরিয়ায় নজির খোঁজার চেয়ে ১৬৪ নং ধারার আক্ষরিক অনুবাদের উপর ভরসা করাই বোধ হয় কেন্দ্রের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ এই ধারায় পরিষ্কার বলা আছেঃ The ministers shall hold office during the pleasure of the governor. অর্থাৎ মন্ত্রীদের গদি রাজ্যপালের খুশীর উপর নির্ভর করছে। একেবারে মোঘলাই ব্যবস্থা। এত ক্ষমতাই যখন রাজ্য-পালদের আছে, তখন আর নাইজেরিয়ার নজির দেখানো কেন?

রাজ্যপাল যখন ১৬৪ নং ধারা বলে কাজটা প্রায় সুসম্পন্ন করে এনেছেন, ঠিক সেই সময় সেই সংবিধানের (এবং বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির) আক্ষরিক অনুবাদ ভরসা করেই কেন্দ্র এবং রাজ্যপালকে ভেলকি দেখালেন স্পীকার। বিধানসভায় স্পীকারই

সর্বেসর্বা। তিনি যে রুলিং দেবেন তা সবাই মানতে বাধ্য। বিধান সভার কার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কোনও রুলিং আদালতেও নিয়ে যাওয়া যাবে না। সেই সর্ব শক্তিমান স্পীকার বললেন, আমি ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষকে মুখ্যমন্ত্রীত্বে মানি না। যে ভাবে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করা হয়েছে, সেটা বেআইনী। এই ঘটনার পরই সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। এখন যতবার বিধানসভা ডাকা হবে ততবারই কি তিনি এই রুলিং দিয়ে সভা মুলতুবি রাখবেন ? এ এক অদ্ভুত অচল অবস্থা !

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে, দুই সর্বশক্তিমান পুরুষ, রাজ্যপাল ও স্পীকার ইচ্ছা করলেই অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন। যতই বলা হোক আমাদের সংবিধান খুব গণতান্ত্রিক, এই সংবিধানের আক্ষরিক অনুবাদ করেই যে কোনও স্পীকার এবং যে কোনও রাজ্যপাল (কেন্দ্রের সমর্থন পেলে) সম্পুর্ণ একনায়ক হয়ে বসতে পারেন।

১৬৪ নং ধারার যদি আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় তাহলে কেন্দ্রের সমর্থন পুষ্ট যে কোনও রাজ্যপাল যে কোনও মন্ত্রিসভাকে নিজ খুশী মত খারিজ করে দিতে পারেনা। সে মন্ত্রিসভার বিরাট সংখ্যা-গরিষ্ঠতা থাকলেও। কারণ বলা হয়েছে ঃ the ministers shall hold office duriug the pleasure of governor. এই ভাবে নিশ্চয়ই মাদ্রাজের রাজ্যপাল অনায়াসে ডি এম কে সরকারকেও বাতিল করতে পারেন। ১৬৪ নং ধারায় একবারও বলা হয়নি, রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনও মন্ত্রিসভাকে খারিজ করতে পারবেন না। কেন তিনি মন্ত্রিসভাকে খারিজ করলেন, সে কারণ দর্শাতেও রাজ্যপাল বাধ্য নন। তিনি অখুশী—এটাই মন্ত্রিসভা খারিজ করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের সংবিধানের মূল সুর কি তাই ?

সংবিধান রচয়িতারাঃ কি রাজ্যপালকে মোঘল সম্রাট বানাতে চেয়েছিলেন ?

সংবিধান এবং বিধানসভার কার্য পরিচালন বিধির আক্ষরিক অনুবাদ ধরা হলে স্পীকার এক হিসাবে রাজ্যপালের চেয়েও বেশী ক্ষমতাবান। কেন্দ্রীয় সরকার (নামে রাষ্ট্রপতি) ইচ্ছা করলে যে কোনও রাজ্যপালকে পদচ্যুত করতে পারেন। কিন্তু স্পীকার নিজে বাধা দিলে অনিচ্ছুক হলে এবং গদি আঁকড়ে থাকতে চাইলে কেউ তাঁকে সরাতে পারেন না। স্পীকারকে সরাবার জন্যও স্পীকারের সহযোগিতা চাই। আরও মজার, সদস্যরা না চাইলেও স্পীকার সামান্য কোনও অজুহাতে যে কোনও সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা বন্ধ রাখতে পারেন। বিধানসভা ডাকার মালিক রাজ্যপাল, কিন্তু চালাবার কর্তা স্পীকার। সেখানে তাঁর কথাই শেষ কথা। এমন কি যে কোনও মার্চ মাসে হঠাৎ সভা বন্ধ করে বাজেট পাশে বাধা দিয়ে তিনি যে কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারকে অচল করে দিতে পারেন।

এ ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন, আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধান কি স্পীকারকে এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিতে চেয়েছিল ?

আমরা কথায় কথায় ব্রিটেনের নজির টানি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ব্রিটের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বড় তফাৎ হল আমাদের গণতন্ত্রে এখনও রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে তেমন ভয় পান না। তাঁরা জানেন, যে যাই করুন শেষ পর্যন্ত ভোট পাবেনই—অর্থাৎ ভোট আদায় করতে পারবেনই। এখানে এখনও অর্থ এবং অনর্থ, ভলান্টিয়ার এবং জীপের উপর ভোট যতটা নির্ভরশীল ততটা অন্য কিছুর উপর নয়।

অতীতের ইতিহাস ঘেঁটে লাভ নাই ; সম্প্রতি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে যে মনোভাব দেখালেন ব্রিটেনে কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও তা ভাবতে পারবেন না। আবার

সংখ্যালঘু হয়ে গদি আঁকড়ে বসে থাকার চেষ্টা করাও ব্রিটেনে কল্পনাতীত। আর শ্রীবিজয় ব্যানার্জীর ন্যায় সংকল্পে অটল স্পীকার ব্রিটেনে কোনও দিন হবে বলে মনে হয় না।

এখানে কেউ জনমতকে তেমন ভয় করেন না, তাই যে যা খুশী করে যেতে সাহস পান। এদেশে শত্রুর হাতে রাষ্ট্রকে মার খাইয়েও মানুষ হিরো থাকে। এদেশে শত্রুকে প্রকাশ্যে মিত্র বলেও কোনও কোনও দলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অশীতিপর বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে লগুড়াঘাত করেও কেউ কেউ বাহবা পান। স্পীকারকে ভয় দেখাবার জন্যে বোমা মারার পরিকল্পনা লোকের মাথায় আসতে পারে। কারণ, এখানে জনমত তেমন জাগ্রত নয়। আমাদের গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সেইখানেই।

আজ পশ্চিমবঙ্গে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, আজ এখানে গণতন্ত্র রক্ষার নামে অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের যে প্রতিযোগিতা চলছে, অবিলম্বে তার অবসান না হলে এর তিক্ততা আরও বাড়লে ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। আইনের ফাঁকে বা বেআইনী পথে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করলে পরিণামে সবাইকে ঠকতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সকলের সদিচ্ছা, সকলের শুভ বুদ্ধির জাগরণ।

একটা প্রস্তাব আছে এই প্রসঙ্গে। কেন্দ্রীর সরকার, কংগ্রেস, রাজ্যপাল, স্পীকার, যুক্তফ্রন্ট—সকল পক্ষের কাছেই এই প্রস্তাবটি পেশ করছিঃ আপনারা সকলে একত্রে বসে কতকগুলি প্রশ্ন রচনা করুন। ১৬৪ ধারা প্রয়োগ থেকে আজ পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটেছে, সব নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট যেভাবে নির্দেশ দেবেন, সেইভাবেই সকলে চলবেন; সুপ্রীম কোর্ট আবার যেখান থেকে যাত্রা শুরু করতে বলবেন, সেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে।

ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানও বহুলাংশে আদালতের রায়ে রচিত। ডাইসির ভাষায়ঃ

"The English Constitution, far from being tne result of legislation in the ordinary sense of the term, is the fruit of Contests Carried on Courts."

রাজভবনে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, কোনও দলীয় আইনবিদের পরামর্শে বা দাপটে ব্যাখ্যা না হয়ে আমাদের সংবিধানেরও ব্যাখ্যা হোক আমাদেরই উচ্চতম আদালতে। আমাদের গণতন্ত্রের শক্তি তাতে বাড়বে—ভিত্তি দৃঢ় হবে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬৭

ঘরের মধ্যে ঘর

যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি হঠাৎ একটা নতুন মোড় নিয়েছে ফ্রন্টের ছোট আটশরিক দলিল দস্তাবেজে সই করে ফ্রন্টের ভেতরেই যেন আলাদা 'ফ্রন্ট' গড়েছেন এবং একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হলেও বড় শরিকদের প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতেই বলেছেন : এস, এবার।

একটা বহু পুরানো ঘটনা মনে পড়ে গেল ফ্রন্ট রাজনীতির এই পরিবর্তন দেখে। উত্তর কলকাতার ভাল্লুক পাড়ায় একটা মস্তান বাহিনী ছিল। দলে জনা পাঁচেক বড় মস্তান, আর সবাই শাকরেদ। শাকরেদরা একেবারে ভৃত্যবৎ ব্যবহৃত হত—যেন পাঁচ বড়কর্তার হুকুম তামিল করার জন্যই তাঁদের অস্তিত্ব। কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল শাকরেদরা রুখে দাঁড়িয়েছে। ঘিরে ধরেছে পঞ্চ প্রধানকে। বলছে : তোমরাই সব মধু লুটবে আর আমরা ঢু ঢু! তাজ্জব ব্যাপার। বড় পাঁচজন যেন প্রায় হার মেনেই বললে : মেলাই অত ফ্যাক ফ্যাক করছিস কেন, কি লিবি বল্ না।

জানি, সম্পর্ক যতই তিক্ত হোক, ফ্রন্ট রাজনীতিতে ওই ভাষা কোনও দিন ব্যবহৃত হবে না। এও জানি, যতই তাঁরা চটে যান, ফ্রন্টের ছোট আট কেন দশ দল একত্রিত হলেও বড় চার শরিককে খুব বেশি ঘাঁটাতে সাহস পাবেন না। কারণ ওরা চার দলই যে একযোগে বিধানসভার ২৮০-র ভেতর ১৬৭। আরও জানি, ছোট ভাইয়েরা যতই বড় বড় কথা বলুন, ফ্রন্ট রাজনীতির দাদাদের ছেড়ে তাঁরা খুব বেশি দূর এগোতে পারবেন না।

কিন্তু তবু বলব, এই আট দলের আলাদা ভাব যুক্তফ্রন্ট রাজনীতিতে একটা বড় ঘটনা। আর কিছু না করুন, ওরা এমন একটা জোট বাঁধতে পেরেছেন যে, জোট অন্তত রাজ্যসভার

নির্বাচনের ব্যাপারে ১৯৭০ এবং ৭২ সনে চারটি বড় দলকেই অসুবিধায় ফেলতে পারে। এবারের নির্বাচনে যদিও এই জোট বেকায়দায় ফেলেছে শুধু ফরওয়ার্ড ব্লককে।

৭০ সনেও সি পি এম তুজন বের করে নিতে চান। একই লক্ষ্য সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক জোটের। এবার তাঁরা নিজ শক্তি বলেই চার জনকে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারলেও পরের তুটি নির্বাচনে পারবেন না। এবার দরকার মাথাপিছু ৪১ জন এম এল এ-র ভোট, ৭০ ও ৭১-এ দরকার হবে ৪৭ করে। সি পি এম-এর শক্তি ৮৩, তিন পার্টির একত্রে ৮৪। তাই এবার কুললেও পরে আর শুধু নিজ শক্তি বলে পার পাওয়া যাবে না। যদি ৭০ এবং ৭২ সনেও ছোট আটের জোট ঘোষণা মত তাঁদের মোট শক্তি ৪৭ নিয়ে লড়াইয়ের আসরে নামবেন, তাহলে বড় চার ভাই মহা ফাঁপরে পড়বেন। তখন তাঁদের ভরসা করতে হবে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও নির্দল ভোটের উপর।

* * *

ফ্রন্টের ভিতরে আবার ফ্রন্ট হোক, যুক্তফ্রন্টের কোনও হিতৈষী তা চাইবেন না। এটা যে শুধু যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির পক্ষেই ক্ষতিকর তাই নয়, সরকার পরিচালনার ব্যাপারেও অশুভ। ঘরের ভিতর ঘর হলে যেমন হাওয়া বাতাস চলাচলে বাধা পড়ে, তেমনি ফ্রন্টের ভিতর ফ্রন্ট হলে সরকারী কাজকর্মে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতে বাধ্য। দলীয় স্বার্থেই দপ্তরে দপ্তরে কাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে, সাধারণ মানুষ ভুগছেন, তারপর যদি আবার খুব বেশি আসে গোষ্ঠী স্বার্থের ঝগড়া, তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু তবু অস্বীকার করে উপায় নেই গোড়া থেকেই ফ্রন্ট রাজনীতিতে কখনও কম কখনও বেশি গোষ্ঠী গড়া-ভাঙ্গা চলছে। পি ইউ এল এফ এবং ইউ এল এফ। তারপর হল আলিমুদ্দিনের দল এবং বেলভেডিয়ারের দল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এবার আবার শুরু

থেকে দেখা গেল আলিমুদ্দিনে এবং বেলভেডিয়ারে প্রায় হরিহর আত্মা। এখন আবার রাজ্যসভার নির্বাচন নিয়ে একেবারে সব ভেঙ্গে তিন নতুন গোষ্ঠী। যার একদিকে সি পি এম, মাঝখানে সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক এবং আর একদিকে ছোট আট দল। এ ছোট আট দলও শ্রীসুধীনকুমারের আর সি পি আই এবং শ্রীবরদা মুকুটমনির বলশেভিক পার্টিকে সঙ্গে নেননি। কারণ, ওদের কোনও এম এল এ নেই।

ফ্রন্ট রাজনীতির এই গোষ্ঠী গড়া-ভাঙ্গার ব্যাপারটা যদি কেউ একটু খতিয়ে দেখেন, তাহলে চোখে পড়বে এর সবচেয়ে কদাকার দিকটা। দেখবেন, এর পেছনও মতাদর্শগত লড়াই নেই, নেই কোনও সুষ্ঠু রাজনীতি, আছে শুধু দলীয় লাভ-লোক-সানের হিসাব আর প্যাঁচ কষার কসরৎ! ঠিক যে জিনিসটা আরও একধাপ নীচে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নেমে কংগ্রেস রাজনীতিকে ধূলি-মলিন করে তুলেছে।

ফ্রণ্টের বর্তমান দলাদলির কথাই ধরা যাক। এর ভিতর কোনও আদর্শের লড়াই আছে? (শ্রীনীহার মুখার্জী এবং শ্রীমাখন পাল অবশ্য বলবেন, ছোট পার্টিগুলির প্রতি বড়দের অবিচারের প্রতিবাদে আদর্শগত লড়াই করছেন তাঁরা) সিট পাওয়া না পাওয়ার লড়াইয়ের ভিতর আবার আদর্শ কি? সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লক যেভাবে তিন বছরে ছটি আসন বের করে নিতে চাইছেন তার মধ্যে আদর্শ কোথায়? অথবা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে তিন বছরে নিজ শক্তিরও বেশি আসন দাবি করছেন, সেটাই বা মার্কস সাহেবের কোন্ নির্দেশ অনুসারে?

* * *

আরও একটু খতিয়ে দেখলে আরও নগ্নভাবে ধরা পড়বে ফ্রণ্টের ভিতরের লড়াইয়ের চরিত্র। সেই মন্ত্রিসভা গঠনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি মনে পড়ে? মুখ্যমন্ত্রীত্ব এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব নিয়ে সেই বিরোধ

মনে আছে? সেই সময় সি পি আই, বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে মুখ্য এবং স্বরাষ্ট্র (প্রশাসন ও রাজনীতি) মন্ত্রী করার জন্য জোট বেঁধেছিলেন, সেটা সকলেই জানেন। কিন্তু এটা অনেকেই জানেন না যে, এই জোটের মধ্যেই আবার শেষ দিকে হঠাৎ কী বিচিত্র খেলাই না শুরু হয়েছিল।

বাংলা কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যখন শুনলেন যে, দিল্লী থেকে সি পি আই নেতারা আসছেন সব মিটমাট করে দিতে এবং যখন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ওই দুই দলের নেতাদের জানালেন, 'কী আর করব, বুঝছ তো সব, তোমরা একটু শক্ত হয়ে থেক—দিল্লীর কর্তারা যা বলবেন তাই মেন না।' তখন সর্বশ্রী সুশীল ধাড়া, সুকুমার রায় এবং অশোক ঘোষ কী করেছিলেন জানেন কি? তখন সেই রাত্রেই প্রায় দেড়টার সময় সুশীলবাবু যোগাযোগ করেছিলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে। আর জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে, আমাদের কোন দাবি নেই, সি পি আই কী করবে না করবে জানি না, কাল সকালেই আমরা আপনাদের সঙ্গে সব মিটমাট করে নিতে চাই। বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং সি পি আই-কে কিন্তু তখন সুশীলবাবুর একবারও মনে পড়ে নি। কি বিচিত্র ঐক্য!

পরের দিন দপ্তর ভাগের সময় আবার সি পি এম এবং বাংলা কংগ্রেস একজোট হয়ে কীভাবে ফরওয়ার্ড ব্লককে কাত করলেন, সে আর এক মহাভারত।

ফ্রন্টের ভিতরের লড়াই বা জোট বাঁধাবাঁধি আদর্শভিত্তিক নয় বলেই তা টেঁকে না—ঘণ্টায় ঘণ্টায় জোট পাল্টায়। ৬৭ সন থেকেই এ জিনিস চলে আসছে। ফ্রন্টের কোনও শরিক এর ব্যতিক্রম নন। এমন যে মার্কসবাসী কমিউনিস্ট পার্টি (যার নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত অহরহ সি পি আই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, 'ওরা আর একজন কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দিতে ভরসা পায় না, দিতে চায় একজন অকমিউনিস্ট নেতাকে।) তাঁরাই বা কী করে

আর এক কমিউনিস্ট পার্টিকে জব্দ করার জন্য শ্রীসুকুমার রায় মারফৎ 'জোতদারের পার্টি' (বিশ্লেষণটা সি পি এম-এর শ্রেণী বিন্যাস অনুসারেই) বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে মধুর মিতালি গড়ার চেষ্টা করেন ?

*　　　　*　　　　*

ফ্রণ্টের ভিতরের ঝগড়ায় যে আদর্শহীনতা প্রকট, সেটা অন্যান্য ক্ষেত্রেও ফুটে উঠতে বাধ্য, যদি না দলগুলি সংযত হোন। এই আদর্শহীনতা একদিন দগদগে ঘা-এর মত কংগ্রেসের সর্বাঙ্গে ফুটে উঠেছিল। জনসাধারণ কংগ্রেস এবং কংগ্রেসী শাসনের সর্বাঙ্গে সেই ঘা দেখতে পেয়েছিলেন। এই আদর্শহীনতার ঘা সর্ব অঙ্গে ফুটে বের হবার আগে ফ্রণ্টের নেতারা সতর্ক হোন। সাধারণ মানুষ আদর্শের লড়াইকে অশ্রদ্ধা করে না। অশ্রদ্ধা করে দলগত বা ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির ঝগড়াকে।

২৭ জুন, ১৯৬৯।

প্রচারমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য যদি ন'পৃষ্ঠাব্যাপী এক বিবৃতিতে তাঁদের সরকারের গৌরবোজ্জ্বল চার মাসের কাহিনী বর্ণনা না করতেন, তাহলে অন্তত আমি এখনই যুক্তফ্রন্ট শাসনের চার মাসের পর্যালোচনায় নামতাম না। কারণ, যদিও সকালেই দিনের আভাস পাওয়া যায়, তাহলেও আমি মনে করি না চার মাসে সত্যিকারের কোনও হিসাব-নিকাশ সম্ভব বা সঙ্গত। যুক্তফ্রন্টও অন্তত গতবার তা করেন নি। সরকার ১৯৬৭ সনে এই হিসাব হাজির করেছিলেন ৬ মাসের শেষে।

সেবার শ্রীসোমনাথ লাহিড়ি ছয় মাসের শেষে যা করেছিলেন এবার শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য পাঁচ মাসের মুখেই সেই কাজটা করে ফেললেন। একেবারে যে অকারণে তা নয়। পরিস্থিতি এবার অনেকটা ভিন্ন বলেই জ্যোতিবাবুকে দু'মাস এগিয়ে আসতে হল। জবাবদিহিটা এবার অন্তত ষাট দিন আগে করা যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ফ্রন্টের গণসংযোগ মন্ত্রী তা বুঝেছেন। তিনি নিশ্চয়ই দেখেছেন, অনেক মানুষের মনে এবার বেশ আগেই যেন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তাই তিনি দু'মাস এগিয়ে এসেছেন—দীর্ঘ বিবৃতিতে বলতে চাইছেন সব সংশয় ঝুটা হ্যায়।

জনসাধারণের মধ্যে এই সংশয়ের ভাব যে শুধু ফ্রন্টের প্রচারমন্ত্রীর চোখেই ধরা পড়েছে তেমন নয়, পড়েছে একাধিক শরিকের নজরে। সি পি আই, আর এস পি প্রভৃতিরা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন, সাধারণ মানুষ কিছুটা আশাহত। কেন, সে-সম্পর্কে অবশ্য যথারীতি নানা মুনির নানা মত।

সি পি আই এম অবশ্য এই আশাভঙ্গের ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ

ভুল বলে মনে করেন। শ্রীজ্যোতি বসু এবং শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত রায় দিয়েছেনঃ ফ্রণ্ট সরকার ভালই চলছে। প্রশ্ন তুলেছেন : মানুষ যে আশাহত তার ইঙ্গিত কোথায়? কই, তেমন তো কিছু দেখছি না।

ফ্রণ্টের কোন্ শরিকের পর্যবেক্ষণ কতটা ঠিক বা ভুল, সে বিতর্কে না গিয়ে আসুন আমরা প্রচারমন্ত্রীর বিবৃতির মূল আলোচনায় ফিরে যাই। শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য যে কথাগুলি বলেছেন, তা সামগ্রিক ভাবে ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভারই পক্ষে। ওটা কোনও দলের বা ব্যক্তির বিবৃতি নয়। তাই 'কী হয়েছে, কতটুকু হয়েছে' সেই শরিকী বিরোধে না গিয়ে ওই সরকারী বিবৃতিটি শুধু একটু উল্টে পাল্টে দেখা যাক।

আমি একবারও আশা করিনি প্রচারমন্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে শরিকী বিরোধের প্রসঙ্গটা টেনে অথবা মুখ্য ও উপমুখ্যমন্ত্রীর মন কষাকষির কিছু জানা, কিছু অজানা প্রসঙ্গ তুলে বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করবেন, এর ফলে ফ্রণ্ট সরকারের কাজকর্মে কী কী অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এটা খুবই আশা করেছিলাম যে, যুক্তফ্রণ্টের বাস্তববাদী নেতারা যখনই জমা-খরচের হিসাব নিতে বসবেন, তখনই জমাটা যেমন দেখাবেন তেমনি দেখাবেন খরচের দিকটা। অর্থাৎ যেমন তাঁরা বলবেন বা মানুষকে জানাবেন 'কী পাইনু' তেমনি স্বীকার কববেন, 'কী পাইনি' এবং 'কেন পাইনি'।

শ্রীভট্টাচার্যের দীর্ঘ বিবৃতিতে কিন্তু এই 'না পাওয়ার' দিকটা চেপে গিয়েছেন। এই চার মাসে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের 'কুড়ি দফা প্রাপ্তিযোগের' ফিরিস্তির সঙ্গে তিনি এক দফাও অ-প্রাপ্তিযোগের উল্লেখ করেন নি। বা বলেন নি, পথ চলতে গিয়ে ফ্রণ্ট সরকারের সামনে নতুন কোনও অভাবনীয় সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে কিনা। কেন ফ্রণ্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচীর অনেকগুলি সম্পর্কে সরকার এখনও কোনও পদক্ষেপই করতে পারেন নি, প্রচারমন্ত্রীর বিবৃতিতে সে সম্পর্কেও কোনও কথা নেই।

যেমন ধরুন, বত্রিশ দফার প্রথম দফার প্রসঙ্গ। ফ্রন্টের এক নম্বর প্রতিশ্রুতি ছিল : ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যে সৎ এবং পরিচ্ছন্ন এমন এক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা হবে, যাতে সরকারী কাজকর্মে দক্ষতা বাড়ে, খরচ কমে এবং নির্ভেজাল নিরপেক্ষতা বজায় থাকে। একটি 'রাজ্য প্রশাসন সংস্কার কমিটি' গঠন করা হবে। কী ভাবে দ্রুত জনগণের অভাব অভিযোগের সুরাহা করা যায় এই কমিটি সেই সম্পর্কে পথ বাতলাবেন।

জিজ্ঞেস করতে চাই, এই প্রথম দফা প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য গত চার মাসে তাঁরা কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? যদি না করে থাকেন বা না করতে পারেন, তার কারণই বা কী? রাজ্য প্রশাসন সংস্কার কমিটি গঠনে বাধাই বা কোথায়?

এই সঙ্গে প্রত্যেকটি নাগরিক বিচার করে দেখুন, গত চার মাসে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা কতটা সৎ এবং পরিচ্ছন্ন, দক্ষতা কতটা বেড়েছে, মানুষের অভাব অভিযোগের সুরাহা এখন আগের চেয়ে তাড়াতাড়ি হচ্ছে কিনা। এ ব্যাপারে পার্টিগুলির বক্তব্য বা রায় শোনার কোনও প্রয়োজন নেই, দৈনন্দিন জীবনে যাঁরা সরকারী অফিস কাছারির সংস্পর্শে আসেন, তাঁরাই ভাল জানেন কী কী হয়েছে বা কী কী হয়নি।

অথবা আসুন, ফ্রন্টের দুই নম্বর প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে। দুই নং দফায় বলা হয়েছে : যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবে। গত বিশ বছরের কংগ্রেসী এবং পি ডি এফ রাজত্বে মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ অফিসার এবং রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে যেসব অভিযোগ উঠেছে, সেইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি ট্রাইবুনাল গঠন করবে।

প্রচারমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, এই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আপনারা এখনও পর্যন্ত কী কী করেছেন? ভিজিলেন্স কমিশন যাদের সম্পর্কে

'অভিযোগ তদন্ত' করছেন এই রকম কয়েকজন কংগ্রেস আমলের কুখ্যাত উচ্চপদস্থ অফিসারকে কয়েকজন বিশিষ্ট ফ্রন্টমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রীতিভাজন হতে দেখেই অবশ্য আমি পাঠককে সিদ্ধান্ত করতে বলছি না, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। বা, সরকারী শিল্পে মাল কেনাবেচা নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ টাকার ঘুষের খেলা চলছে এমন কানাঘুষা শুনেই সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে দুর্নীতি বেড়েছে। অথবা, বাসের পারমিট দান বা লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য এখনও বেসরকারী পর্যায়ে ঘুষ দিতে হয়, একথা শুনলেই যে বিশ্বাস করতে হবে তারও কোনও মানে নেই। আমি শুধু জানতে চাই, দুর্নীতি দমনের জন্য কী কী করা হয়েছে ? ট্রাইবুনাল গঠনের কতদূর ?

এস এস পি-র শ্রীবিমান মিত্র একদিন যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে এইসব প্রশ্ন তুলেছিলেন। শুনেছি, শ্রীজ্যোতি বসু সেই বৈঠকেই সকলকে বুঝিয়ে বলেছিলেন কেন এখন সরকারের পক্ষে ওই প্রতিশ্রুতি পালন সম্ভব হচ্ছে না। প্রচারমন্ত্রী যদি উপমুখ্যমন্ত্রীর ওই বিশ্লেষণ তাঁর বিবৃতির সঙ্গে বা আলাদা ভাবেও প্রকাশ করতেন, তাহলে যে পশ্চিম-বঙ্গবাসীর অনেকটা চৈতন্যোদয় হত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রচারমন্ত্রী অবশ্য তাঁর বিবৃতিতে দাবি করেছেন যে, জেলা স্কুল বোর্ড এবং পঞ্চায়েত বাতিল করার ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করবে। ভট্টাচার্য মশাইর এই দাবি সকলের পক্ষে মানা একটু কঠিন। প্রথমত, স্কুল বোর্ড ও পঞ্চায়েত সম্পর্কিত ওই সরকারী সিদ্ধান্ত মূলত প্রশাসনিক না রাজনৈতিক, সে সম্পর্কেই অনেকের মনে সন্দেহ আছে। দ্বিতীয়ত, বোর্ড বা পঞ্চায়েত থেকে কংগ্রেসীরা গেলেই যদি দুর্নীতি সমূলে উৎপাটিত হত তাহালে তো রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলি বা কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান এতদিনে পূত পবিত্র হয়ে যেত।

এইভাবে কর্মসূচীর দফাওয়ারী আলোচনায় আর এগোতে চাই না। প্রধান কারণ স্থানাভাব। বত্রিশ দফার আলোচনায় অন্তত

ষোল কলম লিখতে হয়। তার চেয়ে এ আলোচনা আপাতত এইখানেই শেষ করা যাক।

তবে শেষ করার আগে এটা বলে রাখা প্রয়োজন যে, নতুন সরকার প্রতিশ্রুতি মত সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের জন্য অনেক কিছু না করলেও, রাজ্যের অনেকের জন্য আবার অনেক কিছু করেছেনও। যেমন সরকারী পর্যায়ে বেনামী জমি উদ্ধার, সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

এর প্রথম কাজটিতে লুকানো জমির মালিক ও তাঁদের বন্ধুরা চটলেও জমিগুলি যে ভালর জন্যই কিছু শোষকের হাত থেকে সরকার বের করে আনতে পেরেছেন তাতে আমার অন্তত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দ্বিতীয়টিও অভিনন্দনযোগ্য। যে উদ্দেশ্যেই বাড়ান, সরকার এই দুর্মূল্যের দিনে কয়েক লক্ষ পরিবারের আয় বাড়িয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। তবে একটা শুধু প্রার্থনা, সরকারের এই কৃপাদৃষ্টি যেন সমাজের অন্যান্য স্তরেও কিছুটা পড়ে।

৪ জুলাই, ১৯৬৯

তাঁদের মতাদর্শে যতই পার্থক্য থাক, রাজনীতি যতই ভিন্ন হোক —একটা ব্যাপারে কিন্তু কংগ্রেস যুক্তফ্রণ্টের অধিকাংশ শরিকের সঙ্গে একমত। এই বিষয়টি হল সি পি আই এম এর বিরুদ্ধে সরকারী প্রশাসন, বিশেষ করে পুলিসকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অভিযোগ।

কংগ্রেস যে ভাষায় বা যে ভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলেছেন, ফ্রণ্টের সব শরিকও যে ঠিক সেই ভাবেই অভিযোগটা এনেছেন তা নয়। আবার, ফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যেও এ ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য আছে। সি পি আই, এস ইউ সি বা ফরওয়ার্ড ব্লক যেভাবে নাম করে খোলাখুলি সি পি আই এম কে অভিযুক্ত করেছেন, বাংলা কংগ্রেস বা আর এস পি এখনও তা করেন নি। ফ্রণ্টের শরিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবশ্য এগিয়েছেন এস এস পি-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব—তাঁদের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজর্জ ফারনাণ্ডেজের সঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসুর তো এখন একটা গরম বিবৃতির লড়াই-ই চলছে।

সবাই খোলাখুলি কথাগুলি বলছেন না অথবা ভাষাও সকলের সমান কড়া নয়, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মনোভাব তাঁদের কম কঠোর অথবা বিরক্তি বা বিক্ষোভে হেরফের আছে। বরং, যাঁরা প্রকাশ্যে কম বলছেন নেপথ্যে তাঁরাই গজরাচ্ছেন বেশি। যেমন বাংলা কংগ্রেস। শ্রীসুশীল ধাড়া বিভিন্ন জেলায় বাংলা কংগ্রেস কর্মীদের কাছে যে সব বক্তৃতা দিচ্ছেন বা সি পি এম সম্পর্কে যে অভিযোগগুলি তুলেছেন তার ঝাঁজ এস ইউ সি-র যে কোনও প্রকাশ্য বক্তব্যের তুলনায় অনেক বেশী। অথবা, আর এস পি দলের মধ্যে সি পি আই এম-এর ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি যে ঝড় বয়ে গিয়েছে

তার দাপট সি পি আই রাজ্য কাউন্সিলের সি পি আই এম বিরোধী পর্যালোচনার চেয়ে কোনও অংশেই কম ছিল না।

আর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়? তাঁর মনোভাব কী? অজয়বাবু এখনও প্রকাশ্যে সি পি এম সম্পর্কে বিরূপ কোনও মন্তব্য করেন নি। কিন্তু তাঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কী পাশের ঘর থেকে শ্রীজ্যোতি বসু তার সবটাই না হলেও অনেকটা নিশ্চয়ই আঁচ পান। মন্ত্রিসভার সর্বাধিনায়ক রূপে সব ফাইল তলব *করার বা আটকে দেওয়ার বিশেষ অধিকার তিনি এখনও প্রয়োগ* করতে শুরু করেন নি বটে, এখনও প্রধানত তাঁর বিরক্তি বা ক্ষোভ শুধু পুলিস সুপার বা জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ওই নম্র ভদ্র গান্ধীবাদীর ভেতরে ভেতরে যে মেদিনীপুরের একবোখা ব্রাহ্মণের তেজ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে, এটা অনেকেই জানেন। কতটা অবিশ্বাস বাড়লে মন্ত্রিসভার সহকর্মীরা সন্দেহ করতে পারেন যে, একটি দলের পক্ষ থেকে তাঁদের টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে বা তাঁদের পেছনে ফেউ লাগিয়ে রাখা হয়েছে!

কংগ্রেস সি পি আই এম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবেন বা তাদের তীব্র বিরোধিতা করবেন—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সি পি এম রাজ্যের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী কংগ্রেস বিরোধী দল, সি পি এম-এর রাজনীতি কংগ্রেস রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এইসব নানা কারণেই কংগ্রেস সি পি এম বিরোধিতা স্বাভাবিক। কংগ্রেস তাই সি পি এম-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলবেই। না তুললেই বরং আশ্চর্য হতাম। কিন্তু প্রশ্ন হল, যুক্তফ্রন্টের অধিকাংশ দলও কেন এই চার মাসের মধ্যে এতটা তীব্র সি পি এম-বিরোধী হয়ে উঠলেন? কেন এতগুলি দল আজ মার্কসবাদী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ নানা অভিযোগ তুলছেন? কেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারী যন্ত্র দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা থেকে আরম্ভ করে গুণ্ডাদের

আশ্রয় দেওয়া, প্রাদেশিক দাঙ্গা বাধানো পর্যন্ত নানা জঘন্য অভিযোগ উঠছে ?

সি পি এম নেতারা জবাব দিচ্ছেন, এর সব অভিযোগই ভিত্তিহীন। শ্রীজ্যোতি বসুকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, কই মশাই, ওরা তো আমাদের কাছে কিছু বলে না। 'সবই ভিত্তিহীন' বা 'ওরা তো আমাদের কাছে কিছু বলে না' বলে সবটা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেই কি সকল অভিযোগ উড়ে যায় ? না, জনগণ বিশ্বাস করেন সি পি এম-ই সদা সত্য কথা বলছেন আর সবাই মিথ্যাবাদী ? 'ওরা না হয় আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটে বা উপমুখ্যমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে বলেন নি 'প্রমোদবাবু জ্যোতিবাবু, এই আমাদের অভিযোগ,' কিন্তু প্রমোদবাবু বা জ্যোতিবাবু কি 'ওদের কাছে জানতে পারেন না তোমরা যে বক্তৃতায়, বিবৃতিতে ও প্রস্তাবে এত অভিযোগ তুলছ, বল তার ভিত্তি কি ; দাও নজীর।" যখন প্রমোদবাবু বা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে ওইসব দলের বাক্যালাপ বন্ধ নয় এবং যদি তাঁরা সত্যিই নির্দোষ হন তাহলে কি সহযোগীদের কাছে সি পি আই এম নেতাদের স্পষ্টকথা জানতে চাওয়া উচিত নয় ? এবং অভিযোগগুলির স্পষ্ট জবাব দিয়ে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার প্রয়োজন নেই ?

* * *

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এবং ফ্রন্টের অন্যান্য সকল দলের নেতাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, সাধারণ মানুষের চোখ, কান এবং মস্তিষ্ক আছে। দেখতে শুনতে বা বুঝতে তাঁদের কিছুটা দেরি হলেও সকলেই কিছুদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত করতে পারবেন, কোন্ দলে সমাজবিরোধী প্রশ্রয় পেয়েছে বা কে সরকারী ক্ষমতা দলীয় স্বার্থে অপব্যবহার করছে। গুণ্ডারা যে সর্বত্র ছড়িয়ে, সাধারণ মানুষও যে তাদের চেনে এবং জানে। সরকারী ক্ষমতা ব্যবহারের মূল নির্দেশটা রাইটার্স বিল্ডিংসের কোনও নিভৃত কক্ষ থেকে এলেও সেটার প্রয়োগ করতে আসতে হয় যে সেই গণদরবারেই। তাই, যিনিই যত চেষ্টা

করুন না কেন জনগণের দৃষ্টি থেকে সত্যকে বেশিদিন লুকিয়ে রাখা যায় না। কংগ্রেস সরকার এবং নেতারা বহু জয়ঢাক পিটিয়েও পারে নি।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আরও একটা কথা প্রায়ই বলে থাকেন। তাঁদের একটা যুক্তি : প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভীত। তারা সবচেয়ে বেশি আমাদের বিরোধী। বিভিন্ন দলের মাধ্যমে তাঁরা তাই আমাদের একঘরে করার চেষ্টা করছেন।

প্রতিক্রিয়াশীলরা সবচেয়ে বেশি সি পি আই এম বিরোধী, এটা না হয় মেনেই নিলাম। কিন্তু তাই বলে এটাও কি মেনে নিতে হবে যে, সেই প্রতিক্রিয়াশীলরাই সি পি আই থেকে আরম্ভ করে এস ইউ সি পর্যন্ত সকল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকেও এতটা কব্জা করে ফেলেছেন যে, তাঁদের দিয়ে শুধু সি পি আই এম বিরোধী অভিযোগ তোলাচ্ছেন? শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এবং শ্রীজ্যোতি বসুর এটা সৎ বিশ্বাস হতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কি ওঁরা বলছেন বলেই এটাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিতে পারেন?

সি পি আই এম-এর একটা যুক্তি : অন্যান্য শরিক দল ঈর্ষাবশতঃ আমাদের বিরুদ্ধে নানা অসত্য অভিযোগ তুলছেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের সবচেয়ে বড় শরিক। ফ্রন্ট রাজত্বের বেশিটা ভোগ-দখলের অধিকারও তাই তাঁরাই পেয়েছেন। ছোটদের এতে ঈর্ষা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই ঈর্ষাবশতঃ 'সব ভিত্তিহীন অভিযোগ' তোলার দায়ে সি পি এম কি সি পি আই ও ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে আরম্ভ করে আর এস পি, এস ইউ সি এবং এস এস পি-কে সমানভাবে অভিযুক্ত করতে পারেন? সি পি আই না হয় জ্ঞাতিশত্রুর মনোভাব থেকে একটু বেশি ঈর্ষান্বিত, ফরওয়ার্ড ব্লক না হয় ঐতিহাসিক কারণেই কমিউনিস্টদের বিরোধী। (সেটা সি পি আই-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য নয় কি?) কিন্তু যে আর এস পি,

এস ইউ সি ১৯৬৭ সনে দুই ফ্রন্ট হওয়ার লড়াইয়ে সি পি এম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁদের অনেকটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরাও কি আজ শুধুই ঈর্ষাবশতঃই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী?

* * *

আমার মনে হয়, সি পি আই এম নেতৃত্বের সমগ্র পরিস্থিতি খুব ভাল করে আর একবার পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। তাঁদের দলগত স্বার্থে এটা প্রয়োজন কি অপ্রয়োজন সে প্রশ্ন আমি তুলছি না। কারণ, সেটা তাঁদের দলের ব্যাপার, দলের সদস্যরা বুঝবেন কি ভাল হচ্ছে বা হচ্ছে না। ফ্রন্টের ঐক্য বজায় রাখার জন্য এই পর্যালোচনা বা কোনও পুনর্বিবেচনা প্রযোজন তেমনও আমি বলছি না। কারণ, সে প্রশ্ন তোলার প্রধান অধিকার এবং দায়িত্ব ফ্রন্টের শরিকদের।

সি পি আই এম সরকারের সবচেয়ে বড় শরিক বলেই তার নেতাদের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি। কারণ, সরকারের বড় শরিকের কার্যকলাপের উপর রাজ্যের ভালমন্দ অনেকাংশে নির্ভর করে। তাঁরা যদি সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেন, যদি দলগত স্বার্থে সরকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে চলেন, তাহলে তার দুর্ভোগ ভুগতে হয় প্রধানত জনগণকেই। আমি তাই জনস্বার্থেই মার্কসবাদী নেতাদের কাছে প্রস্তাব করছি: অভিযোগগুলি সম্পর্কে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখুন।

১১ জুলাই ১৯৬৯।

তখন পার্লামেণ্টারি বোর্ডের বৈঠক হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নে প্রধানমন্ত্রী পরাজিত, ক্রুদ্ধ শ্রীমতী গান্ধী বাঙ্গালোরে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভ উদ্গীরণ করে দিল্লী প্রত্যাগত এবং শ্রীগিরির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৃঢ় সংকল্পও ঘোষিত। একে একে এই নাটকীয় ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পর বাঙ্গালোরে সর্বশেষ পরিস্থিতির পর্যালোচনায় বসেছেন শ্রীনিজলিংগাপ্পা, শ্রীকামরাজ এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষ। আলোচনার বিষয়বস্তুঃ এরপর আর কী কী করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

কামরাজ, সিণ্ডিকেটের রিং মাস্টার বললেন ঃ এবার উনি চ্যবনের হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর কেড়ে নেবেন এবং অন্য কোনও একটা দপ্তর দেওয়ার প্রস্তাব করবেন।

সেদিন ১৪ জুলাই।

১৬ জুলাই দুপুর বেলায়ই দেখা গেল কামরাজের অনুমান কিছুটা ভুল। উনি দপ্তর কেড়ে নিয়েছেন ঠিকই, তবে চ্যবনের নয়— মোরারজীর।

শুধু যে এই একটা ভুল করেছিলেন ওঁরা তা নয়—ভুল করেছিলেন আরও। ওঁরা অনুমানই করতে পারেন নি যে, প্রধানমন্ত্রী একটা মাস্টার প্ল্যান ব্যাগে পুরেই বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন এবং সেই প্ল্যান অনুযায়ী এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। ওঁরা ভেবেছিলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা শুধু কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে এবং সিণ্ডিকেট-চ্যবন-মোরারজী গোষ্ঠীতে ফাটল ধরাবার জন্যই অর্থনৈতিক নোটটা প্রচার করেছেন; ওঁরা ধরেই নিয়েছিলেন ক্রুদ্ধ ইন্দিরা কয়েক ধাপ এগোবেন, তারপর থমকে দাঁড়াবেন; এবং ওঁরা প্রথমে একবারও

অনুমান করেন নি, প্রধানমন্ত্রী একটা গ্র্যাণ্ড প্ল্যান অনুযায়ী এগোচ্ছেন।

এতদিনে অবশ্য দেখে দেখে সেটা বুঝে থাকবেন।

* * *

অনেকদিন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর ভয়, সিণ্ডিকেট তাঁকে সরাতে চাইছে। বিভিন্নভাবে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে নানা খবর যাচ্ছিল। তিনি শুনেছিলেন, নিজলিংগাপ্পা, কামরাজ, পাতিল, অতুল্য ঘোষ ও সঞ্জীব রেড্ডী 'ষড়যন্ত্র' করছেন। সঙ্গে আছেন মোরারজী।

এই সন্দেহটা একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল যখন তিনি দেখলেন ওঁরা একযোগে সঞ্জীব রেড্ডীকে রাষ্ট্রপতি করতে চাইছেন। তাঁর আশংকা আরও বাড়ল যখন শুনলেন চ্যবনও এই ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বাঙ্গালোর যাওয়ার আগেই প্রধান-মন্ত্রী এই খবরগুলি পেয়েছিলেন। তাই বাঙ্গালোর যাওয়ার আগেই তিনি তাঁর গ্র্যাণ্ড প্ল্যান ছকে ফেলেছিলেন, যে প্ল্যানের মূলে সেই বহু পরিচিত নীতি—'আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।'

এই প্ল্যানেরই প্রথম ধাপ প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক নোট। বাঙ্গালোর কংগ্রেসে এই নোটের বক্তব্য শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন বহু নেতা। প্রথমে সকলে বুঝতেই পারেন নি হঠাৎ কেন এই যুগান্তকারী প্রস্তাব এনেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভেবেছিলেন অনেকেই এটাও একটা স্টাণ্ট মাত্র। মুখে যাই বলুন, নোটে যাই লিখুন, আসলে শ্রীমতী গান্ধী ওভাবে এগোতে চান না।

প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্রথম আক্রমণেই প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করলেন। এর ফলে (১) সিণ্ডিকেট-চ্যবন-মোরারজী গোষ্ঠীতে আদর্শগত সংঘাত দেখা দিল; (২) মোরারজী-পাতিলকে কোণঠাসা করা গেল; (৩) 'স্লোগান প্রিয়' জনগণের কাছে জনপ্রিয়তা বাড়ানো গেল, এবং (৪) দেশের বামপন্থী শক্তিকে বোঝানো গেল 'আমিও বামপন্থী'।

শ্রীমতী গান্ধী এর পরই প্রচণ্ড চাপ দিলেন সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়ন পাল্টাবার জন্য। একে একে তিনি সিণ্ডিকেট-চ্যবন-মোরারজী গোষ্ঠীর প্রায় সব নেতার সঙ্গে কথা বললেন। কিন্তু বুঝলেন, ওতে কাজ হবে না। প্রধানমন্ত্রী তাই তৈরী হয়েই কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের বৈঠকে গেলেন। তিনি জগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করলেন। কিন্তু ভোটে হেরে গেলেন। জিতলেন সঞ্জীব রেড্ডি।

প্রধানমন্ত্রী কেন গিরির নাম না করে জগজীবনবাবুর নাম করলেন? আমার মনে হয় এর ছুটো কারণ (১) তিনি বুঝেছিলেন নাম প্রস্তাবিত হওয়ার পর পার্লামেণ্টারি বোর্ডে হেরে যাওয়া গিরির পক্ষে নির্দল প্রার্থী হওয়া খুবই অশোভন হবে। এবং (২) জগজীবন বাবুর নাম করলে পরের লড়াইয়ে অন্ততঃ জগজীবনবাবুকে এবং তাঁর অনুগামী তপশিলীদের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

এরপর প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে জানালেন, সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়নে তিনি অসন্তুষ্ট। আর ওদিকে গিরি ঘোষণা করলেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হবেন।

প্রধানমন্ত্রী ফিরে এলেন দিল্লী। শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের প্রস্তুতি। সেদিন ১৪ জুলাই।

* * *

রাজধানী ফিরে প্রধানমন্ত্রী এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না। প্রথমেই তাঁর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন। শ্রীমতী গান্ধী সম্ভবত সামরিক কর্তাদেরও ডেকেছিলেন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি গিরির সঙ্গেও পরামর্শ করলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের সকল প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে ১৬ জুলাই-ই কামান দাগলেন শ্রীমতী গান্ধী। এক গোলায় মোরারজী ঘায়েল। সিণ্ডিকেট চমকিত। গোটা রাজনৈতিক জগত বিস্ময়ে হতবাক। নেতারা সব ছুটে এলেন দিল্লীতে।

১৭ জুলাই সিণ্ডিকেট-চ্যবন-মোরারজী গোষ্ঠীর বৈঠক বসল দিল্লীতে। সকলেই উপস্থিত। আসেননি শুধু একজন—শ্রীকামরাজ। তিনি ছোট্ট একটি বার্তা পাঠালেন মাদ্রাজ থেকে : কালই আসছি। কনটিনিউ ডায়লগ উইথ হার। সেইমত ডায়লগ শুরু হল। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন চ্যবন। তারপর চন্দ্রভান গুপ্ত। এবং চ্যবনের প্রস্তাব অনুসারে এর পর শ্রীমোরারজী দেশাই।

পরদিন কামরাজ দিল্লী এলেন। সিণ্ডিকেট-চ্যবন-মোরারজী গোষ্ঠীর পূর্ণ অধিবেশন শুরু হল। সবদিক বিচার করে নেতারা দেখলেন, একটি মাত্র পথ খোলা, অন্য কোনও পথ নেই। তাঁরা শুধু মোরারজীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন, আর কিছু করতে পারেন না। তাঁদের ভয় হল : (১) পার্টিতে যদি বড় রকমের ভাঙন দেখা দেয় তাহলে সঞ্জীব রেড্ডি হেরে যাবেন। এবং (২) ইন্দিরা যদি ২৩ জন সদস্যকে নিয়েও দল থেকে বেরিয়ে যান তাহলে কংগ্রেস লোকসভায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে এবং হয়ত সরকারই ভেঙ্গে যাবে।

তাই আবার স্থির হল, চাপ দাও, ডায়লগ চালাও। আবার একে একে চ্যবন, কামরাজ, নিজলিংগাপ্পা গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। একই অনুরোধ সকলের : অর্থ দপ্তর সহ মোরারজীকে ফিরিয়ে নাও আপাতত। পরে সব বিচার করে দেখা যাবে।

ইন্দিরা একই জবাব দিলেন : না, তা হয় না। আমি ফিরে যেতে পারি না। তাঁর ঘনিষ্ঠরা আরও জানালেন : মোরারজীকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিতে প্রধান মন্ত্রীর আপত্তি নেই। নেতারা জবাব দিলেন, তা হয় না। মোরারজী নিজেও বললেন, কিছুতেই রাজী নই।

ওঁরা যখন অনুপায় হয়ে শুধু ডায়লগ চালাবার কথা ভাবছেন, ইন্দিরা গোষ্ঠি তখন অবিশ্রাম পরিশ্রম করে তৃতীয় পর্যায়ের আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছেন। এ প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল ১৬ জুলাই বিকাল থেকেই।

অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে, ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও পুঁজিপুতির কাছে জরুরী বার্তা গেছে : অর্থমন্ত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রী অতি সত্বর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

একে একে এলেন সবাই—টাটা, সিংহানিয়া, গোয়েঙ্কা, থাপার প্রভৃতি। ১৭ জুলাই দুপুর থেকেই এঁদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী। বোঝালেন সকলকে 'একান্ত বিনীতভাবে' সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি বললেন, কিভাবে ওঁরা ষড়যন্ত্র করছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে, কেন ওঁরা সঞ্জীব রেড্ডিকে বসাতে চাইছেন রাষ্ট্রপতির আসনে, এবং কেন তিনি সেটা চান না। ইন্দিরা বললেন : আমি নামকাওয়াস্তে প্রধানমন্ত্রী থাকতে চাই না, আমি শক্ত হাতে সরকার চালাতে চাই। আমি কমিউনিস্ট নই, আমি সমাজতন্ত্রী—যে সমাজতন্ত্রের একটা বড় লক্ষ্য শিল্প-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ! তিনি আরও বললেন : আমার হাতে সময় অত্যন্ত কম, যা কিছু করার করতে হবে ১৬ আগস্টের মধ্যে। সর্বশেষে প্রধানমন্ত্রী এলেন ব্যাংক জাতীয়করণের প্রশ্নে। বললেন : যতটা না অর্থনৈতিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক কারণেই আমাকে ব্যাংক নিয়ে নিতে হচ্ছে, তবে এর ফলে যাতে দেশের অর্থনীতি সামান্যও বিপর্যস্ত না হয়, আমি তা দেখব।

ঠিক কজন শিল্পপতিকে প্রধানমন্ত্রী এইভাবে আশ্বস্ত করেছিলেন আমি জানি না। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তার কোনও তালিকা দেওয়া হয়নি। বরং প্রচার করার চেষ্টা হয়েছে ওরা নিজেরাই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ডেকেছিলেন কলকাতার এমন দুই বিশিষ্ট শিল্পপতির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। দু'জনেই প্রধানমন্ত্রীর 'ভাষণের' মোটামুটি একই বিবরণ দিয়েছেন। বিড়লা ও জৈন-গোষ্ঠিকে ডেকে পাঠাবার প্রয়োজনীয়তা সঙ্গত কারণেই প্রধানমন্ত্রী অনুভব করেন নি। কারণ তাঁর সহযোগীদের ভাষায়, কিছু করার মত সাহস ওদের এখন নেই।

একটা শক্তিশালী ফ্রন্ট এইভাবে সামনে নিয়ে ১৯ জুলাই ইন্দিরা আবার কামান দাগলেন : চোদ্দটি ব্যাংক সরকারের হাতে গেল। আবার দেশব্যাপী হৈ চৈ পড়ে গেল। সিণ্ডিকেট-চ্যবন-দেশাই গোষ্ঠিতে প্রকাশ্যে মতভেদ দেখা গেল। চ্যবন-কামরাজ-অতুল্য ঘোষ ইন্দিরাজীকে স্বাগত জানালেন। পাতিল রেগে গোঁ গোঁ করলেন। নিজলিংগাপ্পা ও মোরারজী চুপচাপ রইলেন। দলের ভেতরের 'তরুণ তুর্কিরা' বললেন, 'জয় হোক'। বামপন্থী মহলেও ধন্য ধন্য পড়ে গেল। এবং এই হৈ রৈ শুরু হওয়ার ঘণ্টা কয়েক আগে প্রধানমন্ত্রী টুপ করে মোরারজীর পদত্যাগ পত্রটা গ্রহণ করে নিলেন।

সকলেই বুঝলেন, ইন্দিরা কেন তড়িঘড়ি ব্যাংক জাতীয়করণে পা বাড়িয়েছেন। বুঝলেন বামপন্থী, দক্ষিণপন্থীরা এবং কংগ্রেসীরাও। তাই কেউ ব্যাংক জাতীয়করণকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হলেও ইন্দিরার বিরুদ্ধে ক্রোধ আর চেপে রাখতে পারলেন না সিণ্ডিকেট-চ্যবন-দেশাই গোষ্ঠি। তাঁদের ক্রোধের মূল কারণ ঃ ইন্দিরা সকলকে অবজ্ঞা করেছেন। কারও কথা শোনেন নি। মোরারজীকে নিলেন না। ১৯ রাত্রেই নিজলিংগাপ্পার বাড়িতে সবাই বসলেন। সিদ্ধান্ত হল, ২১ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক বসবে। আরও ঠিক হল, ২১ জুলাই ওয়ার্কিং কমিটিতে এবং ২০ পার্লামেণ্টারি পার্টির কার্যকরী সমিতিতে প্রস্তাব পাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হবে, অর্থ দপ্তর দিয়ে শ্রীমোরারজী দেশাইকে আবার মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে নিন।

ইন্দিরাজী আগে থেকেই এ ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি ধরলেন কার্যকরী সমিতির ব্যাপারটা। একের পর এক সদস্যদের ডেকে পাঠালেন। সকলকে বললেন, 'সেই ষড়যন্ত্রের কথা। আর বললেন, আমি মোরারজীকে কিছুতেই অর্থ দপ্তর দেব না। প্রধানমন্ত্রিত্বের আমি পরোয়া করি না। কেউ যদি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তো আমি নতুন লোক নেব, দলের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব নেই।

সম্ভবত ছুটো উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের। (১) তিনি সকলকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন যে বেশি বাড়াবাড়ি করলে সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর লোকজনেরা শুরু থেকেই রটাচ্ছিলেন তেমন তেমন অবস্থা হলে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানাবেন প্রধানমন্ত্রী। (২) ইঙ্গিতও দেওয়া হচ্ছিল নতুন মন্ত্রী করার। (পশ্চিমবঙ্গের একজন এম পি তো ধরেই নিয়েছিলেন তিনি এবার ভাল দপ্তরসহ মন্ত্রী হবেন।)

ফল কিছুটা হল। ভয়ে হোক, লোভে হোক, ভালবাসায় হোক —দেখা গেল কার্যকরী সমিতির ছু-একজন সদস্য দল পাল্টে প্রধান-মন্ত্রীর দিকে গিয়েছেন। কিন্তু তবু বৈঠকে প্রস্তাবটা উঠল। হৈ চৈ হল। এবং শেষ পর্যন্ত আচমকা প্রধানমন্ত্রী সভা ছেড়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে অবশ্য জানিয়ে গেলেন, আমি প্রধানমন্ত্রী—যেমন ভাল মনে করি, তেমন চলব।

পরের দিন এল ওয়ার্কিং কমিটি। প্রধানমন্ত্রী মোটামুটি একই কৌশল অবলম্বন করলেন এখানেই। ২১ জুলাই কমিটির বৈঠক বসার ঘণ্টা চারেক আগে প্রধানমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন ক্যাবিনেটের চার সহকর্মীকে—যারা ওয়ার্কিং কমিটিরও সদস্য। তারপর দৃঢ়কণ্ঠে তিনি সর্বশ্রী চ্যবন, জগজীবন রাম, ফকরুদ্দিন এবং রামসুভগ সিংকে বললেন: ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব পাশ করলেও আমি মোরারজীকে অর্থ দপ্তর দিয়ে ফিরিয়ে নেব না। তার ফলাফল যাই হোক না কেন। তবে আলাপ আলোচনায় কিছুটা কাজ হতে পারে। ঘণ্টাখানেক পরে তিনি একই কথা বললেন কামরাজকে।

ফলও পেলেন সঙ্গে সঙ্গে। এরপরই চটপট কয়েকটা টেলিফোন হল। সিণ্ডিকেট-মোরারজী-চ্যবন গোষ্ঠির নেতারা স্থির করলেন, এখন তাঁরা শুধু সমস্যাটাকে জীইয়ে রাখবেন—কিন্তু কোনও প্রস্তাব আনবেন না। প্রধানমন্ত্রী লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফেলতে পারেন এমন

কিছু করবেন না। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট পর্যন্ত চুপচাপই থাকবেন।

তাই রাত আটটায় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক যখন বসল, তখন সকলেই বললেন : শান্তি, শান্তি। স্থির হল, কিভাবে দলের ভেতরে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করবেন।

ব্যাপারটা আজও ঐখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দিরাজী এখনও দিল্লীতে। নিজলিংগাপ্পা ডালহৌসিতে।

খুব পরিষ্কার, সিণ্ডিকেট-মোরারজী-চ্যবন গোষ্ঠি সঞ্জীব রেড্ডির জয় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান। ভাবটা তারপর একবার দেখে নেব।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীও কি এটা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। সেইজন্যই তো এত গণ্ডগোল, সেইজন্যেই না মোরারজী গেলেন এবং চোদ্দটি ব্যাংক সরকারের খাস। তাহলে, এত কিছুর পর কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই সঞ্জীব রেড্ডিকেই রাষ্ট্রপতি হতে দেবেন! রাষ্ট্রপতি ভবনের বলে বলীয়ান সিণ্ডিকেট-চ্যবন-দেশাই গোষ্ঠিকে আবার 'ইন্দিরা বিরোধী ষড়যন্ত্র' করতে দেবেন?

দুটো মত আছে দিল্লীর পণ্ডিতদের : (১) প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই সঞ্জীব রেড্ডিকে জিততে দেবেন না। এবং সেজন্য যা যা প্রয়োজন সব করবেন। (২) অথবা সঞ্জীব রেড্ডির আগমনে বেশি বাধা দেবেন না। তবে, ইতিমধ্যে একদিকে 'নানাভাবে' পার্লামেন্টারি পার্টির মধ্যে নিজের সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাকা করে নেবেন—যাতে কেউ আর কিছু না করতে পারেন, আর অন্যদিকে চেষ্টা করবেন সিণ্ডিকেট-চ্যবন-দেশাই ঐক্য ভাঙ্গার।

কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে প্রধানমন্ত্রী কোন্ পথ নেবেন।

২৬শে জুলাই, ১৯৬৯

নেতারা আজ বিপদ সম্পর্কে সচেতন

যুক্তফ্রন্টের নেতাদের ধন্যবাদ, একটু দেরিতে হলেও তাঁরা কতকগুলি বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। এর একটা হল জমি দখলের আন্দোলনের কতকগুলি বিপদ। ঠিক সকলেই না হলেও ফ্রন্টের বিশিষ্ট নেতাদের অধিকাংশই এখন বুঝছেন যে বেনামী জমি উদ্ধারের নামে বহু এলাকায় হামলাবাজী হচ্ছে ; যাদের সাধু ভাষায় বলা হয় সমাজবিরোধী, তারা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ছোট ছোট কৃষকের জমিও লোপাট হচ্ছে।

এই কথাগুলি যে এখনও তাঁরা প্রকাশ্যে খোলাখুলি স্বীকার করছেন তেমন নয়। পার্টিগত এবং আদর্শগত অসুবিধাও আছে। তবে একান্ত আলোচনায় নেতাদের মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তাঁরা যে শঙ্কিত, বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন এখন সেটা স্পষ্ট।

কাঁকী, মধুসূদনপুর, ভরতগড়, হাড়োয়া প্রভৃতি এলাকার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পেয়েই খুব বেশী চিন্তিত হয়ে উঠেছেন নেতারা। বুধবার সারাদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দলের নেতাদের আলাদাভাবে এবং শেষ পর্যন্ত রাত্রে ফ্রন্টের বৈঠকে যে সব কথা বলেছেন তেমন কথা এর আগে কোনদিন কেউ তাঁদের মুখে শোনেন নি। অজয়বাবু বিভিন্ন অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছেন, এ জিনিস আর কিছুতেই চলতে দেওয়া যায় না, এসব বন্ধ করতেই হবে। জ্যোতিবাবু 'এম এল' এর উপস্থিতিতে রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহ বর্ণনা' দিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন : আমি এবার পুলিসকে যা যা প্রয়োজন করার নির্দেশ দিচ্ছি। এ জিনিস আর সহ্য করা যায় না। এগুলি জমি দখলের আন্দোলন নয়, নিছক হত্যাকাণ্ড, খুন।

নেতারা বিশেষভাবে যাঁরা মন্ত্রী, তাঁরা ইতিমধ্যে এও দেখেছেন যে, প্রশাসনে কারু কারু ধৈর্যের বাঁধন প্রায় ছিঁড়ে পড়ার মুখে এসে *দাঁড়িয়েছে। এর পরও যদি সরকারের পক্ষ থেকে কিছু না করা* হয়, তাহলে সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা হয় একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে আর না হয় অধৈর্য হয়ে এমন একটা কিছু করে বসবে যার তাল সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

কাঁকী, মধুসূদনপুর, ভরতগড় এবং হাড়োয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কে যে সব প্রশাসনিক রিপোর্ট এসেছে অথবা অফিসারেরা মৌখিক ভাবে যে সব কথা কর্তাদের জানিয়েছেন তা কোনও দিন প্রকাশিত হলে মানুষ চমকিত হয়ে উঠবে। তাঁরা বিভিন্ন দলের স্থানীয় নেতাদের, এম এল এ-দের এমন কি 'ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী' এক আধজন মন্ত্রীর আচরণ সম্পর্কেও যথেষ্ট ক্ষোভ জানিয়েছেন। একজন উচ্চপদস্থ 'প্রগতিশীল' অফিসার তো সেদিন সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন ঃ স্যার, আমাদের কি ভুলে যেতে হবে যে ফৌজদারী আইন বলে একটা বস্তু চালু আছে? কুখ্যাত গুণ্ডা এবং ডাকাতদের কি আমাদের নেতা বলে মেনে নিতে হবে!

নেতারা বিপদ বুঝতে পেরেছেন এটা ভাল কথা! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বিপদের আশংকা বারংবার তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চার মাস আগে তাঁরা সতর্ক হন নি। ইতিমধ্যে যে শুধু বহু মানুষ মারা গিয়েছে বা কতকগুলি এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছে তাই নয়, ইতিমধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গুণ্ডাশ্রেণীর ঘৃণ্য জীবরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; ইতিমধ্যে এই সুযোগে একদল স্বার্থান্বেষী সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যে দুর্বলতা ও পংকিলতা ছিল, সেটা আরও বেড়েছে। নেতারা সময় মত সতর্ক হলে এতদূর গড়াত না।

কেউ বলবেন না বেনামী জমি উদ্ধার করা উচিত নয়। শিক্ষিত সভ্য, সুষ্ঠু মনোভাবের কোনও মানুষ অস্বীকার করতে পারবেন না

যে যাঁরা আইন ফাঁকি দিয়ে জমি লুকিয়ে রেখেছেন তাঁদের কঠোর-তম শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একথা কোনও চিন্তাশীল মানুষ কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারেন না যে, বেনামী জমি উদ্ধার বা দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে 'মবোক্রেসি' ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

হ্যাঁ আইনের ফাঁক আছে; ত্রুটি আছে এবং আদালতে ঝুলিয়ে রাখার বহু নজির আছে, কিন্তু এই ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধনের কি সুযোগ নেই? উপায় নেই? সবটা না হলেও অনেকটা শোধরাবার? রাজ্য সরকারের হাতে যেসব ক্ষমতা আছে, তার সদ্ব্যবহার করেইকি জমিদারি উচ্ছেদ আইনের বহু ফাঁকি বন্ধ করা সম্ভব নয়?

আমি বহুদিন আগেই ফ্রন্টের কয়েকজন নেতার কাছে এ ব্যাপারে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। বলেছিলামঃ আপনারা সবাইকে বেনামী বা লুকানো বা বাড়তি জমি সরকারের হাতে সমর্পনের জন্যে এক মাস সময় দিন। যাঁরা সেই সুযোগ পাওয়ার পরও বাড়তি সময় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন বেআইনি কাজ করার শাস্তি স্বরূপ তাঁদের সবজমি সরকার কেড়ে নিন! এজন্য আইন তৈরী করুন। অর্ডিন্যান্সও করা যেতে পারে। যাঁরা চাষের উপর নির্ভরশীল নন, তাঁদের হাত থেকেও আইন করে চাষের জমি নিয়ে নিন। গ্রামে গ্রামে দুর্বার গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বেনামী বা লুকানো বা বাড়তি জমির মালিকদের হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিন— সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, যে বাড়তি জমি রাখার চেষ্টা করবে, তার সব জমি যাবে। আঞ্চলিক কমিটিগুলি সরকারী কর্মচারীদের লুকানো জমির মালিকদের চিনিয়ে দিন। বিশেষ আদালত সৃষ্টি করে বা বর্তমান আদালতগুলিতে বাড়তি বিচারক বসিয়ে জমির মামলাগুলির তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি করা হোক।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বহু লক্ষ একর চাষের জমি এইভাবে

সরকারের হাতে আনা যায় এবং সেই জমি সুষ্ঠুভাবে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যেও বিলি করা যায়।

অবশ্য, এই পথে এই আন্দোলনে কতকগুলি অসুবিধা আছে (১) এজন্য সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন। লুণ্ঠনের প্রবৃত্তিতে সুড়সুড়ি দিয়ে মানুষকে সহজে ক্ষেপিয়ে তুলে একাজ করা চলে না। (২) এতে জমি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে দলে লোক টানা যায় না। কারণ তখন সুষ্ঠু বিলি ব্যবস্থা করতে হবে। এবং (৩) তাহলে যেখানে কেউ দলগত স্বার্থে বেনামী বা লুকানো বা বাড়তি জমির মালিকদের গায়ে হাত দিতে চান না সেখানেও তাদের স্বার্থে ঘা পড়ে। কারণ তখন জমি দখলের 'আন্দোলন' শুধু গঙ্গার পূর্ব তীরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, পশ্চিমের মেদিনীপুর, বীরভূম এবং বর্দ্ধমানের সকল জোতদারের গায়েও হাত দিতে হবে।

কিন্তু ওপথে না গিয়ে সহজ পথে যাওয়ার চেষ্টা করলে ফল কী হয় বা হতে পারে এখন তার পরিষ্কার ইঙ্গিত নিশ্চয়ই নেতারা পেয়েছেন।

আমি 'ইঙ্গিত' বলছি ইচ্ছা করেই। কারণ, এখনও যে সব ঘটনা ঘটেছে তাই সব এবং শেষ বলে আমি মনে করি না। যদি বে-আইনি ক্রিয়াকলাপ এখনই বন্ধ না করা হয়, যদি গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের পার্টিতে পার্টিতে প্রাধান্য লাভ অবিলম্বে না আটকানো যায়, যদি জমি ও ধান লুঠের লোভ দেখিয়ে দল বাড়াবার চেষ্টা অব্যাহত থাকে তাহলে বাংলার ব্যাপক অঞ্চলে, বিশেষ করে, গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে বাধ্য। অরাজকতা একবার শুরু হলে, লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি একবার মানুষের মধ্যে জেগে উঠলে, সরকারী ব্যবস্থার উপর মানুষ একবার আস্থা হারালে আবার স্বাভাবিক আস্থা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়। তখন আবার তার জন্য যে ব্যাপক দমননীতি চালাতে হয় সেটাও মারাত্মক এবং অবাঞ্ছিত।

তাই, অবস্থা বেশি খারাপ হওয়ার আগেই ফ্রন্ট ও সরকারকে দৃঢ় ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু মুখে বিক্ষোভ, আলোচনায় আশংকা এবং ঘোষণায় দৃঢ়তা প্রকাশ করলে চলবে না। কার্যক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বন করতে হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন ফ্রন্টের সব দলের যৌথ দ্ব্যর্থহীন সিদ্ধান্ত।

যদি তা তাঁরা না করেন, যদি দেরি করেন, আমি আবার বলছি তাহলে নিজেরা চূড়ান্ত বিপদে পড়বেন ও রাজ্যকেও শোচনীয় পরিস্থিতিতে নিয়ে যাবেন। তাঁরা যেন ভুলে না যান তাঁদের শত্রু অনেক, তাঁদের ভুলের সুযোগ নেওয়ার জন্য বহু লোক ওৎ পেতে আছেন। এদের একবার ক্ষতি করার সুযোগ দিয়ে 'ষড়যন্ত্র' 'চক্রান্ত' বলে চিৎকার করলেও কোনও সুফল পাওয়া যাবে না। ক্ষতি যা হওয়ার ততদিনে হয়ে যাবে।

পুনঃ এই লেখা যখন প্রায় ছাপা হয়ে গিয়েছে, তখন বিধানসভায় কিছু পুলিশের নক্কারজনক হামলার খবর এসেছে। এই ঘটনা সমগ্র পরিস্থিতিকে পাল্টে দিয়েছে। মন্ত্রীসভা সমগ্র পরিস্থিতিকে আবার নতুন করে ভেবে দেখতে জরুরী বৈঠকে বসছেন আজ সকালে।

১লা, আগষ্ট ১৯৬৯।

ফ্রণ্টে সন্ধি : তবে একমাসের জন্যে কেন ?

যুক্তফ্রণ্টের বিউটি অর্থাৎ সৌন্দর্য কী ?

যুক্তফ্রণ্টের বিউটি হল : শরিকরা ঝগড়া ঝাটি করেন, আবার তা মিটিয়েও ফেলেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারকে ধন্যবাদ। অল্প কথায় এমন সুন্দরভাবে যুক্তফ্রণ্টের বিউটি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বহু মার্কসবাদ পাঠ করে এবং অনেক শহুরে মানুষের সংসর্গে এসেও হরেকৃষ্ণবাবু এখনও মূলত বর্ধমানের সেই কোঙারটি থেকে গিয়েছেন বলেই এমন সহজ সরলভাবে ফ্রণ্টের বিউটি ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। বালিগঞ্জের ব্যারিস্টার শ্রীজ্যোতিবসু বা বরেন্দ্র-ভূমির সুসন্তান শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী এমন অল্পে সার কথাটা বলতে পারতেন বলে বিশ্বাসই হয় না।

হ্যাঁ এটাই সার কথা। মারামারি করেন, ঝগড়া-ঝাটি করেন, আবার তা মিটিয়ে ফেলেন। আবার ঝগড়া হয়, মারামারি হয়, আবার তা মিটে যায়—যুক্তফ্রন্ট এইভাবে এগোচ্ছে। এ জিনিস শুরু হয়েছে এবারের রাজত্বের প্রায় গোড়া থেকেই। কত ঝগড়া হল, কত মারামারি হল, কত খুনোখুনি হল, কত আলোচনা হল, কত সরেজমিনে যৌথ তদন্ত হল, কত রফা হল এবং কত চুক্তি হল—এর বিস্তারিত হিসাব সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা এখন ফ্রণ্টের কোনও নেতাও দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

এই সবকিছুর একটা নীট ফল অবশ্য হয়েছে। ফ্রণ্টের সব সুকীর্তি এবং কুকীর্তিকে ছাপিয়ে এই ছবিটাই সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অংশের মনে গেঁথে গিয়েছে যে 'ওঁরা শুধু মারামারি ও ঝগড়া-ঝাটি করেন', আবার সেই বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন এবং পুনরায় নবোদ্যমে হানাহানিতে মত্ত হন।

নিশ্চয়ই এই ছবিকে—একে কালচারড্ কমিউনিস্ট বলে সোমনাথ বাবুরা 'ভাবমূর্তিই' বলুন, আর মেঠো মার্কসবাদি বলে হরেকৃষ্ণবাবুরা বিউটিই আখ্যা দিন—কেউ বিউটিফুল বলে রায় দিতে পারবেন না। ফর্সা সুন্দর মুখে একটি ছোট্ট কালো তিল চিহ্ন সৌন্দর্য বাড়ায়, কিন্তু গোটা মুখে তিলের ছড়াছড়ি হলে নিপুণ গড়নের আননও কুৎসিত হয়ে দাঁড়ায়। যদি ফ্রন্টের শরিকী বিরোধ স্বল্পে সীমাবদ্ধ থাকত, যদি তা অল্পে মিটত, যদি দেখা যেত এগুলি ঠিক ঝগড়া নয় 'ভ্রাতৃপ্রতিম মতবিরোধ', যদি না এর সঙ্গে হানাহানি কাটাকাটি গালিগালাজ জড়িত না থাকত তাহলে বলা যেত 'বিউটি'—সত্যিই চমৎকৃত হয়ে ঘোষণা করা যেত 'বিউটিফুল'। কিন্তু এক্ষেত্রে মারামারি হানাহানির বাড়াবাড়িটা সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠছে বলেই তা বলতে পারা যাচ্ছে না।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী বুধবার ফ্রন্টের বৈঠকে প্রস্তাব করেছেন, এক মাসের একটা ট্রুস হোক। তিনি তিনটি সর্ত দিয়েছেন এই সন্ধি প্রস্তাবের সঙ্গেঃ (১) জোর করে কেউ কারও ইউনিয়ন দখল করবে না, (২) কোনও দল সশস্ত্র শোভাযাত্রা বের করবে না, এবং (৩) একে অপরের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেবে না। কুৎসা রটাবে না। (সোমনাথবাবু দয়া করে একবার বৃহস্পতিবার 'কালান্তর'খানা পড়ে দেখবেন ? এর নাম ট্রুস ?)

আমি বুঝতেই পারছি না, মাত্র এক মাসের জন্যে এই ট্রুস হবে কেন ? এইটাই তো পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়া উচিত। পঞ্চ প্রধানের যে দলিল বহু আলোচনার পর যুক্তফ্রন্ট অনুমোদন করেছেন, সে দলিলে তো পাকাপাকি ভাবে শরিকী সংঘর্ষ এড়াবার জন্যই করা হয়েছিল। সেইসব ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছিল। সেইসব ব্যবস্থা মেনে চলতে এখন ফ্রন্টের শরিকদের অসুবিধা কোথায় ? সেই দলিলে এক দুই তিন করে কর্তব্য নির্ধারিত

হয়েছিল—বোঝাই দুষ্কর এখন আবার সেই কর্তব্য পালনের প্রসঙ্গে নতুন করে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কি? কী করে সেইসব কর্তব্য পালন করা, ফ্রন্ট আবার এই আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন কেন সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটাও বোঝা কঠিন।

আসল প্রয়োজন আলোচনা নয়, আসলে দরকার সদিচ্ছা, পারস্পরিক বিশ্বাস। সেইটা নেই বলেই বার বার আলোচনা করে বা দলিল রচনা করেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মারামারি বেড়েই চলেছে।

যখন চোদ্দ দলের মোর্চা তখন ভুল বোঝাবুঝি হবেই, আদর্শের সংঘাত থাকবেই। কিন্তু বাড়ির বা জমির বা ইউনিয়নের দখল নিয়ে যেসব মারামারি হচ্ছে সেগুলি না ভুল বোঝাবুঝি, না মতাদর্শের লড়াই। হ্যাঁ কোন্ কাজটা কীভাবে করা উচিত তা নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কোন্ পথে এগোলে তাড়াতাড়ি বা বেশি জনসাধারণের মঙ্গল করা যাবে, তা নিয়েও মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যুক্তফ্রন্টের তা হচ্ছে না। যা হচ্ছে তাকে একমাত্র সেকালের জমিদারের লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটা অদ্ভুত মিলও দেখা যাচ্ছে একাল আর সেকালে—জমিদার-বাবুরা তখন যেমন মারামারির জন্য লেঠেল পুষতেন এখন তেমন ফ্রন্টের দলগুলি গুণ্ডা পোষেণ। আমি বিশ্বাসই করতে রাজী নই, যে এত খুনোখুনি হচ্ছে, সেগুলি রাজনৈতিক কর্মীরা করছেন। রাজনৈতিক কর্মীরা এত সহজে মানুষ খুন করেন না, করতে পারেন না।

আরও একটা অদ্ভুত মিল দেখা যাচ্ছে সেকালের জমিদারদের সঙ্গে একালের রাজনৈতিক নেতাবাবুদের। ওঁরা যখন লেঠেল পাঠিয়ে খুনোখুনি করাতেন তখনই কিন্তু আবার ফি সন্ধ্যায় পাত্রমিত্র নিয়ে এক সঙ্গে খানাপিনা সহযোগে সম্পূর্ণ হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে তাসপাসা খেলতেন। একালের রাজনৈতিক বাবুরাও তাই করেন।

মাঠে ঘাটে কর্মীদের সভা-সমিতির উত্তেজনা ছড়ান—কিন্তু মন্ত্রিসভায় ফ্রন্টে প্রায় শান্ত হাল্কা পরিবেশে বসে আলাপ-আলোচনা চালান।

এরা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করলে আমি মোটেই অখুশী নই। শান্তি কে না চায়। আমার শুধু প্রশ্ন—একটু চেষ্টা করে উদ্যোগী হয়ে এবং কম উত্তেজনা ছড়িয়ে নিচুতলায়ও কি এই সুস্থ পরিবেশ আনা যায় না? নেতারাও নিশ্চয়ই বোঝেন যাঁর প্রাণ যায় বা যিনি আহত হন অথবা যাঁদের ঘরবাড়ি পোড়ে, তাঁদের কি অপরিসীম ক্ষতি হয়—সেইসব পরিবারগুলি শোকে-দুঃখে-বিষাদে কেমন বোবা হয়ে যায়।

যুক্তফ্রন্টের আমলে কিছুই হয়নি একথা আমি বলব না। আমি বরং বলব, এই সাত মাসেও বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন রাজ্যের শ্রমিক ও কর্মীরা এই আমলে এই সরকারের জন্যই বেশ কিছুটা লাভবান হয়েছেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলব, যুক্তফ্রন্টের কাছে মানুষ যতটা আশা করেছিল ততটা হয়নি—তার অনেক কিছুতেই ফ্রন্ট সরকার এখনও হাত দেন নি। দুর্নীতি অব্যাহত, সরকারী অকর্মণ্যতার কোনও সুরাহা হয়নি, কালোবাজারী চলছেই ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই ফ্রন্টের নেতাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, অনেক কাজ তাঁদের করতে হবে এবং সেসব কাজগুলিও খুবই কঠিন। এইসব কাজের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা প্রয়োজন, জনমত গড়ে তোলা অত্যন্ত আবশ্যক।

ফ্রন্টের নেতারা যদি এখনও সচেষ্ট হন, যে ভুল পথে তাঁরা এই ক'মাস এগিয়েছেন, সেই পথ ত্যাগ করে জন কল্যাণের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন, তাহলে আমি মনে করি এখনও সোনার বাংলা না হোক মানুষ বসবাসের যোগ্য বাংলা আবার গড়া যায়। আর তা না করে যদি তাঁরা সেই সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির, হানা-

হানির, পারস্পরিক গালিগালাজের পথেই এগোতে থাকেন, তাহলে অচিরে এমন গর্তে গিয়ে পড়বেন যে সেখান থেকে আর কেউ তাঁদের তুলে আনতে পারবেন না। মানুষ তাঁদের ভাল কাজগুলিও সেই সঙ্গে ভুলে যাবে—যেমন প্রায় ভুলে গিয়েছে, কংগ্রেসের সব।

১৯ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সাল।

দপ্তর বণ্টনে গোড়ায় গলদের জের

মূলে যদি গলদ থাকে তো সে গলদ একদিন না একদিন ফুটে বের হতে বাধ্য। যুক্তফ্রন্ট যখন গোড়ায় মন্ত্রিসভার দপ্তর বণ্টন করেন তখনই তার মধ্যে কতকগুলি বড় রকমের গলদ ছিল। তাই এখন সেই গলদ ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার নিচ্ছে।

দপ্তর বণ্টন বা পুনর্বণ্টন নিয়ে এখনও অবশ্য প্রকাশ্যে তেমন একটা মারামারি কাটাকাটি হয়নি। বিভিন্ন দল এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন, কয়েকটি পার্টি নতুন করে দপ্তর বণ্টনের দাবি তুলেছেন এবং কয়েকটি দল আবার গোটা ব্যাপারটাই ধামাচাপা দিতে চাইছেন। একটি পার্টি আবার দলীয় এম এল এ শক্তির আনুপাতিক হারে দপ্তরে দপ্তরে অর্থবরাদ্দের দাবি তুলেছেন। একবার মন্ত্রিসভার বৈঠক দুই মন্ত্রীতে এক্তিয়ার নিয়েও বেশ একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছে।

নেপথ্যে অবশ্য ব্যাপারটা অনেকটা এগিয়েছে। ফ্রন্টের নেপথ্যে আলোচনায় শরিকী সংঘর্ষের পরই সাধারণত যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব পায় সেটি হল, এই দপ্তর পুনর্বণ্টনের প্রসঙ্গ। ফ্রন্টের যে কোনও দুই শরিক পার্টির প্রতিনিধিরা একত্রে মিলিত হলেই একথা সেকথার পর এই প্রসঙ্গটি আসে—আচ্ছা, দপ্তর বণ্টন নিয়ে আপনারা কী ভাবছেন ?

দপ্তর পুনর্বণ্টনের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু যে শরিক দলগুলির ন্যায্য বা অন্যায্য পাওনার বিচারে এটা গুরুত্বপূর্ণ তেমন নয়, এর গুরুত্ব সরকারী কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারেও। জনস্বার্থের প্রশ্নও জড়িত। এমনভাবে দপ্তরগুলি গোড়ায় ভাগ হয়েছে যে কাজকর্মে এখন নানা অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। এক কৃষি দপ্তরকে

তিন চার টুকরো করার ফলে বেচারা কৃষি কমিশনারকে এখন মন্ত্রীদের ঘরে ঘরে ঘুরতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে।

তাই, শ্রীসুধীনকুমার সম্পর্কিত অভিযোগের মত বা গুপ্ত কমিটির রিপোর্টের ন্যায় অথবা বলশেভিক পার্টির প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গের মত এই ব্যাপারটাও ফ্রন্ট যদি এখন ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলে ভুল করবেন। কারণ বিলম্বে সমস্যাটা এত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে যে, সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে বেশ কষ্ট পেতে হবে।

* * *

গোড়ায়ই আমি বলেছি, মূলে দপ্তর বণ্টনে গলদ ছিল। কী কী গলদ হয়েছিল মূলে ?

মোটামুটি তিন রকমের ত্রুটি হয়ে আছে গোড়ায় : (১) মন্ত্রিসভার আয়তন অস্বাভাবিক ভাবে বড় করা হয়েছে, (২) বড় বড় তিনটি দল নিজেদের কোলে ঝোল টানতে গিয়ে ছোটদলগুলিকে অন্যায়-ভাবে বঞ্চিত করেছেন এবং (৩) সরকারী কাজকর্মের সুবিধা অসুবিধার কথা না ভেবে অদ্ভূতভাবে দপ্তরগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার যে বিরাট আয়তন করা হয়েছে তা একেবারে অপ্রয়োজনীয়। বলতে পারেন, বিধানবাবু এর চেয়েও বড় মন্ত্রিসভা করেছিলেন। বিধানবাবু যে যে ভাবে চলতেন যুক্তফ্রন্টকেও সেই সেই পথে চলতে দেওয়া হবে না কেন, এই যুক্তি যদি কেউ দেখান তাহলে অবশ্য আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ কোনও বিচারককে যদি সবকিছু পর্যালোচনা করতে দেওয়া হয় তাহলে তিনি বলবেনই—বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে।

এত বেশি মন্ত্রী করা হয়েছে যে, অনেকের হাতে করার তেমন কিছুই নেই। অথচ, অনেকেরই কাজ করার অনেক বেশি যোগ্যতা আছে। সেইজন্য আজ কয়েকজন মন্ত্রী তাঁদের দলের মাধ্যমে বলতে বাধ্য হয়েছেন : হাতে কাজ নেই, অন্তত আর একটা ছোট

দপ্তর দেওয়া হোক। মজার ব্যাপার কেউ একবারও বলেন না: অমুক অমুকবাবুর হাতে যে কাজ তার জন্যে আলাদা কোনও মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। আসুন আমরা সবাই মন্ত্রিসভার আয়তন কমাবার কথা ভাবি। জানি, এখন মন্ত্রিসভার আয়তন কমাবার প্রস্তাব এলে বহু দলের ভেতরে খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে।

বড় তিনটি দল নিজেদের কোলে ঝোল টানতে গিয়ে যেভাবে ছোটদের বঞ্চিত করেছেন, সেটাও অদ্ভুত ব্যাপার। প্রথমে সি পি আই (এম) বড় বড় দপ্তরগুলি নিয়ে নিলেন—স্বরাষ্ট্র, ভূমি রাজস্ব, শিক্ষা, খাদ্য, শ্রম, পরিবহন, পুনর্বাসন ইত্যাদি ইত্যাদি। এই দপ্তরগুলি যে শুধু আয়তনে বড় তাই নয়, জনসংযোগের (অর্থাৎ সাদা বাংলায় দল বাড়াবার) ক্ষেত্রেও এই দপ্তরগুলির বিরাট গুরুত্ব। তারপর এলেন বাংলা কংগ্রেস—অর্থ, শিল্প, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি দপ্তরগুলি পেলেন তাঁরা। তারপর সি পি আই—উন্নয়ন, গৃহ, স্বায়ত্বশাসন, সমবায়, ত্রাণ, সেচ ইত্যাদি। এরপর বড় বলতে আর রইল দুটি দপ্তর, কৃষি ও স্বাস্থ্য। একটি পেলেন ফরওয়ার্ড ব্লক আর একটি আর এস পি। ছোট পার্টিগুলির ভাগ্যে জুটল নামকাওয়াস্তে দপ্তরগুলি। এদের মধ্যে একটু বড় বলে কিছুটা ভাল দপ্তর পেলেন এস ইউ সি —পূর্ত তাঁদের ভাগ করে দিতে হল।

বড় দলগুলি যে শুধু শক্তির অনুপাতে মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ালেন তাই নয়—বড় বড় দপ্তরগুলিও নিয়ে নিলেন। ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদের যোগ্যতা অযোগ্যতার কথা বিবেচিতই হল না। তাই খুব যোগ্য একজন মন্ত্রীও ছোট পার্টির লোক বলে এক কোণে পড়ে আছেন। আবার বড় পার্টির লোক বলেই আর একজন কম যোগ্যতার মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়ে বসে আছেন।

বড় তিনটি দল যে শুধু বড় বড় দপ্তর নিয়েই খুশী তাও নয়। তাঁরা এই সঙ্গে অন্যের দপ্তরেও হাত বাড়ালেন। একটি মাত্র উদাহরণ দেওয়া যাক। কৃষির সঙ্গে বহুদিনই সমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র

সেচ, এ্যাগ্রো ইকনমিক ইণ্ডাস্ট্রিজ জড়িত। সেইজন্যই কৃষি কমি-শনার এইসব দপ্তরেরও কর্তা। এবার দপ্তর বণ্টনে দুই বড় পার্টি বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই কিন্তু কৃষি থেকে সমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষুদ্রসেচ এবং এ্যাগ্রো ইকনমিক ইণ্ডাস্ট্রিজ বের করে নিজেরা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলেন।

ঠিক এমনি ভাবেই দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ এক এক মন্ত্রীর হাতে থাকা সত্বেও এবার সি পি আই গৃহ দপ্তর বের করে নিলেন। কার জন্য? শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর জন্য। যদিও সোমনাথবাবুর হাতে উন্নয়ন এবং স্বায়ত্তশাসনের মত দুটি বড় দপ্তর আছে। আর এস ইউ সি যেহেতু ছোট পার্টি তাঁকে বলা হল, তোমাদের একজন পূর্ণ মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে ওই পূর্ত দপ্তরই যথেষ্ট।

কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, ক্ষুদ্রসেচ ও এ্যাগ্রো ইকনমিক ইণ্ডাস্ট্রিজ এবং পূর্ত ও গৃহনির্মাণ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কাজকর্মে এই দপ্তরগুলির যোগাযোগ এত বেশি যে মন্ত্রী আলাদা আলাদা হলেও দপ্তরগুলি ভাগ করা যায় না। তাই এখন পদে পদে গুতোগুতি লাগছে—মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে।

এসব অবশ্য কিছুই হত না এবং দপ্তর দখলে রাখার এই প্রবণতাও দেখা যেত না যদি সত্যিই যুক্তফ্রণ্ট যুক্ত থাকতো এবং দলগুলি দলগত স্বার্থ সিদ্ধির পরিবর্তে প্রকৃত জনকল্যাণের কথা ভাবতেন।

প্রকৃত জনস্বার্থের কথা ভাবলে এখনও যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার আয়তন কমাতে পারেন। এবং মন্ত্রী পিছু (পি এ, সি এ, টাইপিস্ট, আর্দালী, চাপরাশি, গাড়ি, ফোন, টি এ প্রভৃতি সহ) মাসিক যে হাজার সাত আট টাকা খরচা, তা বাঁচাতে পারেন। বহুভাবে

বিবেচনা করে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে যা কাজ তা কুড়িজন মন্ত্রী এবং জনা চারেক রাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষেই যথেষ্ট। অবশ্য যদি সকলে কাজ করেন এবং কাজের যোগ্যতা তাঁদের থাকে।

প্রকৃত জনস্বার্থের কথা ভাবলে এখনও যুক্তফ্রন্ট দলের আয়তনের প্রসঙ্গ না তুলে যোগ্যতার বিবেচনায় মন্ত্রিদের মধ্যে দপ্তর পুনর্বণ্টন করতে পারেন। এর জন্য একটা মূল নীতি অবশ্য স্থির করে নিতে হবে: মন্ত্রিরা দলগত স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা না করে শুধু জনকল্যাণের জন্য কাজ করবেন।

২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯।

পরস্পরে অবিশ্বাস, তবু যৌথ সংসার চলছে

দ্বিতীয় পর্যায়ের যুক্তফ্রণ্ট সরকার যে এত তাতাতাড়ি এমন একটা শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়বেন মাস তিন চার আগেও কেউ তা কল্পনা করতে পারেন নি। বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ফ্রণ্টকে আর যুক্ত বলে চেনাই কঠিন।

যুক্তফ্রণ্ট এখন কিভাবে কোথায় কতটা যুক্ত সেটা নিশ্চয়ই একটা উচ্চাঙ্গের গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে! সেই যে বত্রিশ দফা প্রতিশ্রুতি অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আগে যেটাকে নেতারা বলেছিলেন তাঁদের প্রধান ঐক্যসূত্র, তার কথা আজ শোনা যায় শুধু পারস্পরিক গালিগালাজের সময়। আজ পশ্চিবাংলায় শ্রমিক সংস্থা বি পি এন টি ইউ সি-র সঙ্গে বামপন্থা বি পি টি ইউ সি, হিন্দ মজদুর সভা এবং ইউ টি ইউ সি-র যে বোঝাপড়া আছে ব্যাপক জনগণের স্বার্থে ফ্রণ্টের চোদ্দ দলে তার অর্ধেক সমঝোতাও নেই। আজ ফ্রণ্টের চোদ্দ দলের অধিকাংশই একে অপরের শত্রু। দেখে শুনে কেউ বলবেন না, ওঁরা সবাই কোনও মহৎ কাজে সহযোগী।

বিভিন্ন শরিক দল, ফ্রণ্টের বিভিন্ন নেতা আজ যেসব কথা বলছেন, জনসাধারণ তাতে বিস্ময়ে হতবাক। গত ছয় সাত মাস পশ্চিমবঙ্গে বিভীষিকার রাজত্ব চলছে; বাংলা কংগ্রেসের এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে প্রশ্ন উঠাই স্বাভাবিক শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এখনও মুখ্যমন্ত্রী আছেন কোন প্রয়োজনে, কী স্বার্থে? বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই প্রভৃতি দল জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের হয়ে আর্তনাদ করছেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের এই

মূল্যায়ন যদি বাস্তব হয়, তাহলে সি পি এম এঁদের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টে আছেন কেন, একসঙ্গে সরকারই বা চালাচ্ছেন কেন? শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরণেন সেন যদি মনেই করেন যে, গোটা পশ্চিম-বঙ্গে পুলিস আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর দল সি পি এম-এর স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে, তাহলে সি পি আই-এর মন্ত্রীসভায় থাকার স্বার্থকতা কোথায়?

এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি—পারস্পরিক মারামারি কাটাকাটি হানাহানি চলছে, অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের বিরাম নাই, কিন্তু তবু সরকার চলছে এবং এতকিছু করে এত কথা বলেও শেষ পর্যন্ত ওঁরা সবাই দাবি করছেন, আমরা জনগণের কল্যাণ করছি।

একে 'হাঁসজারু' রাজনীতি ছাড়া আর কিছু বলা যায়?

এই 'হাঁসজারু' রাজনীতির চূড়ান্ত প্রকাশ বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক মণ্ডলীর সাম্প্রতিক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে বর্তমান সরকারের রাইটার্স বিল্ডিংসে অধিষ্ঠিত থাকারই কোনও সার্থকতা নেই।

অন্যান্য বহু অভিযোগের সঙ্গে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, 'প্রশাসন যন্ত্রের ঔদাসীন্য জনমানসে এক চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতা এবং অনিশ্চয়তা সঞ্চার করেছে। দল বিশেষের নামে সমাজবিরোধী ব্যক্তিগণ, শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক দলের কর্মিগণ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ওপর অকথ্য অত্যাচার করছে, সেই দলের সদস্য না হলে পথ চলা ও জীবনধারণ করা অসম্ভব করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা, মানুষের সাধারণ অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়েছে।' প্রস্তাবের বর্ণনা মত পরিস্থিতি যদি বাংলা দেশে হয়েই থাকে, তাহলে অজয়বাবু বর্তমান ,সরকারের কর্ণধার পদে অধিষ্ঠিত থাকছেন কোন যুক্তিতে? যে সরকার পশ্চিমবঙ্গের এই হাল করেছেন তার কি অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত নয়?

বাংলা কংগ্রেস হঠাৎ এই রকম একটা প্রস্তাব নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন কেন, তাও বোঝা কঠিন। এর আগে কি প্রকাশ্যে এরকম কোনও আভাসও তাঁরা দিয়েছেন? অজয়বাবুকে গত ছয় মাসে বহুবার সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছেন, আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রাজ্যে কেমন বলে আপনি মনে করেন? মুখ্যমন্ত্রী বারবারই জবাব দিয়েছেন, মোটামুটি ভালই। হঠাৎ তাঁর দল আজ বলছেন কেন: মানুষের অধিকার বিপন্ন, পথ চলা ও জীবনধারণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে? এই অবস্থা হলে নিশ্চয়ই তা এক দিনে হয়নি, বেশ কিছুদিন ধরেই হয়েছে। জানতে পারি কি, মুখ্য-মন্ত্রীর দল তা প্রতিরোধের জন্য এতদিনে কী কী চেষ্টা করেছেন?

কোনও নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকের পক্ষেই অবশ্য জ্যোতিবাবুর মত সাদা রুমালে মুখ মুছে বলা সম্ভব নয়, 'পশ্চিমবঙ্গে সব ঠিক হ্যায়।' আবার যে কোনও বঙ্গবাসীর পক্ষেই বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে 'সত্য বিবরণ' বলে সার্টিফিকেট দেওয়া অসম্ভব। হ্যাঁ মারামারি হচ্ছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, ঘেরাও কিছু কিছু হয়েছে (গতবারের তুলনায় অনেক কম) অনেক মানুষ মারাও গিয়েছেন এবং প্রশাসন যন্ত্র—বিশেষ করে পুলিস—সর্বত্র নিরপেক্ষ ভাবে কর্তব্য পালন করছে না। কিন্তু তা বলে কয়েক শত 'হত্যা-কাণ্ডের', 'পথ চলতে না পারার', 'ঘেরাওয়ের ফলে শিল্পে অভাবনীয় বিশৃংখলা দেখা দেওয়ার', 'অনেক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা বিপন্ন হওয়ার' অভিযোগ অবাস্তব, অসত্য।

যুক্তফ্রন্টের আমলে শ্রমিক ও কর্মীদের জন্য এবং বেশ কিছু ভূমিহীন কৃষকের জন্য অনেক কিছু হলেও বহু মানুষই যুক্তফ্রন্ট রাজত্বে সন্তুষ্ট নন। এমন কি যাঁরা নির্বাচনের সময় যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করেছিলেন তাঁদের অনেকে আজ অনেক কারণেই আশাহত। বিশেষভাবে শরিকী সংঘর্ষে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে, দুর্নীতি অব্যাহত থাকায়, প্রশাসন যন্ত্রের যথাপূর্ব আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ। কিন্তু তা

বলে এটা মনে করার মত এখনও কোনও কারণ ঘটেনি যে তাঁরা সবাই বাংলা কংগ্রেসের অভিযোগের সঙ্গে একমত বা এখনই ফ্রন্ট সরকারের পতন চান।

সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, সেটা হল, ফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস বলতে কোনও বস্তু আর নেই। সকলে এক সঙ্গে কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু তাঁরা একে অপরকে আর বিশ্বাস করেন না। ফ্রন্টের রাজনীতিতে আজ এটাই সবচেয়ে শোচনীয় সত্য।

ফ্রন্টের শরিকরা অধিকাংশই একজন আর একজনকে শত্রু বলে মনে করেন। একে অপরকে ভয় করেন। এই ভয়টা আবার সবচেয়ে বেশি সি পি আই (এম) সম্পর্কে। আর এস পি, ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি দু একটি দল ছাড়া অন্যান্য প্রায় সব শরিক দলের নেতারাই আজ মোটামুটি খোলাখুলিই বলেন যে, সি পি এম-এর একমাত্র লক্ষ্য হল অন্য সব দলের অস্তিত্ব মুছে ফেলে পশ্চিম বাংলায় নিজেদের একাধিপত্য বিস্তার করা। তাঁরা আরও বলেন, সি পি এম এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সরকারী যন্ত্র ব্যবহার করা থেকে আরম্ভ করে সমাজবিরোধীদের সাহায্য নেওয়া পর্যন্ত সব কাজ করছেন।

এসব অভিযোগ সত্য না মিথ্যা সে বিতর্কে আমি যাচ্ছি না। আমি শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই সি পি এম নেতাদের কাছে, ফ্রন্টের বৃহত্তম শরিক সম্পর্কে অন্যান্য শরিকদের মনে যদি এই রকম আতঙ্ক থাকে, তাহলে কি ফ্রন্ট টিকতে বা বাঁচতে পারে? না, এই অবস্থায় ফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠুভাবে এগোতে পারে?

কোনও শরিক দল তাঁদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ আনলেই সি পি এম নেতারা জবাব দিচ্ছেন: সব মিথ্যা, সব ষড়যন্ত্র—সবই

জোতদার এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থে বলা হচ্ছে। সকলের সব অভিযোগ সত্য, একথা আমি বলছি না। কিন্তু সি পি আই থেকে আরম্ভ করে এস ইউ সি পর্যন্ত অন্য সবাই শুধু মিথ্যা কথা বলছেন, জোতদার ও প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থে চিৎকার করছেন, আর শুধু সি পি এম-ই সত্য কথা বলছেন মেহনতী মানুষের স্বার্থে এগোচ্ছেন —মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য বা উগ্র সমর্থক ছাড়া আর কারও পক্ষে এটা বিশ্বাস করা সম্ভব ?

১০ই অক্টোবর, ১৯৬৯।

দেরি নেই, দিল্লীর হাওয়া পশ্চিমবঙ্গেও লাগবে

দিল্লীর রাজনৈতিক আবর্তের প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্টের ওপর প'ড়বে না, সি পি আই নেতা ডঃ রণেন সেন একথাটা না বললেই বোধহয় ভাল করতেন। কারণ আর দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ দেখতে পাবেন, দিল্লীর দমকা হাওয়া কীভাবে কলকাতায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে।

রাজধানীর এই দমকা হাওয়া যে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস রাজনীতিতে এসে লাগবেই সেটা শিশুও বোঝে। এটা আর কাউকেই বোধহয় বিশ্লেষণ করে বোঝানো প্রয়োজন নেই। এখানেও কংগ্রেসের লড়াই শুরু হল বলে। রণক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতিরা অনুপস্থিত বলেই যা একটু দেরি হচ্ছে। তাঁরা কয়েকজন এসে পৌঁছলেই দিল্লীর তালে তালে পা ফেলে এখানের কংগ্রেসী নেতারাও আসরে নেমে পড়বেন। দিল্লী ও কলকাতার কংগ্রেসী রাজনীতির এই যোগাযোগটা বুঝতে তেমন কোনও অসুবিধা নেই।

যেটা বোঝা কিছু অসুবিধার সেটা হল দিল্লীর কংগ্রেসী রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট রাজনীতির সম্পর্ক। স্বীকার করি, পর্দার আড়ালের খবরাখবর কিছুটা না জানলে এটা বোঝা কঠিন। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক, ওখানের কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে এখানের বামপন্থা রাজনীতির আবার যোগাযোগ কি থাকবে? এবং সাধারণ দৃষ্টিতে এটা অস্বাভাবিক মনে হয় বলেই কিছু লোক সব জেনে শুনে এবং বুঝেও কিছুই না জানার এবং না বোঝার ভান করতে পারছেন।

দিল্লীর কংগ্রেসী রাজনীতির প্রভাব কলকাতার যুক্তফ্রণ্টে পড়বে,

এটা আগে ভাগে স্বীকার করায় অবশ্য অনেকের অনেক অসুবিধাও আছে। কারণ তাহলে অনেক গোপন আলাপ আলোচনা, বহু নৈপথ্য কাহিনী বেরিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকবে। জনগন একটু বেশী জেনে এবং বুঝে ফেলবে। জনগণকে সব সময় সব কথা বুঝতে বা জানতে দেওয়া রাজনৈতিক দল বা নেতাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।

আমি আগে যেটা বলেছিলাম, এখনও তাই বলছি—দিল্লীর কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে কলকাতার যুক্তফ্রন্ট রাজনীতির ঘনিষ্ঠ যোগযোগ আছে। দিল্লীর রাজনীতি কীভাবে এগোচ্ছে সেটা বুঝতে পারলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট রাজনীতি কীভাবে এগোবে। ইতিমধ্যেই অবশ্য অনেকের অলক্ষ্যে রাজ্যের রাজনীতি রাজধানীর রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেকটা এগিয়েছে। যাঁরা চোখ কান খোলা রেখেছেন, তাঁরা বিভিন্ন 'প্রতিবাদপত্র' সত্বেও অনেক কিছুই দেখতে পেয়েছেন—বুঝেছেন, দিল্লীতে 'লেফ্ট' পা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানে কিভাবে 'রাইট' পা এগোচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ঠিক যেমন যেমন ভাবে দিল্লীর রাজনীতি এগোবে বলে শুনেছিলেন, ব্যাপারটা তার চেয়ে একটু দ্রুততালে এগোচ্ছে। ওঁরা জানতেন, কংগ্রেসের চূড়ান্ত লড়াইটা শুরু হবে ডিসেম্বরের গোড়ায় এবং শেষ হবে জানুয়ারিতে, তাই সেই ভাবেই অঙ্ক কষে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন, না তার আগেই দামামা বেজে উঠেছে, কামানের গোলাগুলি ছোঁড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আমার তাই মনে হয়, এবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিও বেশ দ্রুত তালে এগোবে।

চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আগে অবশ্য সবাই দিল্লীর চূড়ান্ত পরিবর্তনটা দেখে নিতে চাইবেন। তার আগে চলবে প্রস্তুতি। যদিও

দিল্লীর চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে এরাজ্যের বামপন্থী নেতাদের মনে খুব বেশী সংশয় নেই। তাঁরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন, শ্রীমতী গান্ধীই জিতবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় যেমন যুক্তফ্রণ্ট প্রধান-মন্ত্রীকে সাহায্য করেছিলেন, এবারেও তেমনি লোকসভার শক্তি পরীক্ষায় যুক্তফ্রণ্ট অন্তর্ভুক্ত দলগুলির এম পিরা প্রধানমন্ত্রীকেই সমর্থন করবেন। প্রায় সকলেই ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ বা সিণ্ডিকেট পক্ষের কেউ কোনও অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে এলে তাঁরা তার বিপক্ষে ও ইন্দিরার পক্ষেই ভোট দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গের শরিক দলগুলি, বিশেষ করে সি পি আই এবং সি পি এম ব্যাপারটা ঠিক স্বীকার করতে চান না—কিন্তু আসলে এবার সরকারের অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ভোট দেওয়ার একটাই মানে। সে মানেটা হল, তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীকেই আপাতত প্রধানমন্ত্রী রাখতে চান।

ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ধরুণ, লোকসভায় সি পি আই, সি পি এম, বাংলা কংগ্রেস, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি দলের আটজন সদস্য আছেন। যদি সিণ্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতি একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং যদি সেই সময় এঁরা নিরপেক্ষ থাকেন তাহলেই সরকারের পতন ঘটে। এই পরিস্থিতি লোকসভার ভোটাভুটিতে পরিষ্কার ধরা পড়বে। কিন্তু সরকারের পতন ঘটা মানেই সিণ্ডিকেটের জয় নয়। এঁদের সমর্থন না পেলে আবার সিণ্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি প্রভৃতিও একযোগে সরকার গড়তে পারবেন না। তাই, এঁরা যদি কোনও ভোট না দেন তাহলে কংগ্রেসের কোনও পক্ষই সরকার গড়তে পারবেন না। অর্থাৎ কংগ্রেসের দু পক্ষকেই এখনই বিদায় নিয়ে আবার নির্বাচনে নামতে হবে।

কিন্তু বামপন্থী দলগুলি তা করছেন না। তাঁরা সরকারের সঙ্গে ভোট দিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে আপাততঃ বাঁচিয়ে দিতে চাইছেন। এর পেছনে তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য যে এক তা অবশ্য নয়। নানা জন নানা কারণে শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী রাখতে চাইছেন।

দিল্লীর লড়াইয়ে প্রধানমন্ত্রী যদি জিতে যান তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের পতন ত্বরান্বিত হবেই। আবার সিণ্ডিকেট পক্ষ জিততে পারলে ফ্রণ্টের ঐক্য বাড়বেই। অর্থাৎ তখন ওঁরা কমন শত্রুর বিরুদ্ধে একজোট হতে বাধ্য হবেন। সিণ্ডিকেট ওঁদের কমন শত্রু, কিন্তু ইন্দিরা তা নন। বরং ইন্দিরা কয়েক দলের কমন বন্ধু।

এটা যে আমার বিশ্লেষণ লব্ধ কোনও জ্ঞান তা নয়। এটা খবর। এই খবর বেশ কিছুদিন হল কলকাতায় পৌঁছেছে। খবরটা জানেনও অনেকেই। সেইমত এগিয়েছেনও কিছুটা। কিন্তু জেনে শুনেও একদল কিছু বলতে চাইছেন না; আর একদল কিছু বলতে পারছেন না। যাঁরা বলতে চাইছেন না তাঁরা সবটা বলছেন না অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে। আর যাঁরা বলতে পারছেন না তাঁদের পক্ষেও বলা অসম্ভব—কারণ তাহলে দলের সদস্য ও সমর্থকদের বোঝানো সম্ভব হবে না কেন তা সত্বেও তাঁরা প্রধান-মন্ত্রীর পক্ষে ভোট দিচ্ছেন। তাই দু পক্ষেই লুকোচুরি খেলা চলছে।

কিন্তু কী কার অসুবিধা, সেই বিবেচনায় ঘটনা প্রবাহ আটকে থাকবে না। যেমন এখন এতকিছুর পর সর্বশ্রী জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও হরেকৃষ্ণ কোঙার শত চেষ্টা করলেও গ্রামে গ্রামে তাঁদের দলের কর্মী ও সমর্থকদের আর ধরে রাখতে পারবেন না। তেমনি, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধী জিতলেও পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম

বিরোধী সকল দল আর চুপচাপ বসে থাকতে রাজী হবেন না। তাঁরা সি পি এমকে শায়েস্তা করার জন্য ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মেলাবেন।

অবশ্য এসব কিছুর আগেই এই চরম অনিশ্চিত সংকটজনক মুহূর্তে ভারতের রাজনীতি হঠাৎ কোনও আচমকা মোড় নিতে পারে। এবং সেজন্য হয়তো এখনও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত কেউই প্রস্তুত নন।

৭ই নভেম্বর, ১৯৬৯।

কাজ চলছে—রাজকার্যের বদলে পার্টির কাজ

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আয়ু ঠিক কত দিন, জানি না। তবে এটা বুঝেছি যে, এই জীবনমৃত অবস্থায় আরও যে কদিন এই সরকার এই ভাবে থাকবেন ততদিন পশ্চিমবাংলারই মুশকিল।

আইন মত অবশ্য বিধানসভায় বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে একটি সরকার ঠিকই বহাল। আর্দালি-চাপরাশি-পি এ সি-এ-স্টেনো-টেলিফোন পরিবৃত হয়ে প্রায় দেড়কুড়ি মন্ত্রী নিয়মিত মহাকরণের শোভাবর্ধন করছেন। অনুষ্ঠানেও কোনও ত্রুটি নেই। টাইপ-রাইটারগুলি হরদম ছটফট করছে, গাড়িগুলি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, সেপাইরা খটাখট স্যালুট দিচ্ছেন। এবং ঝাঁকে ঝাঁকে খবরের কাগজের রিপোর্টার বার বার ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু এত শতর পরেও আসল যেটা সেইটাই যেন আর চলছে না—রাজকার্য যেন বন্ধ। রাইটার্স বিল্ডিংস মাস দু-তিন ধরে একেবারে থ মেরে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ফাইলগুলি সব চুপচাপ ধুলোর পাহাড়ের আড়ালে আড়ালে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু তা বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, মন্ত্রীরাও ঘুমোচ্ছেন। আসলে বরং ব্যাপারটা উল্টো। তাঁরা অন্য কাজে খুব বেশি ব্যস্ত। তাই মহাকরণের কাজকর্মে মন দিতে পারছেন না। তাইনা ফাইলগুলি একটু ঘুমিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। মহাকরণও এই শীতে তেমন না নড়েচড়েই দিন কাটিয়ে দেওয়ার ফুরসুৎ পাচ্ছে।

মহামান্য মন্ত্রীরা কেউই চুপচাপ বসে নেই। মুখ্যমন্ত্রী সেই যে সকাল বেলা ফাইল দেখে এবং জনগণের সঙ্গে কথা বলে মহাকরণে বের হন আর মিটিং-বৈঠক সেরে বাড়ি ফেরেন রোজই প্রায় রাত

দশটায়। উপমুখ্যমন্ত্রীও ভীষণ ব্যস্ত। চারটি খেয়ে নিয়ে সামনে পিছনে গুটি সাতেক তাগড়াই সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে সাত সকালেই তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের মুখ দেখার সুযোগ পান আর সেই প্রায় মধ্যরাত্রে। অসুস্থ শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারেরও এতটুকু ফুরসুৎ নেই। অবিরাম ভিজিটার। সর্বদাই কমরেডদের আনাগোনা। দলের পক্ষে বিশাল কৃষক আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার মহান দায়িত্বও তাঁর। বার বার তাই তাঁকে বাইরে যেতেই হয়।

বাইরে বাইরে বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শ্রীসুশীল ধাড়াও। অদম্য উৎসাহ। প্রায় ষাট বছরেও তিনি বাইশ ঘণ্টা খাটতে পারেন। কাজে সর্বদা এত ব্যস্ত যে প্রায় সব সময়ই তাকে দৌড়ে দৌড়ে হাঁটতে হয়।

চুপচাপ বসে নেই শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিও। কাঁধে ফ্লাকস্ক ঝুলিয়ে প্রতি সপ্তাহে প্রায় হাজার কিলোমিটার করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কমরেড মুখার্জী। এমন যে শ্রীভক্তি মণ্ডল, যাঁর বুকের একটা দিক কেটে একেবারে বাদ দেওয়া, তিনিও অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, ব্যস্ত সবাই। ছোট, বড়, মাঝারি সব মন্ত্রী। পাসপোর্ট থেকে আরম্ভ করে ট্রান্সপোর্ট পর্যন্ত কারুরই বিশ্রাম নেই।

কিন্তু এত সত্ত্বেও রাজকার্য এগোচ্ছে না। সরকারের এত তেল পুড়ছে, এত টেলিফোন খরচা হচ্ছে, এত টি এ বিল বাড়ছে, তবুও রাজকার্য ঠিক ঠিক চলছে না। এক পুলিস দপ্তর ছাড়া গোটা প্রশাসন যন্ত্র তার বিরাট বিশাল দেহ নিয়ে আফিং খোরের মত চুপচাপ ঝিমুচ্ছে।

জানতে চাইবেনই, কেন এই পরিস্থিতি?

জবাবটা খুবই ছোট্ট: মন্ত্রীরা যে যার পার্টির কাজ নিয়ে এত

মগ্ন যে, রাজকার্য চালাবার ফুরসুৎ বা মানসিক অবস্থা তাঁদের আর তেমন নেই।

সরকারী কাজের চেয়ে পার্টির কাজকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারটা গোড়া থেকেই অবশ্য শুরু হয়েছিল। এখন সেটা একেবারে চরমে পৌঁছেছে। গোড়ায় যদি আধাআধি ছিল তো এখন ব্যাপারটা প্রায় পুরাপুরিতে দাঁড়িয়েছে—সরকারী রথে চড়ে সরকারী বাংলোয় থেকে সরকারী টি এ আদায় করে মন্ত্রীরা পার্টির কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং, যতই এ সরকারের দিন ঘনিয়ে আসছে ততই যেন মন্ত্রীদের পার্টি প্রেম বেড়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রীরা পার্টির কাজ করবেন না, এমন কথা কেউই বলবে না। নিশ্চয়ই মন্ত্রারা পার্টির কাজ করবেন। কিন্তু তা বলে মন্ত্রীরা শুধুই পার্টির কাজ করবেন; এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। যদি পার্টির কাজে এতই আগ্রহ, তা হলে মন্ত্রী না হলেই হত।

তাছাড়া সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়ে সরকারী কাজ না করে শুধুই পার্টির কাজ করাটাও নিশ্চয়ই অপরাধ। যখন মন্ত্রীরা পার্টির কাজে জেলায় জেলায় ঘোরেন, তখন তাঁদের সরকারী গাড়ি-বাড়ি ব্যবহার করা উচিৎ নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সঙ্গে একটা ছোট্ট অফিসিয়াল প্রোগ্রাম জুড়ে দিলেই সবটা শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা যদি মনে করেন, লোক বোকা, কিছু বোঝে না, দেখে না, তাহলে তাঁরা বাস করছেন মুর্খের স্বর্গে।

এসব অন্যায়ও না হয় সহ্য করা যেত যদি দেখা যেত তারা প্রাণপণে রাজকার্যও করছেন—পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির জন্য সর্বোতো-ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তেমনটি যে দেখাই যাচ্ছে না। যে যেটুকু করছেন সেটাও নেহাতই পার্টির প্রয়োজনে, দলের স্বার্থে এবং দৈনন্দিন ঠাটটা বজায় রাখার জন্য।

যেটা আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেই দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন

পরিকল্পনা নিয়ে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কি কেউ করছেন? শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সড়কের সম্প্রসারণ—এসব কাজ গত প্রায় দশ মাসে কতটুকু এগিয়েছে? বেকারী কমাবার জন্য, দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করার পথে যুক্তফ্রন্ট সরকার কতটুকু কী করেছেন।

কেউ অনশন-সত্যাগ্রহ করছেন, কেউ বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, কেউ চক্রান্ত ফাঁস করছেন কেউ বা শ্রেণীসংগ্রাম ত্বরান্বিত করতে ব্যস্ত। আর সেই ডামাডোলের আবর্তে পড়ে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পেছনের দিকে নেমে যাচ্ছে। বাঙালী তার অজান্তে অলক্ষ্যে অকূল সাগরে ডুবছে।

কেউ কেউ হয়ত ভাবছেন আমি তিলকে তাল করছি। তা কিন্তু ঠিক নয়। এরা যে সরকারী কাজকর্মে অবহেলা করে শুধুই পার্টির স্বার্থ দেখছেন সেটাও অতিরঞ্জন নয় এবং এই অবহেলার ফলে যে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে তাও অতিশয়োক্তি নয়। প্রথমটা অনেকেই চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছেন। দ্বিতীয়টা হয়ত এখনই সকলের চোখে ধরা পড়ছে না।

আমাদের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন উপমুখ্যমন্ত্রীর মত অবশ্য বলা যায়, সবই দেখছি বেশ চলছে, তবে পিছোচ্ছে আবার কী! হ্যাঁ, বাহ্যত দেখলে তাই। সবই চলছে কিছুই পিছোচ্ছে না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা যে পিছোচ্ছি সেটা ধরা পড়বে অনেক দিনে, অনেকটা পিছিয়ে যাওয়ার পরে। তার আগে ব্যাপারটা মালুমই হবে না।

মালুম হবার নয়। কারণ এই ধীরে ধীরে পিছোনোটা চোখে সহজে ধরাই পড়ে না। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাটাই যে পিছিয়ে যাওয়া। আজ পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে আছে বলে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভিন্ দেশীদের আগমণ এসবই বন্ধ হয়ে আছে? মোটেই না। একটা বন্ধ, কিন্তু আর একটা অব্যাহত।

প্রতিদিন হাজার হাজার নতুন মুখ জন্ম নিচ্ছে! প্রতি সপ্তাহে শত শত যুবককে চাকরির খোঁজে বের হতে হচ্ছে। উন্নয়ন, অগ্রগতি যদি বন্ধ থাকে তাহলে নতুন মানুষের চাহিদা কোথা থেকে মেটানো হবে? আমাদের বর্তমান সম্পদ থেকেই নয় কি? তাহলে কি ধীরে নবাগতদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেও পিছিয়ে যাব না?

বাঁচতে হলে বাড়তে হবে—এগিয়ে যেতেই হবে। পশ্চিমবঙ্গ আজ শাসক দলের অন্তর্কলহে পঙ্গু। এই পঙ্গু দশা যদি বেশিদিন চলে তাহলে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হতে বাধ্য। সে ক্ষতিপূরণ করতেও বহু সময় লাগবে।

১২ নভেম্বর, ১৯৬৯

হুজুগ আর হৃদয়হীনতা —আমাদের দুই ব্যাধি

হুজুগপ্রিয়তা এবং হৃদয়হীনতা আমাদের সমাজকে কীভাবে সংক্রামিত করেছে ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে সেটা খুব নগ্নভাবে ধরা পড়ল। আমরা ছেলেবুড়ো, শিক্ষিত অশিক্ষিত সবই হুজুগে পড়ে যে কতটা পাগল হয়ে উঠতে পারি এবার তার চূড়ান্ত প্রমাণ দেখা গেল। এবারই আরও দেখা গেল, আমরা মানবিক চেতনাগুলি হারিয়ে ফেলতে ফেলতে কিভাবে পশুদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছি।

আমাদের এই দুটো বৈশিষ্ট্যই হঠাৎ ঘটা কিছু নয়। ধীরে ধীরে এই হুজুগপ্রিয়তা এবং হৃদয়হীনতা আমাদের গ্রাস করেছে। এখন দুটো ব্যাপারই প্রায় চূড়ান্তে এসে পৌঁছেছে। আমারা বোধহয় এখন হুজুগে পড়ে যে কোনও কাজ করতে পারি এবং খুব সম্ভব আমরা প্রায় সকলেই যে কোনও অমানুষিক দৃশ্য চোখ বুজে এড়িয়ে যেতে পারি। আমরা বিশেষ করে এই বৃহত্তর কলকাতার অধি-বাসীরা, সব মিলিয়ে এখন এমন একটা বিচিত্র পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছি, যেখানে আমাদের জন্য কোনও বিশেষণ খুঁজে বের করতে বোধহয় সুনীতি চাটুজ্জের মত পণ্ডিতও হিমশিম খেয়ে যাবেন।

আমাদের সামগ্রিক গোষ্ঠী জীবনকে হুজুগপ্রিয়তা কী অদ্ভুত ভাবে গ্রাস করেছে একটু ভাবলেই যে কেউ তা বুঝতে পারবেন। সর্বক্ষেত্রে হুজুগ। ধনী-দরিদ্র সবাইকে এই হুজুগপ্রিয়তা স্পর্শ করেছে। চোঙা প্যাণ্ট যত তাড়াতাড়ি কলকাতাকে গ্রাস করেছে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর অন্য কোনও বড় শহরকে কায়দা করতে

পেরেছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। এটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি—খবরের কাগজে কাজ করার সুবাদে পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আবার দেখুন, কে জি স্কুল নামক বস্তুটি আমাদের এই মহানগরীর বুকের ওপর কীভাবে চেপে বসেছে। ব্যাঙের ছাতার মত গলিতে গলিতে কে জি স্কুল গজিয়েছে। এবং সকল অভিভাবক মরে বেঁচেও সেই সব কে জি-র পিছনে ছুটছেন। একটু সচ্ছল মধ্যবিত্তের মধ্যে আবার মর্ডান হওয়ার প্রচণ্ড একটা বাসনা জেগেছে ইদানীং। ফলে দেখবেন এরা সবাই যেন ক্লাবে বারে গিয়ে একটু 'ড্রিংক' না করে, 'হাউ ডু ইউ ডু' না বলে আর থাকতে পারছেন না। বছর দু তিন আগেও দেখতাম দুপুরবেলা ময়দানের দক্ষিণ দিকে মেমসাহেবরা গলফ খেলতেন। এবার দেখছি ইয়া ইয়া পাঞ্জাবী এবং বাঙালী মহিলাদের মধ্যে গলফ খেলার একটা ছুটোপুটি পড়ে গিয়েছে। এসবই হুজুগ। যখন যে হুজুগটা আসে তখনই সেটা আমাদের পাগল করে তোলে।

আমাদের রাজনৈতিক জীবনেও যেন এই হুজুগপ্রিয়তা একটা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। একটা সময় দেখলাম এই শহরের অনেকেই কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছেন। বাড়িতে যারা কাজ করে তাদের দু'টাকা মাইনে বৃদ্ধির প্রস্তাব শুনলে আমরা যাঁরা আঁতকে উঠি তাঁরাও মেহনতী মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের জন্য গলা ফাটাতে শুরু করলাম। এখন আবার দেখুন আস্তে আস্তে এই শহরে একটা নকশালী হুজুগ এসেছে। নকশালপন্থা কী ও কেন তা জানার চেষ্টা কারুর নেই, মুখে কিন্তু ছেলে বুড়ো অনেকেই বলছেন, "না মশাই, আর কোনও পথ নেই, ওই একটাই পথ।" যেন সবাই মাও সে তুং-এর চিন্তাধারা গুলে খেয়ে একেবারে এক একজন চারু মজুমদার বনে গিয়েছেন। এও এক রকমের হুজুগ।

কেউ হুজুগে মাতুন তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, যদি না তা ব্যাপক সমাজ জীবনকে বিপর্যস্ত করে, যদি না তাতে অপরের ক্ষতি হয়। তবে হ্যাঁ, ব্যক্তিগত হুজুগের গতি যদি ভালর দিকে যায় তবে তা সমাজের মঙ্গল করতে পারে, আর তা যদি খারাপ দিকে যায় তবে তা সামগ্রিক ভাবে সমাজেরই ক্ষতি করে। আমি যখন ওয়াশিংটনে ছিলাম, তখন দেখেছিলাম সেখানে শহরটাকে পরিষ্কার রাখার হুজুগ পড়েছে। এমন কোনও হুজুগে কলকাতার মানুষ পাগল হয়ে উঠলে আমাদের সকলেই মঙ্গল হত।

আমাদের হৃদয়হীনতার ব্যাপারটা অবিমিশ্র অভিশাপ হিসাবেই এসেছে। খেলার মাঠের পরিস্থিতি নিয়ে আমি আর একদিন আলোচনা করেছি। ছজন তরুণ যে খেলা দেখতে গিয়ে যেভাবে মরলেন এবং যেভাবে তারপরও সেই খেলা নিয়ে সেই মাঠে মাতামাতি চলল, তা দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

আমার একজন সহকর্মী সেদিন আরও মর্মান্তিক একটা উদাহরণ দিলেন। তিনি একদিন লোক্যাল ট্রেনে হাওড়া আসছিলেন। হঠাৎ একজন ঝুলন্ত ছেলে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন। সহকর্মী তাই দেখে লাফিয়ে উঠে চেন টানতে গেলেন। কিন্তু কামরার অনেকেই তাঁকে বাধা দিলেন। উপদেশও শুনতে হল সহকর্মীকে কিছুটা: যে গিয়েছে আপনি কি আর তাঁর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পারবেন। ট্রেন থামিয়ে সকলের অফিস লেট করার প্রয়োজন কি?

এটা হয়ত কিছুটা বেশি মর্মান্তিক উদাহরণ। এমন ঘটনা হয়ত খুব বেশি ঘটেনা। কিন্তু আমরা হাসপাতালগুতিতে, অফিসে-কাছারিতে প্রতিদিন যা দেখছি সেগুলি তো আর ব্যতিক্রম নয়। সেগুলি যে প্রতিনিয়ত ঘটছে।

আমার এক সহকর্মীর বাবা এখন হাসপাতালে আছেন। অপারেশন হয়েছে। সেদিন রাত্রে হঠাৎ পাশের রোগীর চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। 'জল' 'জল' বলে ভদ্রলোক চীৎকার করছেন।

কোনও ওয়ার্ডবয়, কোনও নার্স এগিয়ে আসছেন না এক গ্লাস জল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত আমার সহকর্মীর পিতা আর সহ্য করতে না পেরে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলেন এবং সেই চীৎকার শুনে একজন জল এগিয়ে দিলেন।...আমার বোন বছরখানেক আগে হাসপাতালে ছিল। প্রচণ্ড জ্বর। প্রায় অচেতন। 'কম্বল' 'কম্বল' বলে ঘণ্টা-খানেক চিৎকার করার পর একজন কর্মী একখানি কম্বল নিয়ে ঢেকে দিয়ে গেলেন। পরদিন ভোরে উঠে রোগী দেখতে পেল সারা কম্বলখানা বমিতে ভাসানো—কোনও এক রোগীর বমিতে ভেজা কম্বলই ওর গায়ে চাপা দিয়ে গিয়েছেন সেই কর্মী।

এর চেয়ে অনেক বেশি শোচনীয় ঘটনা যে প্রতিটি হাসপাতালে প্রতিদিন ঘটছে, তা অনেকেই জানেন।

আপনি যদি রাজ্য সরকারের ফাইনান্স দপ্তরে যান, আপনি যদি লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনে যান প্রতিদিন হৃদয়হীনতার বহু নিদর্শন দেখতে পাবেন। দেখবেন পেনসনের জন্য, ম্যাচিওর্ড পলিসির টাকার জন্য অসহায় বৃদ্ধরা কিভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এমন সব অমানুষিক আচরণের উদাহরণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রায় সকলেই কমবেশি দেখতে পাই।

কারা এমন ব্যবহার করেন? কারা এমন হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন? নিশ্চয়ই আমি আপনি বা আমার আপনার মত লোকেরাই। আমরা ঝাণ্ডা হাতে নিগৃহীত জনগণের দাবি নিয়ে চিৎকার করি, আমরাই আবার রোগীর সঙ্গে, অসহায় বৃদ্ধদের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করি। তাই বলছিলাম, আমরা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে আমাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন।

প্রশ্ন উঠতে পারে এসবের সঙ্গে রাজনীতির যোগযোগ কোথায়? আমি মনে করি আছে। কারণ রাজনৈতিক নেতারা তো আর শুধুই রাজনীতিবিদ নন—রাষ্ট্র ও রাজ্যের কর্ণধার রূপে তাঁরা

সমাজকে পরিচালনা করেন—সমাজ ব্যবস্থা ভাঙেন গড়েন। সেই দিক দিয়ে সমাজে কোনও খারাপ ধারা যাতে না আসতে পারে সেটা দেখার অনেকটা দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের।

আমাদের মধ্যে হুজুগে মাতার এই যে নেশা জেগেছে বা হৃদয়-হীনতা যে এমন প্রচণ্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তাকে দমন করার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব কোনও দিনই কিছু করেন নি। যদিও রাজত্বের প্রথম দিকে অর্থাৎ যখন তাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তখন এই কাজে হাত দেওয়ার, এই প্রবণতা বন্ধ করার যথেষ্ট সুযোগ তাঁদের ছিল।

দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের যুক্তফ্রণ্ট নেতৃত্বও এই ব্যাপারে কিছুই করছেন না। তাঁরাও সেই একই পথে চলেছেন। মানুষের হুজুগপ্রিয়তা কমাবার, মানুষকে কর্তব্যপরায়ণ করে গড়ে তোলার, মানুষকে মানুষ করে গড়ার এতটুকু চেষ্টা যেন এই নেতৃত্বের নেই। উল্টো তাঁরা অনেকেই বহুক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলা, দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা এবং সরকারী কর্মীদের হৃদয়হীনতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৯।

ভাঙনের মুখে এসে বিচিত্র রাজনীতি

ভাঙনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যুক্তফ্রন্টের শরীক দলগুলি ও নেতারা এক অদ্ভুত ভণ্ডামীর রাজনীতি চালাচ্ছেন। তাঁরা নেপথ্যে যেসব কাজ করছেন, প্রকাশ্যে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করছেন। তাঁরা গোপনে যে পথে এগোতে চাইছেন, বাইরে মুখে ঠিক তার উল্টো পথের নির্দেশ দিচ্ছেন। এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কোনও রকমে যদি তাঁদের আসল উদ্দেশ্য, নেপথ্য ক্রিয়াকলাপ বা গোপন আকুতি-মিনতির একটু আধটু খবরাখবর সংবাদপত্রে বেরিয়ে যায় তো আর রক্ষে নেই। নেতারা একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠছেন। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার শুরু হচ্ছেঃ এসব কাগজগুলির গাঁজাখুরি গল্প। এসব বুর্জোয়া সংবাদপত্রের চক্রান্ত।

শ্রীসুশীল ধাড়া দিল্লী যাচ্ছেন। তিনি বাবু জগজীবন রাম থেকে আরম্ভ করে রাজা দীনেশ সিং পর্যন্ত নব কংগ্রেসের কেষ্টবিষ্টুদের সঙ্গে দমকা আলোচনা সেরে কলকাতা ফিরে আসবেন। এবং তারপর সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের বলবেন, আমি ওদের সঙ্গে শুধু পশ্চিমবঙ্গের শিল্প নিয়ে কথা বলেছি—আর রিপোর্টারদেরও সেই কথাই বিশ্বাস করে নিতে হবে। যদি তাঁরা তা না করেন, যদি বলেন সুশীলবাবু পশ্চিমবঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ করতে দিল্লী গিয়েছিলেন, তাহলেই সেটা গাঁজাখুরি গল্প হয়ে যাবে!

বাবু জগজীবন রাম বলবেন, সুশীলবাবু আমার পুরোণো বন্ধু, তাঁর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ ব্যাপার স্যাপার নিয়ে এবং শিল্প-পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছি—রিপোর্টারদের তাও বিশ্বাস করতে হবে। মানতে হবে জগজীবনবাবুতে এবং সুশীলবাবুতে সত্যিই

দীর্ঘকালের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব রয়েছে। শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলবেন, আমরা ফ্রন্টের ঝগড়ায় মোটেই আগ্রহী নই, উৎসাহী নই—রিপোর্টারদের সেকথাও মেনে নিতে হবে! এসব না জেনে অন্য কিছু লিখলেই কোনও সন্দেহ প্রকাশ করলেই সেটা চক্রান্ত হয়ে যাবে!

অস্থির অজয়বাবু জনে জনে ডেকে বলবেন 'আমি পারছি না, আমি আর পারব না, তোমরা এখনই সিদ্ধান্ত কর' এবং সেই সব কথা শুনে সোমনাথবাবু, কানাইবাবু, ভক্তিবাবুরা গম্ভীর গম্ভীর মুখ করে মুখ্যমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলবেন, 'আপনারা রিপোর্টাররা যে এত সংকট কোথায় দেখেন; তো তো বুঝি না!' সবাইকে তাও মেনে নিতে হবে। না মানলেই বিপদ। যদি বলা হয়, ওঁরা অজয়বাবুকে বলেছেন, আর একটু অপেক্ষা করুন, আর একটু ধৈর্য ধরুন; আমরা তো আপনার সঙ্গে আছিই। এবং যদি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যও হয় তা হলেও বিপদ। অমনি চিৎকার উঠবে: খবর কাগজগুলি আমাদের নামে সব মিথ্যে কথা লিখছে। সব চক্রান্ত করছে।

ঘোরতর মার্কসবাদী শ্রী পি সুন্দরায়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রবল পরাক্রান্ত উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লী ছুটবেন, আর হরেকৃষ্ণবাবু বলবেন, 'ওঁরা চণ্ডীগড় নিয়ে কথা বলছেন' এবং তাও রিপোর্টারদের মানতেই হবে! না মানলেই সেটা বুর্জোয়া ষড়যন্ত্র হয়ে যাবে।

সুন্দরায়া সাহেব ও জ্যোতিবাবু নয়া কংগ্রেসের তিন মূর্তির সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা সেরে কলকাতা ফিরে এসে একখানা চিঠি 'রিলিজ' করবেন এবং বলবেন, 'আমরা ওদের শুধু বলতে গিয়েছিলাম, তোমরা ভুল পথে চলছ, তোমরা সিণ্ডিকেট বিরোধী অভিযান ঠিক ঠিক চালাতে পারছ না,—সাংবাদিকদের তাও মেনে নিতে হবে। যদি জানতে চাওয়া হয়, আপনারা কি ওদের

কাছে কোনও অনুরোধ জানাতে গিয়েছিলেন, আপনারা কি কোনও গোপন চুক্তি করতে গিয়েছিলেন, আপনারা কি ওদের আশ্বস্ত করতে গিয়েছিলেন—তাহলেই একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন, 'এসব কি বোগাস প্রশ্ন, আমরা কি ওদের দয়ায় এখানে আছি।' এবং তাও মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। না মানলেই শুনতে হবে, আপনারা চক্রান্ত করছেন।

যদি এর পরও জানতে চাওয়া হয়ঃ মান্যবরেষু, আপনি এবং আপনারাই তো বলেন, ইন্দিরা গোষ্ঠীও সেই একই জমিদার জোতদার বড় পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি; সেই প্রতিনিধিদের সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আপনাদের এত দিল্লি ছোটাছুটি কেন, এত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিভৃত আলোচনা কেন—তা হলে তো আর রক্ষা নেই। তা হলে সেটা একেবারে বুর্জোয়া চক্রান্তের জঘন্যতম প্রকাশ হয়ে যাবে।

একটা কথা হলফ করে বলতে পারি, ফ্রন্টের শরিকরা যদি একে অপরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করেন তাহলে কোনও বুর্জোয়া সংবাদপত্র শত চক্রান্ত করেও ফ্রন্টের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

জ্যোতিবাবু অভিযোগ করেছেন, খবরের কাগজগুলিই ঝগড়া বাধাচ্ছে। এ অভিযোগ কিছুদিন আগে অজয়বাবুও করতেন। রিপোর্টাররা কোনও অস্বস্তিকর প্রশ্ন করলেই তিনি বলতেনঃ ঝগড়া বাধাতে চান বুঝি।

সংবাদপত্র বা সাংবাদিকদের সম্পর্কে এ অভিযোগটা যে নিজেদের পক্ষেই অপমানকর সেটা নেতারা একবার ভেবে দেখেছেন কি? সামান্য রিপোর্টারদের উস্কানিতে (যদি ধরেই নেওয়া হয় তাঁরা উস্কানি দেন) উত্তেজিত হয়ে যদি কোনও প্রবীণ নেতা অবাঞ্ছিত কথা বলেন, তা হলে কি তিনি নেতা হওয়ার যোগ্য, না তাঁকে নেতা বলা চলে?

অজয়বাবু এবার প্রথম প্রায় ছমাস ফ্রন্ট সরকার এবং কোনও ফ্রন্ট শরিক সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করতে চান নি। তখন কোনও রিপোর্টারের কোনও সংবাদপত্রের সাধ্য হয়েছে তাঁকে দিয়ে কিছু বলাবার? বাংলা কংগ্রেস একটা অ্যাটমিক প্রস্তাব নিলেন। সংবাদপত্রগুলি উস্কানি দিয়ে সেই প্রস্তাব লিখিয়েছিল? মুখ্যমন্ত্রী বললেন: অসভ্য ও বর্বর সরকার। রিপোর্টাররা উস্কে বলিয়ে নিয়েছিলেন কথাগুলি? প্রমোদবাবু বললেন: অজয়বাবু যুক্তফ্রণ্টের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের নেতা নন। আমরা তাঁকে ফ্রণ্টের নেতা বলে মানি না। আজ প্রায় এগার বছর ধরে সি পি এম-এর মত এত বড় পার্টি যাকে দলের কর্ণধার করে রেখেছেন, তিনি কি শুধু একজন সাংবাদিকের প্রশ্নে উত্তেজিত হয়ে মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলেছেন?

আসল কথা; নেতারা যদি কিছু না বলতে চান, তাহলে কোনও সাংবাদিক তাঁদের দিয়ে কিছু বলাতে পারেন না। যখন তাঁরা কিছু বলতে চান, তখনই সেটা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায়। তাই নেতারা নিজেরা না ঝগড়া করতে চাইলে কেউ তাঁদের দিয়ে ঝগড়া করাতে পারেন না!

ঠিক তেমনি, নেতারা ও দলগুলি নিজেরা নিজেদের ঝগড়া মেটাতে না চাইলে বাইরের কেউ তা মেটাতে পারেন না।

জ্যোতিবাবু সেদিন কথা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের বলছিলেন, ঝগড়া মেটাতে একটু সাহায্য করুন না। যদি ফ্রণ্টের নেতারা নিজেরা না ঝগড়া মেটাতে মনেপ্রাণে উদ্যোগী হন তাহলে ঐ আবেদনের কোনও সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। আর যদি সত্যিই তাঁরা ঝগড়া মেটাতে চান, এক হয়ে কাজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহলে পৃথিবীর সব সংবাদপত্র একত্রে মিলেও তাঁদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারবে না।

সংবাদপত্র তো ক্ষুদ্র বস্তু, এত মানুষের এত সদিচ্ছা, এত ভালবাসা, এত সমর্থন যাঁদের এক রাখতে পারল না, সামান্য সংবাদ-পত্র তাঁদের ঝগড়া মেটাতে সাহায্য করতে পারবে।

তবু জ্যোতিবাবু যখন জানিয়েছেন অনুরোধটা, তখন তাঁর কাছে আমিও একটা আবেদন রাখছি ঃ আপনি এবং অজয়বাবু একযোগে কথা দিন সাত দিন আপনাদের মারামারি ঝগড়া-ঝাটির কোনও খবর কলকাতার কোনও কাগজে না বের হলে যুক্তফ্রন্ট আবার যুক্ত হয়ে বাংলার হিতার্থে কাজ শুরু করতে পারবে, আমরা কলকাতার রিপোর্টাররা পশ্চিমবঙ্গের চার কোটি মানুষের স্বার্থে প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের পরিচালককে অনুরোধ জানাবো এই শর্ত মেনে চলতে

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সে অনুরোধ রক্ষা করবেন

৩০শে জানুয়ারী ৭০।

ভঙ্গ বঙ্গে যৌথ রঙ্গ

এত ভঙ্গ যুক্তফ্রণ্ট কী করে এখনও যৌথ রঙ্গ চালিয়ে যেতে পারছেন বঙ্গবাসীর কাছে সেটা এক বিরাট বিস্ময়।

যেখানে যাই একই প্রশ্ন : হ্যাঁ মশাই, এরা এখনও একসঙ্গে আছে কি করে বলুন তো! পথে-ঘাটে আলোচনায়ও একই কথা : এত ঝগড়া, এত মারামারি, তবু যুক্তফ্রণ্ট সরকার কিন্তু ভাঙছে না।

সেদিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দা দিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে দু'জন মন্ত্রী হেঁটে যাচ্ছিলেন। দু'জন দুপক্ষের। পুলিশ-হাবিলদাররা দাঁড়িয়ে উঠে খটাক করে স্যালুট দিলেন। মন্ত্রীরা একটু এগিয়ে যেতে হাবিলদাররা আবার টুলে বসলেন। তারপরই শুনলাম একজন বিহারী হাবিলদার তাঁর এক বাঙালী সহকর্মীকে বলছেন : কিয়া আজব চীজ, লড়াই ভি করতা, কাবিনেট মে চাহা মিঠেই ভি খাতা, আউর আভি দেখতা হাসতা ভি!

কথাটা শুনে আমিও হাসলাম।

হ্যাঁ 'আজব চিজ্ই' বটে! এই আজব চিজ্ বেশ কিছুদিন ধরে চলছে এবং সম্ভবত আরও কয়েকদিন চলবে। চলতি মাসের শেষ দিকে আর একটা বড় সংকট আসতে পারে। এবং সেই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলে এই অবস্থায়ই বা এর চেয়ে আরও খারাপ অবস্থায় যুক্তফ্রণ্টের যৌথ রঙ্গ আরও কয়েকদিন চলবে।

সেই মূল প্রশ্নে ফিরে আসা যাক, যুক্তফ্রণ্ট মরেও কীভাবে বেঁচে আছে?

এর অনেক কারণ। প্রথম কারণ কেউই গদী ছাড়তে রাজী নন। দ্বিতীয় কারণ, কেউই এমন কিছু করতে অনিচ্ছুক যাতে

তাঁর গদী সংকটাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। তৃতীয় কারণ, কেউই একা কিছু করার মত অবস্থায় নেই। চতুর্থ কারণ, সকলেরই এখনও জনগণ সম্পর্কে মনে মনে বেশ ভয় আছে।

এখনই গদী ছাড়তে যে যুক্তফ্রন্টের চোদ্দ দলের কোনও দলই রাজী নন, সেটা আজ রাজ্যের বাচ্চা ছেলেরাও বেশ ভাল করেই বুঝে গিয়েছে। সি পি এম তো বলেই দিয়েছেন, বাংলা কংগ্রেস-সি পি আই যাই করুন, আমরা নিজে থেকে সরকার ছেড়ে যাচ্ছি না। বাংলা কংগ্রেসের তিনজন মন্ত্রী যে পদত্যাগ করেছেন সেটাও সরকারী ক্ষমতা ত্যাগের জন্য নয়। তা চাইলে অজয়বাবু সমেত বাংলা কংগ্রেসের সবাই মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলে যেতে পারেন। তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে অন্য কেউ তাঁদের ধরে রাখতে পারেন না।

আমরা দলগত স্বার্থে সরকারে আছি এবং থাকতে চাইছি —একথাটা স্বীকার করতে অবশ্য কেউই রাজী নন। বৃহত্তম শরিক সি পি এম-এর শ্রী জ্যোতি বসু থেকে আরম্ভ করে সর্ব কনিষ্ঠ দল মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের শ্রী রাম চ্যাটার্জী পর্যন্ত সকলেই এ ব্যাপারে জনগণের দোহাই দেন। সকলেই বলেন, জনগণের স্বার্থেই আমরা সরকারে আছি। জনগণের নামে অবশ্য যা ইচ্ছে চালানো যায়। কারণ, নির্ভেজাল জনগণের হয়ে প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

নিজে থেকে গদী ছাড়তে তো কেউ রাজী ননই, গদী চলে যেতে পারে এমন কোনও ঝুঁকিও কেউই নিতে অনিচ্ছুক। সি পি এম কেরল দেখে বুঝে গিয়েছেন, ঝুঁকি নেওয়া কত বড় বোকামি হতে পারে। তাই তাঁরা প্রকাশ্যে গরম বলেন, আবার নেপথ্যে নরম আচরণও করেন। তাই প্রমোদবাবু দু পা এগোন তো জ্যোতিবাবু দেড় পা পিছোন। তাই ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সিকে 'গুড হিউমারে' রাখার জন্য দলের নেতৃবৃন্দের চেষ্টার অন্ত নেই।

আবার বাংলা কংগ্রেসও ঝুঁকি নিতে রাজী নন বলই অনেক হুংকার দিয়েও, সরকারকে 'অসভ্য' 'বর্বর' বলেও 'আর পারছি না পারব না'-র কাতর স্বীকারোক্তির পরও তাঁরা এই সরকারেই আছেন। অজয়বাবু একা পদত্যাগ করেই এ মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই বাংলা কংগ্রেস তা করছে না। সি পি এম ছাড়াও সরকার চলবেই এ বিষয়ে যেদিন বাংলা কংগ্রেস নেতারা স্থির নিশ্চিত হবেন তারপর একদিনও তাঁরা আর জ্যোতিবাবুদের সঙ্গে চলবেন না। অথবা, বাংলা কংগ্রেস যদি পরিষ্কার বোঝেন যে অনিচ্ছুক সি পি আই বা ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বাধ্য হবেই তাহলেও তাঁরা জ্যোতি বাবু সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন। তার আগে তাঁরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজী নন—কারণ ভয় আছে যদি গদী চলে যায়।

একা কারও কিছু করারও শক্তি নেই। তাই অনেককে সঙ্গে নিতে হবেই। বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সি পি এম-এর পক্ষে বিকল্প সরকার করা সম্ভব নয়। কারণ ওয়ার্কার্স পার্টি এবং এম এল এ-হীন কুমারপন্থী আর সি পি আই ছাড়া গোটা বিধানসভায় আর কেউ তাতে রাজী নন। শ্রীসুকুমার রায়ের টেপ রেকর্ড করা গোপন কথোপকথন থেকে বোঝা যায়, তেমন একটা ব্যর্থ চেষ্টা একবার হয়েও ছিল। কিন্তু সি পি এম নেতারা পরিষ্কার বুঝে গিয়েছেন, হঠাৎ লটারি পাওয়া গোছের ঘটনা ছাড়া তাঁদের নেতৃত্বে এখনই এখানে সরকার হওয়া সম্ভব নয়।

বাংলা কংগ্রেসও একা কিছু করতে পারেন না। সি পি এম ছাড়া ফ্রন্টের আর সকলে যদি একজোট হন তাহলেও বিকল্প সরকার করা সম্ভব নয়। কারণ একা সি পি এমই (তিনজন নির্দল নিয়ে) ৮৩। তিন কংগ্রেস মিলে ৫৬। অর্থাৎ ২৮০-র মধ্যে কংগ্রেস এবং সি পি এমই ১৩৯। আরও দু'একজন নির্দল

নিশ্চয়ই সি পি এম-এর সঙ্গে থাকবেন। বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, পি এস পি (ফ্রন্ট পন্থী), গোর্খা লীগ এবং এস ইউ সি যদি সি পি এম ছাড়া সরকার চালাতে রাজী হন তাহলেও তাঁদের কংগ্রেসের (অন্তত ইন্দিরা গান্ধীর) সমর্থন প্রয়োজন।

নানা মুনি হলে নানা মত হবেই। বাংলা কংগ্রেস যখন মনে করছেন সি পি এম-কে এখনই সরকার থেকে বিদায় করে দেওয়া উচিত, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিরা তখন মনে করছেন 'গুণ্ডা পার্টিকে শহীদ হতে দেওয়া হবে না'। তাই বাংলা কংগ্রেস যখন 'শো ডাউন, শো ডাউন' বলে হাত পা ছুঁড়ছেন, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক তখন 'শ্লো ডাউন, শ্লো ডাউন' বলে মাদ্রাজীদের মত ঘাড় নাড়ছেন।

এঁদের সবাই আবার সবাইকে পুরোপুরি বিশ্বাসও করেন না। সি পি এম প্রায় সকলেরই শত্রু। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতিরাও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু নন। সি পি আই ফরওয়ার্ড ব্লকের সদা-সর্বদা ভয়, এই বুঝি বাংলা কংগ্রেস তাঁদের ঘাড়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দিল। ফরওয়ার্ড ব্লকের আবার সন্দেহ এই বুঝি সি পি আই অজয়বাবু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গোপনে কোনও চুক্তি করে ফেলল।

জনগণ পাছে ভুল বোঝে, এ ভয়ও সকলেরই পুরোদস্তুর আছে। আছে। জনগণ কী চাইছেন, কী বুঝছেন এ নিয়েও আবার সকলেই একমত নন। দলে দলে এ নিয়ে মত পার্থক্য আছে। দলগুলির ভেতরও সকলে একমত নন। জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু এবং হরেকৃষ্ণবাবু তিনজন তিন ভাবে জনগণকে দেখেন। অজয় বাবু এবং সুশীলবাবুও জনগণের বিশ্লেষণে একমত নন। সোমনাথ বাবু এবং রনেনবাবু জনগণকে দু'ভাবে দেখেন। এমনি ভাবে ভক্তিবাবুতে শম্ভুবাবুতে, ননীবাবুতে যতীনবাবুতে এবং প্রায় সব বাবুতে বাবুতে জনগণ নিয়ে মতভেদ আছে।

সুতরাং জনগণ কী করলে চটবেন এবং কী দেখলে খুশী হবেন এ নিয়ে যুক্তিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলছেন, জনগণ চায় এখনই এ সরকারের অবসান। কেউ বলছেন, জনগণের ইচ্ছা এখনই সি পি এম-কে বাদ দিয়ে সরকার হোক। কেউ বা বলছেন সি পি এম-কে এখনই তাড়ালে জনগণের চোখে ওরা শহীদ হয়ে যাবে। জনগণ সঠিক কী চায় সেটা মাপার কোনও যন্ত্র থাকলে অবশ্য এর একটা সমাধান হতে পারত।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর দলেরও এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা আছে। কারণ তাঁরা 'ব্যালেন্সিং পজিশনে'। তাঁদের উপর এ রাজ্যের রাজনীতি বেশ কিছুটা নির্ভর করে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীযুক্ত চ্যবন ঘর-পোড়া গরু। সুতরাং তাঁরা সিঁদুরে মেঘে ভয় পান। সিঁদুরে মেঘ যে আগুন নয়, সে সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হওয়ার আগে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আর কিছুই করতে রাজী নন।

জ্যোতিবাবু বিশেষ বিলাতি পরিচয়ের সুবাদে যতই শ্রীমতী গান্ধীকে বোঝাবার চেষ্টা করুন আসলে প্রধানমন্ত্রী অজয়বাবুকে সাহায্য করতেই বিশেষ আগ্রহী। কিন্তু সেজন্য তিনি নিজে বিপাকে পড়তে রাজী নন। তাছাড়া জব্দ হওয়ার বদলে সি পি এম যাতে জবরদস্ত হয়ে না উঠতে পারে সেটাও শ্রীমতী গান্ধী দেখতে চান। তাই, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেনঃ কলকাতায় সব ব্যবস্থা পাকা না হলে হুট্ করে কিছু করতে যাবেন না।

কলকাতায় সব পাকা করাও সহজে সম্ভব হয়ে উঠছে না। কারণ আগেই বলেছি, এখানে নানা মুনির একমত হওয়া প্রয়োজন। এবং অনেক মুনিকে একমত করা খুব সহজ কাজ নয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।

বোমা, ছিনতাই, গালাগালি এখন স্বাভাবিক ঘটনা

বছর কয়েক আগে আমি একবার ভিয়েতনামে গিয়েছিলাম। ভিয়েতনাম যাচ্ছি শুনেই সবাই সাবধান করেছিলেন। সকলেরই এক কথা—ভিয়েতনামের কোনও এলাকা নিরাপদ নয়, যে কোনও সময় যে কোনও এলাকায় টাইম বোমা তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, যে কোনও মুহূর্তে তুমি মেশিনগানের গোলাগুলির মধ্যে পড়ে যেতে পার।

সায়গন পৌঁছে সন্ধ্যায় হোটেলে বসে আছি। অন্ধকার হতেই কামানের গর্জন শুরু হল। মাইল দেড়-দুইয়ের মধ্যেই কোথাও লড়াই চলছে। হোটেলের বিরাট বাড়িটাকে কাঁপিয়ে তুলছে! আমি বসে বসে ভাবছি, হ্যাঁ এই সেই সায়গন শহর। এমন সময় একজন বাঙালী যুবক এসে আমার ঘরে হাজির। হোটেলে পৌঁছেই আলাপ হয়েছিল। এই হোটেলেই থাকেন। ইণ্টার-ন্যাশনাল কনট্রোল কমিশনে কাজ করেন। বললেন, চলুন, বেড়িয়ে আসি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এই গোলাগুলির মধ্যে বেড়াতে যাবেন! হেসে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ও কিছু নয়। শহরের অন্যপ্রান্তে লড়াই চলছে। এমন জিনিস এখানে রোজই হয়। আবার পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাও চলে। সায়গন এখন এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

বের হলাম। আলো ঝলমল সায়গন শহর। আমাদের পার্ক স্ট্রীটকে হার মানায় এদের টু ডো স্ট্রীট। সিনেমাগুলি 'হাউস ফুল'। রাস্তায় সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহিলারাও। ভিয়েতনামীরা ফুল খুব ভালবাসে। মেয়ে পুরুষ ভিড় করে ফুল কিনছে।

আবার মুহুর্মুহু কামান এবং মেশিনগানের আওয়াজ আসছে। সেদিকে কারও যেন তেমন ভ্রূক্ষেপ নেই। বুঝলাম, সায়গনে ওটাই স্বাভাবিক পরিস্থিতি। সায়গনের মানুষ এতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

সেদিন আমার এক সাংবাদিক বন্ধু এসেছিলেন দিল্লী থেকে। সন্ধ্যায় হোটেলে দেখা করিতে গিয়েছি। আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন: শুনলাম আজ নাকি ইউনিভার্সিটিতে গুলিগোলা চলেছে। আমি বললাম: হ্যাঁ। বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন: তাহলে এখন শহরের অবস্থা? আমি বললাম: নরম্যাল। স্বাভাবিক। এমন কি কলেজ স্ট্রীট এলাকায়ও জীবনযাত্রা অব্যাহত। বন্ধুবর বললেন: কাণ্ট বি। আমি বললাম: কাম অন।

ইউনিভার্সিটি এলাকাটা ঘুরিয়ে দেখালাম। একটু অন্ধকার ভাব। একটু থমথমে। কিন্তু ব্যস, ওই পর্য্যন্তই। হ্যারিসন রোড, কলেজ স্ট্রীটের মোড় তেমনই জমজমাট। বন্ধুবর সব দেখেশুনে বললেন: স্ট্রেনজ্!

আমি বললাম, স্ট্রেনজ্ নয়, নরম্যাল। এটা এখন স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। তুমি এখন কলকাতার কাগজ খুললে দেখবে, এক-আধটা খুনোখুনিকে তেমন প্রাধান্য দেয় না। বহু ক্ষেত্রে শরিকী সংঘর্ষে দশ-বারোজন আহত হওয়ার খবর ভেতরের পাতায় যায়। সাধারণ বোমাবাজীর খবর নাইট রিপোর্টাররা এখন আমল দেয় না। কারণ ওতো প্রতিদিন ডজন ডজন হচ্ছে। এসবই এখন নরম্যাল। কলকাতায় এখন আমরা এসব নিয়ে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। এইটাই এখন আমাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা। তোমরা একে ভয় পাও। আমরাও পছন্দ করি না। কিন্তু এর মধ্যেই আমাদের বাস করতে হবে। তাই আমরা এর মধ্যেও সিনেমা যাই, বেড়াতে বের হই, উৎসবে-অনুষ্ঠানে যোগ দিই।

দিন দুই-তিন আগের ঘটনা। বহু সাংবাদিক একজন মন্ত্রীর ঘরে বসে। বিধান সভায়। একজন সাংবাদিক মন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করলেন: কাল রাত্রে যুক্তফ্রন্ট মিটিং সেরে ফিরছিলাম। বড়বাজার স্ট্রীট ধরে পুবে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ কয়েকজন লোক পথরোধ করে ছোরা বের করল। জিজ্ঞেস করল, কোন পার্টির লোক? বললাম কোনও পার্টির নই—রিপোর্টার। ওরা বললে, ওসব মানি না, পকেটে কী আছে বের কর। সামনে পেছনে ছোরা ঠেকানো। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে সব বের করে দিলাম। পকেটে ছিল ষাট টাকা।

মন্ত্রীবর ধমকে উঠলেন: তুমি আচ্ছা লোক তো? যুক্তফ্রন্টের আমলে অত রাত্রে পকেটে ষাট টাকা নিয়ে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলে কেন! জান না এখন কলকাতার কতকগুলি এরিয়ায় ছিনতাই স্বাভাবিক ব্যাপার।

বলে রাখা ভাল, এই মন্ত্রী বাংলা কংগ্রেসের কেউ নন। ইনি যে দলের তাঁদের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খুব ভাল সম্পর্ক। অনুমতি না নিয়ে নামটা প্রকাশ করা অন্যায় বলেই ভদ্রলোকের নাম করলাম না।

পাঁচ-ছ বছর আগে একবার বিধানসভার অধিবেশন ভাঙার পর আমরা কয়েকজন সাংবাদিক আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শ্রী জগন্নাথ কোলের সঙ্গে শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলেছেন। দুজনেই তখন মন্ত্রী। শ্রীকোলে পরিষদীয় মন্ত্রী; শ্রীমতী ব্যানর্জী শিক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী। শুনলাম, শ্রীমতী ব্যানার্জী জগন্নাথবাবুকে বলছেন: 'আপনি আমাকে বলার পুরো সময় দিলেন না কেন?' 'আপনি আমাকে গ্যাগ করেছেন কেন?' আরও শুনলাম, উত্তেজিত জগন্নাথবাবু বলে চলেছেন: 'মায়া, যা তা বল না। ভেবে চিন্তে কথা বল।'

আমাদের রিপোর্টার মহলে একেবারে হৈ হৈ পড়ে গেল। মন্ত্রীতে

মন্ত্রীতে প্রকাণ্ড ঝগড়া! খোঁজ খোঁজ! সবাই খুঁজতে নামলাম ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়।

কিন্তু সেই সেদিনই যখন শ্রী সত্যপ্রিয় রায় ও শ্রী চারুমিহির সরকারের বিধানসভায় প্রায় হাতাহাতি হয়ে গেল, তখন সেই আমরা কলকাতার রিপোর্টাররা চুপচাপ বসে রইলাম। কোনও খোঁজও নিলাম না কেউই।

কারণ? কারণ এটাই এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। অজয়বাবুর জ্যোতিবাবুর অর্ডার নাকচ করে দেবেন, জ্যোতিবাবু আবার অজয়বাবুর সেই নাকচ করা অর্ডারই নাকচ করবেন, ভক্তিবাবু জ্যোতিবাবুকে চিঠি দেবেন, 'আপনি কেন আমার দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকারী মামলা তুলে দিলেন?' জ্যোতিবাবু সেই চিঠির 'বেশ করেছি' গোছের জবাব দেবেন—এইগুলিই এখন স্বাভাবিক ব্যাপার। এইটাই আজ স্বাভাবিক অবস্থা।

তাই আজ যদি মন্ত্রীরা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বলেন, একে অপরকে গালিগালাজ করেন, তাহলে সেটার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে না সেগুলিকে আর তেমন আকর্ষণীয় খবর বলেই মনে হয় না।

বরং আজ যদি হঠাৎ শুনি জ্যোতিবাবু অজয়বাবুর প্রশংসা করছেন বা সি পি এম-এর কোনও নেতা বাংলা কংগ্রেসের গুণগান করছেন তাহলেই সেটা বড় খবর হবে—তাহলেই সেটা অস্বাভাবিক ঘটনা হবে। আজ যুক্তফ্রন্টের স্বাভাবিক অবস্থাই হল শরিকী সংঘর্ষ, পারস্পরিক, গালিগালাজ, মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে ঝগড়া এবং নেতায় নেতায় খেউড়। আমরা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। আমাদের কাছে আজ এই সবই যুক্তফ্রন্ট।

দিন তিন-চার আগে বেলেঘাটার নারকেলডাঙ্গার এক ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা খুব রেগেমেগে অভিযোগ করলেন: হ্যাঁ, মশাই, পুলিশের কাণ্ডটা দেখেছেন, শুধু আমাদের লোকের উপর অত্যাচার করছে।

কাল একখানা চিঠি পেয়েছি আসানসোল থেকে। এক ভদ্রলোক লিখেছেন: সি পি এম বিহার এবং অন্য এলাকা থেকে গুণ্ডা নিয়ে এসে কয়লাখনি শ্রমিকদের উপর জোরজুলুম করছে। পুলিশ কিছুই বলছে না। ভদ্রলোক সম্ভবত সি পি আই সমর্থক। আজ সকালে বাংলা কংগ্রেসের এক ভদ্রলোক টেলিফোন করেছেন চব্বিশ পরগণা থেকে: সি পি এম-এর লোকেরা লুঠতরাজ করছে, পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

আমি তিনজনকে একই জবাব দিয়েছি: এর উল্টো কোনও কথা যদি আপনাদের কাছে শুনতাম তাহলেই আশ্চর্য হতাম। সি পি এম-এর লোকেরা হামলা করছে এবং পুলিশ কিছুই বলছে না—এ অভিযোগ তো প্রতিদিন আমাদের দপ্তরে আসছে। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। এইটাই আজ স্বাভাবিক। এ অভিযোগ শুনতে শুনতে আমরা অভ্যস্ত।

দু-তিন দিন আগে কলকাতার একটা মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন ছাত্র এসেছিলেন। বললেন, তাঁদের কলেজের রি-ইউনিয়ন বন্ধ করে আদালত ইনজাংশন দিয়েছে। তবু কর্তৃপক্ষ আর এস পি সমর্থকদের রি-ইউনিয়ন করতে দিচ্ছেন। আরও তিন-চারদিন আগে আলিপুর নির্বাচনী দপ্তর থেকে কয়েকজন বরখাস্ত সরকারী কর্মী এসেছিলেন। অভিযোগ, তাঁদের কর্মচ্যুত করে সেখানে মন্ত্রীর দলের লোক নেওয়া হচ্ছে। শুনলাম সব কথা। অনুরোধ, যেন এই সব দলবাজীর কথা কাগজে একটু লেখা হয়?

কিন্তু লিখব কি, এইগুলি কি আজ আর নতুন কথা। দলবাজীর এমন অভিযোগ তো আজ প্রতিনিয়ত শোনা যায়। বরং কোনও মন্ত্রী দলবাজী করছেন না—যদি কেউ এই সংবাদ দিতে পারেন তাহলেই আজ তা খবর হবে

২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭০।

নীতিহীন রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট আর কোনও ভাল কাজ না করুক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আসল চেহারা কিঞ্চিত চিনিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শত যুক্তি দিয়েও যে সব জিনিস বোঝানো যেত না এবারের কতকগুলি ঘটনা মানুষের সামনে তা খোলাখুলি তুলে ধরেছে।

অবশ্য এর পরও যে অন্ধ ভক্তরা সব তথ্যকে নস্যাৎ করে দেবেন না, তেমন কোনও ভরসা নেই। তবে সাধারণ মানুষ অর্থাৎ ঝাণ্ডা যাঁদের দৃষ্টিকে এখনও একমুখী করে তোলেনি তাঁরা নিশ্চয়ই এই সব ঘটনা থেকে বেশ কিছুটা শিক্ষালাভ করবেন।

প্রথমেই আসা যাক, কেন্দ্রীয় সরকার এবং নবকংগ্রেস নেতৃত্ব প্রসঙ্গে। কেন্দ্রীয় সরকার বিহারে শ্রীদারোগা রাইয়ের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে শ্রীজ্যোতি বসুর জন্য যে সে নীতি মানতে মোটেই রাজী নন, এবার তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। শ্রীজ্যোতি বসুকে প্রকাশ্যে তাঁর নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা দেখাতে বলা হয়েছে।

শ্রীদারোগা রাইয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তা বলা হয়নি। শ্রীঅচ্যুৎ মেনন এবং শ্রীচরণ সিং-এর ক্ষেত্রেও কেন্দ্র বেশ দুর্বলতা দেখিয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে যাচ্ছে দেখেই নবকংগ্রেস নেতৃত্বের সংবিধান জ্ঞান এবং গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছে।

শ্রীদারোগা রাই কি সরকার গঠনের আগে প্রকাশ্যে দেখিয়েছিলেন কীভাবে তিনি বিধান সভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠের সমর্থন দাবি করেছেন? তিনি কি সমর্থক সদস্যদের নামের তালিকা জনসমক্ষে

হাজির করেছিলেন ? কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন আইন বিশারদদের মতামত উদ্ধৃত করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, আগেভাগে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না দেখাতে পারলে কাউকেই সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিহারে নিজের দলের লোককে গদিতে বসাবার সময় এই যুক্তি কোথায় ছিল ?

মোটামুটিভাবে আমিও এ যুক্তির সঙ্গে একমত যে, প্রকাশ্যে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না দেখাতে পারলে গোপন সমর্থনের ভরসায় কাউকেই সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত নয়। সংবিধানের আক্ষরিক অনুবাদ করলে অবশ্য এতে আইনগত কোনও বাধা নেই। রাজ্যপাল আইনত শ্রীজ্যোতি বসু কেন ওয়াকার্স পার্টির শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্যকেও মুখ্যমন্ত্রী করে দিতে পারেন এবং এখনকার মত বাজেট পাশের সমস্যা না থাকলে পাঁচ মাস উনত্রিশ দিন বিধান সভা না বসিয়েই তাঁকে রাজত্ব করতে দিতে পারেন।

কিন্তু গণতন্ত্রের রীতিনীতি মানতে গেলে তা সম্ভব নয়। নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠের সমর্থন না দেখাতে পারলে কাউকেই সরকার গঠন করতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে। যেখানে এম এল এ, এম পি কেনা বেচা চলে, যেখানে মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে দলে মহামান্য সদস্যদের টানা যায়, যেখানে প্রশাসন যন্ত্রের লোভ ও ভয় দেখিয়ে সমর্থন আদায় করা সম্ভব, সেখানে সরকারী গদিতে বসার সুযোগ দিয়ে গরিষ্ঠতা প্রমাণের সময় দিলে পাপ বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

সরকার গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্র এখন যে নীতির কথা বলছেন, সে নীতিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার শুধু প্রশ্ন, এই নীতি সর্বত্র সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে না কেন ? শ্রীদারোগা রাইকে যদি গদিতে বসে, গদির সুযোগ নিয়ে সরকারী মণ্ডা-মিঠাই বিলি করে বিধান সভায় গরিষ্ঠতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে শ্রীজ্যোতি বসুকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না কেন ? শুধু

জ্যোতিবাবু সি পি এম এবং দারোগাবাবু নবকংগ্রেস বলেই কী এই হেরফের ?

ভারতের বৃহত্তম দলের কথা গেল, এবার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম দলের প্রসঙ্গে।

সি পি এম নেতারা প্রথমে বলেছিলেন, এই ফ্রন্ট ভেঙ্গে গেলেই আমরা নতুন রায় চাইব। খুবই ভাল কথা। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন ফ্রন্ট ভেঙ্গে গেল, তখন ওঁরা বললেন, আমরা বিকল্প সরকার গঠনের চেষ্টা করব। অনেকের কাছেই সি পি এম-এর নতুন ঘোষণাটি আচমকা এবং বেখাপ্পা মনে হল। সি পি এম নেতারা যুক্তি দিলেনঃ ফ্রন্ট ভাঙ্গেনি। শুধু বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। সুতরাং আমরা ফ্রন্ট ও ফ্রন্ট সরকার অব্যাহত রাখতে চাই। দলের নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন, "আমরা সরকার গঠন করতে চাই। দেখি ফ্রন্টের কোন্ কোন্ দল বাংলা কংগ্রেসের দিকে যায়।" মনে হল, সি পি এম ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলকে 'এক্সপোজ' করতে চান—কে কে বাংলা কংগ্রেসের বন্ধু শুধু সেটা খোলাখুলি তুলে ধরতেই তাঁরা আগ্রহী। মার্কসবাদী নেতারাও বললেন, হ্যাঁ, সেইটাই তাঁদের ইচ্ছা। রাজনীতিতে মারপ্যাঁচের কৌশল হিসাবে না হয় এটাকেও নির্দোষ বলে মেনে নেওয়া গেল।

কিন্তু সি পি এম নেতারা তো এখানেই থামলেন না। গোপনে গোপনে বিভিন্ন দলের এম এল এ এবং দলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেন। যদি শুধু বিভিন্ন শরিক দলকে 'এক্সপোজ' করাই লক্ষ্য হয় তাহলে সরকার গঠনের চেষ্টায় ফ্রন্টের বাইরের লোকদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যেদিন সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি দল রাজ্যপালকে চিঠি দিলেন যে, তাঁরা জ্যোতিবাবুর সরকার গঠন প্রচেষ্টার ঘোরতর বিরোধী সেই

দিনই তো 'এক্সপোজারে'র খেলা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। তারপরও সি পি এম নেতৃত্বে এগোলেন কেন? তারপরও কেন রাজ্যপালকে গিয়ে বললেন, বিভিন্ন দল থেকে এম এল এ-রা বেরিয়ে এসে তাঁদের সমর্থন করবেন এবং ঐসব দলত্যাগী এম এল এ-র সমর্থনে তাঁরা বিধান সভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা দেখাতে পারবেন?

এই 'দলত্যাগী' কথাটা শুনলেই সি পি এম-এর নেতারা চটে ওঠেন। বলেন: কেন দলত্যাগী বলা হবে। আসলে দলগুলি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা বাংলা কংগ্রেসের ফ্রণ্ট বিরোধী চক্রান্ত সমর্থন করতে পারছেন না তারা নেতৃত্বকে অমান্য করে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছেন। এটা দলত্যাগ হবে কেন? এটা আসলে দলে ভাগ হয়ে যাওয়া।

সি পি এম নেতৃত্বের এই বক্তব্যটিও মেনে নিতে তেমন অসুবিধা হত না যদি দেখা যেত সত্যি সত্যিই বিভিন্ন দল থেকে নীতিগত ভাবে মতবিরোধের জন্য প্রকাশ্যে এম এল এ-রা বেরিয়ে এসেছেন এবং বেরিয়ে এসে তারপর সি পি এম-এর সঙ্গে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য আলোচনা শুরু করেছেন। সি পি এম নেতৃত্ব কিন্তু তাও বলছেন না। এখনও পর্যন্ত তাঁরা কোনও দলের তেমন একজন এম এল এ-ও দেখাতে পারেন নি। তাঁরা শুধু বললেন: আগে সরকার গঠন করি, তারপর বিধান সভায় এদের দেখা করিয়ে দেব।

যাঁরা আদর্শগত মতভেদের কথা অমনি মুখে উচ্চারণ করতেও রাজি নন, শুধু সি পি এম-এর সরকার হলেই তা বলতে ইচ্ছুক— তাঁরা কেমন এম এল এ? তাঁদের আদর্শগত মতবিরোধটা বা কেমন? সি পি এম কি সত্যিই এই সব এম এল এ-কে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন? দলত্যাগীরা সি পি এম-এর সঙ্গে হাত মেলালেই কি কুলীন হয়ে যান?

অবশেষে রাজ্যপালের শাসন চালু হল। ২৮০ জনের বিধান

সভায় ২১৮ সদস্য নিয়েও এরা তের মাস একটা সরকার চালাতে পারলেন না।

এ সরকারের মৃত্যু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বিধান সভা এখনও থেকে গেল। তলে তলে নাকি একটা সরকার গঠনের চেষ্টা চলছে।

সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি দল যদি মনে করে থাকেন যে, আপাতত একটু ডুব মেরে থেকে কিছুদিন পরে তাঁরা বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে এবং কংগ্রেসের সমর্থনে বিকল্প সরকার গঠন করে বাজিমাৎ করে দেবেন, তাহলে তাঁরাও ভুল করছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই সরকারকেও ভালভাবে গ্রহণ করা কঠিন।

অধুনালুপ্ত যুক্তফ্রন্টের রাজনীতি বাংলা দেশের সামনে যে সঙ্কট সৃষ্টি করছে তার একমাত্র বিকল্প—অন্তবর্তী নির্বাচন। তবে, এই নির্বাচনও পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক স্থিরতা আনতে পারবে কি না আজই কারুর পক্ষে তা হলপ করে বলা সম্ভব নয়।

২০শে মার্চ, ১৯৭০।

খুনোখুনির এই আত্মঘাতী রাজনীতি

পশ্চিমবঙ্গের খুনোখুনিটা দিন দিনই বেড়ে চলেছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে একটা না একটা খুনের খবর আসে। নানা ধরনের খুন। নকশাল খুন, সি পি এম খুন, জোতদার খুন, পুলিশ খুন, বালক খুন, যুবক খুন, বৃদ্ধ খুন। কোথাও গুপ্ত হত্যা, কোথাও প্রকাশ্য হত্যা। কোথাও অন্ধকারে খুন, কোথাও অসংখ্য মানুষের চোখের ওপর খুন। কোথাও হঠাৎ ছুরি টানা, কোথাও আস্তে আস্তে হাত-পা-গলা কাটা। কোথাও মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্রের চোখের ওপর খুন, কোথাও বাড়ি থেকে ধরে এনে খুন। খুন শুধু খুন। বিরামহীন খুনোখুনির এক বীভৎসতায় পশ্চিমবঙ্গ যেন মেতে উঠেছে।

এত খুনোখুনি হচ্ছে যে তার সঠিক হিসাবও বোধহয় কেউ রাখতে পারছেন না। একজন বড় দরের সরকারী কর্তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: গত ছ'মাসে কত খুন হয়েছে বলতে পারেন? কর্তামশাই একটু ভেবে জবাব দিলেন: সঠিক বলা কঠিন। তবে দেড়'শ; পৌনে দু'শ হবেই। কয়েকজন নামজাদা রাজনৈতিক নেতার কাছেও জানতে চেয়েছিলাম। তাঁরাও সঠিক হিসাব দিতে পারেন নি। কারু অনুমান দু'শ, কারু বা বেশি। সংবাদপত্রেও এখন আর সব সময় খুনোখুনির খবর সঙ্গে সঙ্গে বের হয় না। কারণ, খবরগুলিই এখন আর সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌঁছয় না এবং পৌঁছলেও তা সব সময় বড় করে ছাপা হয় না। এত খুনোখুনি চলছে যে খবর হিসাবে খুনের গুরুত্বও দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। খুনোখুনি জিনিসটাই যেন আজ আমাদের জীবনের স্বাভাবিক নিত্য সঙ্গী।

এ জিনিসটা যে হঠাৎ হয়েছে তা নয়। দু' আড়াই বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গে খুনোখুনির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমে ক্রমে তা বেড়েছে। প্রথম প্রথম ছিল শরিকী সংঘর্ষ ও জমি দখল লড়াই এবং তাতে খুনোখুনি। তারপর এল গ্রামাঞ্চলে নকশালপন্থীদের কর্মসূচীঃ খতম অভিযান। তারপর আরম্ভ হল শহর এলাকায় খুনোখুনির প্রতিযোগিতা। এক প্রগতিশীল সাংবাদিক সহকর্মী সেদিন বলেছিলেন, রাজনীতির নামে এই খুনোখুনি আমদানীটা যুক্তফ্রণ্টের কৃতিত্ব। যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রথম থেকে সতর্ক হলে এবং সময় মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে পশ্চিমবঙ্গে খুনোখুনি এত ব্যাপক হয়ে উঠতে পারত না। আমি এই সহকর্মীর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যে শুধু যুক্তফ্রণ্ট আমলেই সময়মত নেওয়া হয়নি তা নয়। রাষ্ট্রপতির শাসনেও যখন যা অত্যাবশ্যক তখন তা করা হয় নি। প্রথমে গেল দিল্লী ও কলকাতার কর্তাদের আত্ম-সন্তুষ্টির পর্ব—গোড়ার কয়েকদিনের শান্ত আবহাওয়া দেখেই তাঁরা ধরে নিলেন যুক্তফ্রণ্টের গমন এবং তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। তারপর যখন তাঁরা বুঝলেন, ব্যাপারটি ঠিক তা নয়, শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি; ততদিনে আর এক পর্ব শুরু হয়ে গেছে—সে পর্বের শিরোনামা 'ধাওয়ান বনাম প্রশাসন'। কে কর্তা, কে হুকুম দেবেন, কে নীতি নির্ধারণ করবেন—এই ঝগড়াটা চলল কয়েক সপ্তাহ।

এখন আর একটা পর্ব শুরু হয়েছে যাকে বলা যায় 'দিল্লী বনাম কলকাতা'। কলকাতার কর্তারা যেভাবে এই খুনোখুনির মোকাবিলা করতে চান, যে সব আইন-কানুনের মাধ্যমে এই হাঙ্গামা দমন করতে পারবেন মনে করেন দিল্লী তাতে কিছুতেই রাজী নন। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ যদি গুলি করে কাউকে খুন করে দিল্লীর তাতে তেমন আপত্তি নেই, কলকাতার কর্তারা যদি ইংরেজ আমলের কুখ্যাত আইন আবার চালু করেন তাতেও দিল্লী সম্মত, কিন্তু আটক

আইনে সম্মতি দিতে তাঁরা কিছুতেই রাজী নন। এই অবস্থায় কলকাতার কর্তারা ক্ষিপ্ত। সেদিন রাজভবনের গোপন বৈঠকে তাঁদের দু'একজন সাহস করে পন্থ সাহেবকে বলছেন: আপনারা আজ পি ডি এ্যাক্ট দিচ্ছেন না, কিন্তু একদিন দিতে বাধ্য হবেনই। তবে সেদিন তাতে কোনই কাজ হবে না। তখন এখানে মিলিটারিও নামাতে হবে। সময় মত পি ডি এ্যাক্ট দিলে হয়ত সে প্রয়োজন হত না!

পি ডি এ্যাক্টে কাজ হত কি হত না; পুলিশ কিছু করতে পারতেন কি পারতেন না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। আমি শুধু বর্তমান পরিস্থিতির কথাটা বলছি। পরিস্থিতিটা এখন এই যে কলকাতার কর্তারা বলেছেন আটক আইন ছাড়া সম্ভব নয়, আর দিল্লী জানাচ্ছেন, আটক আইন কিছুতেই দেওয়া যাবে না। দিল্লী চুল ভেজাতে রাজী নন। চুল না ভিজিয়েই তাঁরা কার্যোদ্ধার করতে চান। প্রতিনিয়ত দিল্লী থেকে কলকাতায় চাপ আসছে: হচ্ছে না কেন কিছু? থামছে না কেন হাঙ্গামা। ফলে রাইটার্স বিল্ডিংস আর লালবাজারের ক্রোধ বিকৃতভাবে ফুটে বের হচ্ছে। খুনোখুনি দমনের নামে খুনোখুনি বাড়ছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বামপন্থী নেতারা যা করছেন তা আরও বিচিত্র। তাঁরা শুধু পুলিশকে গালিগালাজ দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন। সেই সাবেকি প্রথা—প্রশাসনকে গালিগালাজ দাও, সব দোষ তার ঘাড়ে চাপাও, তার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলো।

মানলাম পুলিশ জুলুম করছে। পুলিশ তুলসীপত্র একথা বোধহয় আই জি-ও বলতে পারবেন না। কিন্তু একে একে সব বামপন্থী নেতাকে জিজ্ঞেস করতে পারি; আপনারা কি করছেন? খুনোখুনি থামাবার জন্য কোন দল কতটুকু সক্রিয় হয়েছেন? বলেন

তো আপনারা, জনমত গঠন করতে হবে। জানাবেন, কী কী ভাবে জনমত গঠন করেছেন? কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যে?

বরং বলব, আপনারাও খুনোখুনি বাড়াচ্ছেন। কারণ, 'খুনকা বদলা খুন' এই আওয়াজ আপনারাও দলের কর্মীদের মধ্যে ছড়াচ্ছেন। আপনারা কি বোঝেন না, এভাবে খুনোখুনি থামবে না; থামে না? বরং বাড়ছে এবং বাড়বে?

পুলিশ লকআপে একটি হতভাগ্য ছেলেকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জঘন্যতম অপরাধ। মানুষ মাত্রেই এর জন্য চরমতম শাস্তি দাবি করবেন। বামপন্থীরাও তাই করেছেন এবং বলব ঠিকই করেছেন। কিন্তু জানতে পারি কি, ঠিক ঐ সময়েই শিবপুরে তাঁর নিজ বাড়িতেই যে নকশালপন্থী যুবককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তার প্রতিবাদ কজন বামপন্থী নেতা করেছেন? কেন সেটা হত্যা নয়? তার জীবন জীবন নয়? জীবন মাইতি খুন হলেন। তাঁর নিজের দল সি পি এম ছাড়া আর কটা রাজনৈতিক দল এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছেন? দিন দু দিন আগে ব্যারাকপুর অঞ্চলে নকশালপন্থী দুটি ছেলেকে রিক্সা করে তুলে নিয়ে গিয়ে জঘন্যতমভাবে খুন করা হল। কোনও রাজনৈতিক দল এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন? কজন বামপন্থী নেতাই বা পুলিশ হত্যার নিন্দা করেছেন? সামান্য সার্জেণ্ট—এরা কি পুলিশ বলেই মানুষ নন? এঁদের কি মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র নেই?

আট পার্টি, ছ' পার্টি সবাই বলছেন পুলিশ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে অত্যাচার করছে। সন্দেহ নেই একের পর এক পুলিশ খুন হওয়ায় রাজ্যের পুলিশবাহিনী আজ ভীত, শঙ্কিত এবং ক্ষিপ্ত। সাধারণ মানুষ যখন খুন হন, তখন কিন্তু এই পুলিশই তেমন বিচলিত হন না। একজন পুলিশ নিহত হলে সঙ্গে সঙ্গে কার্ফু করে সার্চ করা হয়; কিন্তু ব্যারাকপুর অঞ্চলে দু'জন কিশোরকে খুন করা

হচ্ছে শুনেও পুলিশ সময় মত ঘটনাস্থলে যান নি। যখন পনেরো জন পুলিশ খুন হয়েছেন, তখন পুলিশ ক্ষিপ্ত। তার আগে হন নি। ভিতরের অবস্থাটা আজ এমন যে, কোনও মৌলিক পরিবর্তন না হলে যোগ্য নেতৃত্বহীন এই পুলিশ বাহিনী এখন আস্তে আস্তে হয় একেবারে অকেজো হয়ে পড়বে ; না হয় বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষ্ণনগরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। পুলিশ যত ভয় পাবে এবং ক্ষেপবে, তত সে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়বে, তত তার নৃশংসতা বাড়বে এবং ততই সে নির্বিচারে অত্যাচার করবে। এ অবস্থাটা নিশ্চয়ই সমর্থন-যোগ্য নয় এবং পুলিশ এই ঝোঁক থেকে নিজেকে সামলাতে না পারলে নিজেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করবে।

কিন্তু আমাদের বামপন্থী নেতারা যাঁরা মাসের পর মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছাড়িয়েছেন ও ছড়াচ্ছেন তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণতার অভিযোগ আনছেন কোন্ যুক্তিতে ? কিছুদিন আগে এক সকালে শোনা গেল দমদম অঞ্চলে নকশালরা দু'জন সি পি এম কর্মীকে খুন করেছেন। সেই দিনই রাত্রের মধ্যে খবর পাওয়া গেল ওই দমদমেই অন্ততঃ সাতজন নকশালপন্থী খুন হয়েছেন। এটা কি প্রতিহিংসাপরায়ণতা নয় ? গোটা রাজ্যে এত যে সি পি এম-সি পি আই, সি পি এম-ফরওয়ার্ড-ব্লক মারামারি হয়েছে ও হচ্ছে তার মূলে কি প্রতিহিংসাপরায়ণতাই কাজ করেনি ও করছে না ? সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং সি পি আই (এম এল) পার্টির কর্মীরা, নেতারা যে রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ, পুলিশও কি সেই রক্তে-মাংসে গড়া মানুষ নন ? প্রতি-হিংসাপরায়ণতা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। কিন্তু যাঁরা নিজেরাই প্রতিহিংসা-পরায়ণ তাঁরা অপরকে সেই দোষে দোষী করেন কোন্ মুখে ?

বামপন্থী নেতাদের কাছে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। তাঁরা বলছেন, এখন পুলিশ যেভাবে নকশালপন্থীদের দমন করার চেষ্টা করছেন, সেটা ফ্যাসিস্ট পথ, নাৎসী কায়দা। আমিও মনে করি

সরকার ও পুলিশ নকশাল দমনের নামে নকশালপন্থাদেরই সুবিধা করে দিচ্ছেন—ভুল পথে চলছেন। কীভাবে তাঁরা তা করছেন আপাতত সে আলোচনায় নাই গেলাম। আমি শুধু রাজ্যের বামপন্থী নেতাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা কীভাবে নকশাল দমনের চেষ্টা করেছিলেন ? নিশ্চয়ই উল্লেখ করব যুক্তফ্রন্ট আমলে ওদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নকশালবাড়িতে মহিলা ও শিশু পুলিশের গুলিতে মরেছিলেন কোন্ আমলে ? দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে গোপীবল্লভপুর ও ডেবরায় যে পুলিশ অপারেশন হয়েছে এখনও পশ্চিমবঙ্গে কোনও পুলিশ অপারেশন তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছে ? একজন সি পি এম কর্মী হত্যার উপলক্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজ-ইউনিভার্সিটি এলাকায় দিন কয়েক যে তাণ্ডবলীলা চলেছিল সেটা কী তেমন নিরিমিষ্যি ব্যাপার ছিল ?

আগেই বলেছি কথাটা, আবার বলতে চাই—'খুনকা বদলা খুনের' নীতিতে কখনও খুনোখুনি বন্ধ করা যায় না। বরং খুনোখুনি তাতে বাড়ে। এ জিনিসটা যিনিই ভুলে যাবেন তিনিই রাজ্যের বিপদ বাড়াবেন। পুলিশই হোক আর রাজনৈতিক দলই হোক ; খুন করে কেউ খুনোখুনি কমাতে পারেন না, পারবেন না।

যাঁরা হাঙ্গামায় আস্থাবান, যাঁরা হাঙ্গামা বাড়াতে চান, যাঁরা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে বিপ্লব করার নীতিতে বিশ্বাসী, তারা অবশ্য সব বুঝেসুঝেও হাঙ্গামা-হজ্জুগী ; খুনোখুনি বাড়াবার চেষ্টা করবেনই। কারণ সেইটাই তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু যাঁরা হাঙ্গামা দমন করতে চান, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছুক, তাঁরাও যদি হাঙ্গামা বা খুনোখুনির প্রতিযোগিতায় নামেন তাহলে তার ফলে তাঁদের লাভতো হবেই না বরং প্রতিপক্ষেরই সুবিধা হয়ে যাবে।

আমার নিজের ধারণা, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ হাঙ্গামা

হুজ্জুগী বা খুনোখুনী মোটেই পছন্দ করেন না। চরমতম শত্রুকেও আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ খুন করার কথা ভাবতে পারে না—যতক্ষণ না সেই শত্রু তাকে খুন করতে আসে। মাঝে মধ্যে পরিস্থিতির ব্যতিক্রম হয় বটে—যেমন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। কিন্তু সেই উন্মত্ততাও বা কত দিন থাকে? তারপর আবার সেই উন্মত্তদের কি অনুশোচনা আসে না?

যে দল বা গোষ্ঠীই হাঙ্গামা-হুজ্জুগী ও খুনোখুনির পথ ধরুন না কেন এদেশে তাঁরা গণ-সমর্থন পেতে পারেন না, পারবেন না। এদেশের মানুষ তাকে কিছুতেই সমর্থন করবে না। এই সত্যটা যিনি যত কম বুঝবেন তিনি তত দেশের মানুষের কাছ থেকে সরে যাবেন—তিনি তত নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বেন—তিনি হতে পারেন অস্ত্রে বলীয়ান পুলিশ, হতে পারেন মাও মন্ত্রে দীক্ষিত মার্কসবাদী।

২রা অক্টোবর ১৯৭০।

সম্ভাব্য সমঝোতা আর আসন-রক্ষা

দুটো কারণে ১৯৭১-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। প্রথম কারণ, আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। এবং দ্বিতীয় কারণ একটা ব্যাপক সি পি এম বিরোধী নির্বাচনী সমঝোতার আশা।

আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য নির্বাচন ত্বরান্বিত হবে এ কথাটা শুনে নিশ্চয়ই অনেকে আশ্চর্য হবেন। হওয়া উচিতও। কারণ প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে দিল্লী ও কলকাতার ছোট-বড় সব কর্তাই যে এতদিন প্রকাশ্যে বলে এসেছেন 'আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠান অসম্ভব।' প্রধান মন্ত্রী তো টেবিল চাপড়ে খোদ কলকাতার রাজভবনে বসে ঘোষণা করে গিয়েছিলেন' "আমি পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবই। তার আগে এখানে কিছুতেই নির্বাচন হতে পারে না।"

মাস পাঁচ ছয়ের মধ্যে তাঁরা বুঝে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অত সহজ নয়। প্রধান মন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর ইতিমধ্যে গোটা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় তিনশ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত পুলিশই খুন হয়েছেন আঠাশ জন। আর শুধু যে চোরাগোপ্তা খুন-জখমের হার প্রচণ্ড ভাবে বেড়েছে তাই নয়, কলকাতা ও শহরতলীতে উপদ্রুত এলাকার সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বর্ধমান। বেলেঘাটা কুমারটুলি, জোড়া বাগান, বরানগর, কাশীপুর, যাদবপুর, টালিগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় দিনের পর দিন অবিরাম মারামারি চলছে।

নতুন করে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক হাঙ্গামা শুরু হওয়ারও আশঙ্কা

দেখা দিয়েছে। মফস্বলে ব্যাপক হাঙ্গামা যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অনেকটা কম ছিল। কিন্তু শীতকালে অর্থাৎ ধান কাটার সময় আবার তা শুরু হতে চলেছে।

তাই, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যক্ষ বোঝা এখন দিল্লীর কর্তারা যথা শীঘ্র সম্ভব ঘাড় থেকে নামাতে চাইছেন। এটা তাঁরা এতদিনে বুঝে গিয়েছেন যে, আজ এ রাজ্যে যা অবস্থা তাতে যে কোনও সময় বড় রকমের কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে—যে ঘটনা এই দিনে দু' তিন জন সামান্য খেটে-খাওয়া মানুষ খুনের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ, যে ঘটনা সমগ্র ভারতকে কাঁপিয়ে তুলতে পারে এবং যে ঘটনা উত্তর প্রদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ব্যর্থতার চেয়ে অনেক বড় আঘাত হানতে পারে দিল্লীর সিংহাসনের উপরে।

সেই জন্যই দিল্লী এখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে রাজ্যের সব ঘটনার, সব হাঙ্গামা-হুজ্জুগির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব একটা রাজ্য সরকারেয় হাতে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে চান।

কিন্তু সেই সরকার সি পি এম পরিচালিত সরকার হলে দিল্লীর চলবে না। দিল্লীর কর্তারা জানেন, সি পি এম যদি আবার রাইটার্স বিল্ডিংসের দখল পায় তাহলে অবস্থাটা তাঁদের (অর্থাৎ দিল্লীর) পক্ষে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। তাঁরা এটাও বোঝেন, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক বিচারে পশ্চিমবঙ্গের মত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যকে পুরোপুরি সি পি এম এর হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কোনও ভোটে-নির্ভরশীল সরকারের পক্ষেই বর্তমান ভারতে দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব নয়।

তাই দিল্লী পশ্চিমবঙ্গে এমন নির্বাচিত সরকার চান, যে সরকারে সি পি এম-এর কোনও চিহ্ন থাকবে না। তাই সি পি এম-কে হারানো যাবেই এটা না বোঝা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কিছুতেই রাজী হবেন না।

কীভাবে সি পি এম-এর পরাজয় নিশ্চিত করা যাবে এই নিয়েই যত মতভেদ।

নবকংগ্রেসের বিজয় নাহার, তরুণকান্তি, প্রভৃতি মনে করেন, তাঁদের পার্টি+বাংলা কংগ্রেস+বদরুদ্দোজা সাহেব+পি এস পি প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী জোট হলে ১৫০ টার বেশি আসনে জেতা যাবেই। বিজয়বাবু আদর্শগত কারণে এবং তরুণবাবু অন্য কতগুলি পার্থিব হেতুতে সি পি আই-এর সঙ্গে কোনও নির্বাচনী জোটের বিরুদ্ধে।

বাংলা কংগ্রেসের সুশীল ধাড়া প্রভৃতি এই জোটে আদি কংগ্রেসকে পেলে খুশী হবেন। তাঁরা মনে করেন, আদি কংগ্রেসের সংগঠন আছে। কিন্তু নবকংগ্রেসী নেতারা প্রধানমন্ত্রীর ভয়ে সে কথা মুখেও উচ্চারণ করতে সাহস পান না। সুশীলবাবু সি পি আই এবং এস ইউ সি দুই দলের সঙ্গেই কোনও জোট করার বিরুদ্ধে। কারণ, তাঁর মতে এরা মেদিনীপুর, মালদা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় যা করেছে তা কোনও অংশে সি পি এম-এর ক্রিয়া-কলাপের চেয়ে কম নয়। এই তিন অঞ্চলেই বাংলা কংগ্রেস বহু আসনে লড়তে চান।

নব এবং বাংলা কংগ্রেসের এই দু পক্ষই একযোগে তৃতীয় ফ্রন্টের রব তুলেছিলেন—যে ফ্রন্টে কমিউনিস্টরা কেউই থাকবে না; থাকবে শুধু জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি। কিন্তু মুশকিল হয়ে গিয়েছে অজয়বাবুকে নিয়ে। তিনি এই প্রস্তাবে মোটেই রাজি নন। নীতিগতভাবে তিনিও কমিউনিস্ট বিরোধী। সি পি আই এবং এস ইউ সি সম্পর্কে তিনিও ভীত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য: তোমরা আদি কংগ্রেসকেও নেবে না; ফরওয়ার্ড ব্লকও তোমাদের সঙ্গে আসবে না, তাহলে সি পি এমকে হারাবে কী করে? তিনি এ পর্যন্তও মেনে নিতে রাজি আছেন যে, রাজ্যের রাজনৈতিক হাওয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির পক্ষে। কিন্তু তাঁর

পাল্টা প্রশ্ন : যখন সি পি এম রে রে করে লাঠির জোরে নির্বাচন করতে নামবে তখন তোমরা তার সামনে দাঁড়াতে পারবে ? তিনি মনে করেন, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং এস ইউ সি এই কাজ পারবে। তাই তিনি ওদের সঙ্গে চান। ঠিক এই কারণেই তিনি এস ইউ সি-র সব কীর্তি জেনেও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় সুবোধ ব্যানার্জীকে বিশেষ খাতির করতেন। তখন তাঁর ধারণা ছিল, বাড়ুজ্জেই ক্যাবিনেটে জ্যোতি বোস-হরেকৃষ্ণ কোঙারের জবাব।

কিন্তু এত সব সত্বেও অজয়বাবু তৃতীয় ফ্রন্টের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতেন যদি না প্রধানমন্ত্রী তাঁকে সমর্থন করতেন। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত। তাই ব্যাপকতম সি পি এম বিরোধী ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে এগিয়ে যেতে বলেছেন। অজয়বাবুর নিজস্ব পরামর্শদাতারা মোটা-মুটি একটা আসন রফার একটা খসড়াও তৈরী করেছেন। সেই হিসাবটাই এই রকম : বাংলা কংগ্রেস+নবকংগ্রেস ১৪০, সি পি আই ৬০, ফরওয়ার্ড ব্লক ৪০, এস ইউ সি ১৫ এবং অন্যান্য ২৫।

মোটামুটি এই ব্লুপ্রিণ্ট সামনে রেখে এখন আলোচনা সুরু হবে। অজয়বাবু আগাম কোনও পার্টির সঙ্গেই জোট ঘোষণা করতে ইচ্ছুক নন—যদিও তৃতীয় ফ্রন্টের সমর্থকরা তার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা চান অন্তত নবকংগ্রেস বাংলা কংগ্রেস এবং বদরুজ্জা সাহেবের নির্বাচনী মৈত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হোক। অজয়বাবু কিন্তু মনে করেন, তাতে তাঁর ম্যানুভারিং ক্ষমতা কমে যাবে। তিনি তাই স্রেফ বাংলা কংগ্রেসের নেতা হিসাবেই সকলের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের আলাপ আলোচনা চালাতে চান।

যদিও ঐ ব্লুপ্রিণ্ট অনুসারে আসন রফার মোটামুটি সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে ১৯৭১ সনেই পশ্চিমঙ্গে নির্বাচন করতে প্রধানমন্ত্রী রাজী হয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী এবং অজয়বাবু দু'জনেই জানেন, লিখেপড়ে কোনও ব্যাপক সি পি এম বিরোধী জোট হবে না।

যা হতে পারে এবং সম্ভবত হবে তা হল গোপনে আসনের সমঝোতা। এমনও হতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তু'পাঁচটা আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক ও এস ইউ সি-র সঙ্গে নব কংগ্রেসের বিরোধ থেকে যাবে। কিন্তু তাতেও সামগ্রিক সমঝোতা আটকাবে না।

সি পি এম নেতারা জানেন, ব্যাপক বিরোধী জোটের সামনে দাঁড়িয়ে একা লড়াই করে জেতা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ। তাঁরা এও জানেন যে, ৭১য়েই নির্বাচন হলে ব্যাপক সি পি এম বিরোধী জোট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এখন এটা বুঝতেও তাঁদের তেমন অসুবিধা হয় না যে, রাজ্যের সব উল্লেখযোগ্য দল আজ সি পি এম-এর ভয়েই সবচেয়ে বেশি ভীত।

তাই প্রকাশ্যে যাই বলুন, এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তাঁরা সময় চান। নির্বাচনটা ৭১-এ না হলেই তাঁদের সুবিধা। তাঁরা জানেন, সরকার বিরোধী ও 'অর্জিত অধিকার রক্ষার' আন্দোলন যত জোরদার হবে ততই সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি প্রভৃতি পার্টি বাংলা কংগ্রেস এবং নব কংগ্রেস থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য হবে। সি পি এম-এর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী না হলেও ওইসব দল তখন আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকতে পারবে না। আর নবকংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস গোটা আন্দোলনেরই বিরোধিতা করে সরকারের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। তখন ঘটনা প্রবাহই সি পি এম বিরোধী একটা নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন প্রায় অসম্ভব করে তুলবে।

সি পি এম নেতৃত্ব তাই প্রাণপণে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে সেই দিকে নিয়ে যেতে চাইবেন। নির্বাচনে দেরি হলেই সি পি এম আত্মরক্ষার সুযোগ পাবেন।

২৩ অক্টোবর, ১৯৭০।

জাল ভোট বন্ধ করতে সচিত্র পরিচয়-পত্র

আমার কাছে প্রায় প্রতিদিনই কিছু লোক চিঠি লেখেন। কোনও দিন বিশজন, কোনও দিন বা মাত্র দু, জন'। খুব সাধারণ লোক তাঁরা। কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ সামান্য কেরাণী, কেউ বা কোনও অফিসের বেয়ারা; আবার কেউ বা স্রেফ বেকার। নানা সমস্যা নিয়ে তাঁরা লেখেন, নানাভাবে মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ আমার কোনও বক্তব্যের জন্য গালিগালাজ করেন। কেউ বা শুধুই ধন্যবাদ জানান।

গালিগালাজই দিন আর ধন্যবাদই জানান, এই সব চিঠি পড়ে উপকার হয়—জনমত বুঝতে এই সব চিঠিও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যাঁরা পার্টি করেন না এবং পার্টিগুলির ভয়ে আজকাল প্রকাশ্যে কোনও কথা বলেন না, তাঁদের মনোভাব এইসব চিঠির মাধ্যমে আমি বেশ কিছুটা বুঝতে পারি, জানতে পারি।

এই নির্বাচনের পরেও আমি অনেক চিঠি পেয়েছি এবং নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিভিন্ন লোক তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। কেউ বলছেন, ভোটদাতাদের সাহসের কথা। কেউ বা আলোচনা করেছেন, সরকার গঠনের প্রসঙ্গ। কেউ তুলেছেন, রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে সাংবিধানিক বিতর্ক। কারও বা মত, আমার মত 'বুর্জোয়া সাংবাদিকরা এখনও ইতিহাসের ধারা বুঝতে পারে নি বলেই এবারও সবটা গুলিয়ে গেল।'

কিন্তু এই সবকিছুর চেয়ে এবার অনেক অনেক বেশী চিঠি পেয়েছি যে বিষয়ে তা হল জাল ভোট। অধিকাংশ পত্রলেখকেরই প্রশ্ন, হ্যাঁ মশাই এত তো লেখেন, জাল ভোট নিয়ে লিখছেন না

কেন—ভোটাভুটির ব্যাপারটা যে একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না ?

প্রত্যেকেই জাল ভোট সম্পর্কে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। কেউ লিখেছেন : তিনি জানেন, তাঁর এক প্রতিবেশী একা কুড়িটা জাল ভোট দিয়েছেন। কেউবা জানিয়েছেন : একজন পোলিং এজেন্ট হিসাবে তিনি দেখছেন তাঁরই বুথে একটি মেয়ে গোটা দিনে পাঁচবার ভোট দিয়ে গিয়েছে।—তিনি ভয়ে কিছু বলতে পারেন নি। কারু বা সংবাদ : তিনি যে বাড়িতে থাকেন তারই একতলার ঘরে একটি পার্টি জাল ভোটের কনট্রোলিং সেণ্টার খুলেছিল। তিনি দেখেছেন, ছেলে এবং মেয়েরা দলে দলে সেখান থেকে স্লিপ নিয়ে গিয়ে জালভোট দিয়ে আসছে।

পত্র লেখকদের প্রায় সকলেরই মূল প্রশ্ন, জাল ভোট যদি বন্ধ না করা যায় তাহলে এই রকম ভোটাভুটিতে জীবন ও অর্থের শ্রাদ্ধ করে লাভ কি ? সাচ্চা জনমত যে নির্বাচনে প্রতিফলিত হয় না তেমন নির্বাচনের সার্থকতাই বা কি ?

জাল ভোট নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটা জিনিস বোধহয় বলে রাখা ভাল।

প্রথমত, জাল ভোট সম্পর্কে কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংখ্যাতথ্য কারও জানা নেই। পার্টির লোকেরা সৎ হলে এ বিষয়ে মোটামুটি একটা হিসাব দিতে পারেন বৈকি। কিন্তু তাঁরা তা কিছুতেই দেবেন না।

দ্বিতীয়ত, কোনও কেন্দ্রেই আসল ভোটের চেয়ে এখনও জাল ভোট বেশী হয়ে উঠতে পারে নি। যদিও জাল ভোটের প্রভাব ক্রমেই বাড়ছে।

তৃতীয়ত, জাল ভোটটা হয় প্রধানত শহরাঞ্চলে। গ্রামে জাল ভোট হয় না তা নয়। তবে, শহরের চেয়ে কম হয়।

চতুর্থ, বড় বড় প্রায় সব পার্টিই জাল ভোটের সাহায্য নেন। কম আর বেশী। কেউ হয়ত কোথাও ১৫০০ জাল ভোটের বন্দোবস্ত করেন। কেউ বা প্রায় ১০ হাজার জাল ভোট দেন। যাঁর সংগঠন যত মজবুত, যাঁর লোকবল যত বেশী, যাঁর ভয় দেখাবার ক্ষমতা যত অধিক এবং যাঁর পক্ষে যত বেশী পোলিং অফিসিয়াল অর্থাৎ যাঁর দিকে বুথের নির্বাচন পরিচালকদের বেশী সহানুভূতি তাঁরই তত জাল ভোট দেওয়ার সুবিধা।

এগুলি আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। ১৯৫২ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন দেখছি। আমার বদ্ধমূল ধারণা, জাল ভোট এ রাজ্যে দিনদিনই বাড়ছে।

জাল ভোটের আবার প্রকার ভেদ ঘটছে। যেমন ধরুন, প্রথম প্রথম এখানে সাধারণ গৃহস্থ বাড়ির মেয়েরা জাল ভোট দিতে যেতেন না। প্রার্থীরা বা তাঁদের লোকজন বিশেষ পল্লীতে যেতেন জাল ভোট দেওয়ার মহিলা সংগ্রহ করতে। এখন ধারা পাল্টাচ্ছে।

অথবা, আগে যেমন ভোট কেনা-বেচা হত, এখন তেমন হয় না। আগে সকলের সামনে ব্যালট পেপার বা ভোটপত্র বাকসে ফেলতে হত না। পর্দার আড়ালে প্রার্থীদের নামে নামে বাকস থাকত। নিয়ম ছিল, ভোটদাতা পর্দার আড়ালে গিয়ে তাঁর পছন্দমত বাক্সে ভোট দেবেন। এই সুযোগে কিছু কিছু বিত্তশালী প্রার্থী ভোট কিনে নিতেন। ভোটদাতা বাকসে না ফেলে পকেটে করে ব্যালট পেপারটি নিয়ে আসতেন। বিনিময়ে টাকা পেতেন। তারপর প্রার্থীর কোনও অতিবিশ্বস্ত লোক নিজের ভোটটা দেওয়ার সময় সেই কেনা ভোটগুলি নিয়ে গিয়ে বাকসে ফেলে দিয়ে আসতেন।

আগে একাধিক জাল ভোট দিতে এক ব্যক্তি সাহস পেতেন না। আগে অপ্রাপ্ত বয়স্করাও ভরসা করে জাল ভোট দিতে যেত না। আগে ভয় দেখিয়ে অন্য দলের এজেণ্টদের আসতে না দিয়ে বা সরিয়ে দিয়ে সহানুভূতিশীল বা ভীত পোলিং অফিসিয়ালের সাহায্যে

পোলিং বুথেই শেষ বেলায় একসঙ্গে অনেকগুলি ভোটপত্র বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ওসব কথা পাঁচ সাত বছর আগে কেউ ভাবতেও পারতেন না। আগে ভয় দেখিয়ে পোস্টাল ব্যালট সংগ্রহেরও এমন ঢালাও ব্যবস্থা ছিল না। এখন এসব হামেশাই হয়।

এবার এই সব কিছুর চূড়ান্ত হয়েছে 'মুক্ত এলাকাগুলিতে।' মুক্ত এলাকা অর্থাৎ বিভিন্ন পার্টির নিজস্ব এলাকা যেখানে ভিন্ন কোনও দলের কোনও লোকের প্রবেশাধিকার নেই। এই সব এলাকায় এবার ভোট পড়েছে সব চেয়ে বেশী। স্বাভাবিক এলাকায় যদি ৫০% ভোট হয়ে থাকে তো এই সব এলাকায় ৯০% ভোট পড়েছে। এই বিরাট ভোটের অধিকাংশটাই জাল ভোট। রাস্তা ধরে ধরে যদি কোনও নিরপেক্ষ তদন্ত হয় তাহলেই সঠিক জানা যাবে এর কতটা ভোট আসল, কতটা জাল।

যাঁরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন জাল ভোট বন্ধ হোক। তাঁরা নিশ্চয়ই দাবি করবেন, নির্বাচনে সাচ্চা জনমত প্রতিফলিত হোক এবং সেই রায় অনুসারেই সরকার গঠিত হোক।

কিন্তু একটা জিনিস আমাদের সকলেরই বোধহয় স্মরণ রাখা উচিত—এই সমাজে একেবারে সাচ্চা জনমতের প্রতিফলন কিছুতেই সম্ভব নয়। নানা ভেজাল আসতে বাধ্য। যে সমাজে বাচ্চাদের খাবারে, ওষুধে, রোগীর পথ্যে ভেজাল দেওয়া হয়, সেখানে ভোটে কিছুটা ভেজাল হবে না—তা কি হয়?

তবে হ্যাঁ, এটাও সত্য যে, দিন দিন এখানে ভোটে যেমন ভেজাল বাড়ছে তা প্রতিরোধ না করা গেলে কিছুদিনের মধ্যে জাল ভোটই সব কেন্দ্রে চূড়ান্ত ফলাফল স্থির করে দেবে। এখনই বহু কেন্দ্রে তাই হচ্ছে। এখনই বহু অঞ্চলে হাজার হাজার জাল ভোট

পড়ছে এবং সেই ভোটই চূড়ান্ত ফলাফল নির্বাচন করেছে। ঐ জিনিস আর বাড়লে নির্বাচন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে।

জাল ভোট বন্ধ করার জন্য দুটো ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। (এক) শহরাঞ্চলে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সচিত্র সরকারী পরিচয়-পত্র করতে হবে। এবং (দুই) দলীয় প্রভাব নিরপেক্ষ পোলিং পার্সোন্যালদের দিয়ে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

জাল ভোট বেশী হয় শহরে। তাই শহরেই আগে জাল ভোট বন্ধ করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। প্রথমে বৃহত্তর কলকাতা দিয়ে শুরু করা যায়। বৃহত্তর কলকাতায় মোট ভোটদাতা বা প্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ লক্ষ। প্রতি সচিত্র পরিচয়-পত্রের জন্য মোট খরচ ১০ টাকার বেশী হতে পারে না। তাহলে এই বাবদ খরচা হতে পারে ৬ কোটি টাকা। একবার পরিচয়-পত্র হয়ে গেলে বারবার তা বদলাতে হবে না।

সরকারী পরিচয়-পত্র সঙ্গে থাকলে দৈনন্দিন জীবনেও প্রত্যেক নাগরিকেরই সুবিধা। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জানা যাবে তার পরিচয় ও ঠিকানা। কোথাও আইডেন্টিফিকেশনের জন্যও গেজেটেড অফিসার বা চেনা লোক খুঁজে বেড়াতে হবে না। কোথাও কোনও কাজে গেলে আমি যে অমুকচন্দ্র অমুক প্রমাণ করতেও কোনও অসুবিধা হবে না—সচিত্র সরকারী পরিচয়পত্র দেখালেই হয়ে যাবে।

বিদেশে বহু রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকেরই একটা না একটা সরকারী পরিচয়পত্র থাকে। আমাদের এখানেই বা তা হতে পারবে না কেন?

যদি কোনও মুসলমান মহিলা ধর্মীয় কারণে ছবিতে আপত্তি করেন তাহলে তাঁকে বা তাঁদের না হয় আপাতত বাদই দেওয়া গেল। ৬০ লক্ষের মধ্যে তাঁরা বড় জোর ৬ লক্ষ।

কিন্তু জাল ভোট কমাবার জন্য এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সুবিধার জন্য বৃহত্তর কলকাতার সচিত্র পরিচয়পত্র প্রথা প্রবর্তনে আর কোনও অসুবিধা হতে পারে না। এটা করা উচিত এবং করা একান্তই আবশ্যক। যদিও বহু পার্টিই এই প্রস্তাবে আপত্তি করবেন।

২৬ মার্চ, ১৯৭১।

মুক্তিযোদ্ধারা শেষ পর্যন্ত জিতবেনই, কারণ ওরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করছেন

যাঁরা ধরে নিয়েছিলেন বাঙলাদেশের মুক্তিফৌজ খুব তাড়াতাড়ি পাক সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে গোটা দেশটাকে নিজ দখলে নিয়ে আসতে পারবেন তাঁদের মধ্যে এখন কিছুটা নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠেছে। সীমান্তের বড় বড় শহরগুলিতে পাক সেনাবাহিনী যত এগিয়ে আসছে ততই তাঁরা আশংকিত হয়ে উঠছেন; ততই তাঁরা মনে করছেন—তাহলে বোধহয় মুক্তিফৌজ আর পারলেন না।

কিন্তু এভাবে হতাশ হওয়ার মত এখনও কিছু ঘটেনি। এটা মনে করা যেমন আমাদের অনেকেরই ভুল হয়েছিল যে মুক্তি সেনাবাহিনী খুব তাড়াতাড়ি পাক সেনাদের পর্যুদস্ত করতে পারবেন, তেমনি এটা ধরে নেওয়া ভুল এবং অযৌক্তিক যে, পাক সেনারা গত কয়েকদিন যেভাবে এগিয়েছে তাদের সেই অগ্রগতি তারা অব্যাহত রাখতে পারবে অথবা বিভিন্ন ঘাঁটিতে দখল অটুট রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। লড়াইয়ে জয়-পরাজয় সব সময়ই থাকে। লড়াইয়ে কখনও এগোতে হয়, কখনও বা পেছোতে হয়। লড়াইয়ের কলা-কৌশলে শিক্ষিত এবং অঢেল অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় আশি হাজারের একটা বাহিনীকে চট করে পদর্যুস্ত করা এত সহজ নয়। বিশেষ করে, একটি অসংলগ্ন আধা সামরিক বাহিনীর পক্ষে—যাঁদের হাতে ভারী অস্ত্র বলতে তেমন কিছু নেই, যাঁদের হাতে গুলি-গোলা খুবই কম।

বাংলাদেশে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইটা চালাচ্ছেন কারা? চালাচ্ছেন প্রায় ৪০-৫০ হাজারের একটা অসংলগ্ন আধা

সামরিক বাহিনী। এতে পুরো সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত আছেন শুধু ই বি আর অর্থাৎ পাক সেনাবাহিনীর ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিকরা। বিদ্রোহের ভয়ে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনেককেই আগে ভাগে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলায় ছিলেন মাত্র হাজার পাঁচেক। আধা সামরিক বাহিনীর প্রধান হলেন ই পি আর অর্থাৎ ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস। ই পি আর-এর মধ্যেও অফিসাররা এবং অস্ত্র চালকরা অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী। তারা অধিকাংশই অস্ত্র-শস্ত্র সহ গিয়ে যোগ দিয়েছেন পাক সেনাবাহিনীর সঙ্গে। যারা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই মেশিনগান বা মরটার চালাতে জানেন। তাদের অধিকাংশের হাতে ছিল সেই পুরানো ৩.৩ রাইফেল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ই পি আর পরিচালনার ভার কখনও বাঙালীর হাতে দেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা ই পি আর-এর বাঙালী সিপাইকে কখনও ভারী অস্ত্র চালাতে শেখায়নি। মুক্তিবাহিনীতে আর আছেন মোজাহীদ, আনসার এবং পুলিস। এদেরই বা অস্ত্র শিক্ষা কতটুকু! মোজাহিদরা আরও একটা বাড়তি অসুবিধায় পড়েন গোড়া থেকেই। তাঁদের হাতে ছিল সব চীনা রাইফেল—যে রাইফেলের গুলি পাক সেনা-বাহিনীর হাতে।

মুক্তি বাহিনীতে এরা ছাড়া আর ছিলেন ছাত্র ও যুবকরা। তাঁরা লড়াই করতে এসেছিলেন হাজারে হাজারে। যে যা পেরেছিলেন তাই নিয়েই। আমি যশোর শহরে গিয়ে দেখেছি ছাত্র ও যুবকরা লোহার রড হাতে নিয়ে পাক সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এই যে মুক্তিবাহিনী, তার পক্ষে অস্ত্রে সজ্জিত একটা বিরাট বাহিনীকে চট করে পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। তাঁরা প্রথম প্রথম বহু ক্ষেত্রে পরাজিত হবেন, তাঁরা হাজারে হাজারে প্রাণ হারাবেন;

তাঁদের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হবে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা জিতবেনই। কারণ, তাঁরা মুক্তি যুদ্ধ লড়ছেন। কারণ, সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের সমর্থক। কারণ, পাক সেনাবাহিনী স্রেফ একটা দখলদার বাহিনী। কারণ মুক্তি সৈনিকদের এবং বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের মনোবল বিরাট—তাঁরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাই মুক্তিসেনাদের শিক্ষিত সৈনিক করে তুলছে। প্রতি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা তাঁরা পরবর্তী ধাপে কাজে লাগাচ্ছেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যাঁরা অনেকে ২৭ তারিখ বিকেল পর্যন্তও নির্দেশের অভাবে চুপ করে বসেছিলেন, ২৫ বা ২৬ তারিখ যাঁরা অনেকে স্রেফ পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারদের হুকুমে মরটার ও মেশিনগান হাতছাড়া করেছেন আজ তাঁরা কত সতর্ক, আজ তাঁরাই কীভাবে নেতৃত্ব দিতে এগোচ্ছেন, আজ তাঁরাই কীভাবে গেরিলা কায়দায় পাক বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন।

অতর্কিতে আক্রমণ হানার কায়দায় ওরা এখন কতটা অভিজ্ঞ তার একটা দিক শুধু তুলে ধরেছি। যেহেতু ব্যাপারটা আর গোপন নয়, তাই সত্যি কথাটা এখন জানানো যায়। মুক্তিবাহিনী যখন প্রথম তিন চার দিনের লড়াইয়ের পর দেখলেন যে, পাক-বাহিনীর সঙ্গে সামনা-সামনি লড়াই করে সাফল্য অর্জন করা কঠিন, তখন তাঁরা শত্রু পক্ষকে বিপথে চালিত করার একটা নতুন কায়দা ধরলেন। তাঁরা পাক সেনাদের কাছে ভুল খবর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করলেন। তাদের বেতার যন্ত্র বেশি নেই যে তাতে ভুল খবর বলে শত্রুপক্ষকে বেকায়দায় ফেলবেন। কোনও বাঙালীর মাধ্যমে পাক সেনাবাহিনীর কাছে ভুল খবর পৌঁছবারও পথ নেই; কারণ

ওরা বাঙালী দেখলেই গুলি করে হত্যা করে। তখন তাঁরা একটা নতুন পথ ধরলেন। তাঁরা সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র মারফৎ মুক্তিবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল খবর প্রচার করতে লাগলেন। পাক সেনাবাহিনী জালে পা দিল। তারা সেইভাবে অগ্রসর হল। কিন্তু কিছুই পেল না। তারপর তাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ হানলেন মুক্তিফৌজ।

এই ভাবে তাঁরা বহু সেনাকে ঘায়েল করেছেন। মুক্তিফৌজের পরিচালকরা এখন বেশ হাসতে হাসতেই বলেন: আর ও কায়দা খাটছে না। ওরা বুঝে গিয়েছে। এখন তাই ওরা আর কোনও খবরের উপর ভরসা করে এগোয় না।

এটা অভিজ্ঞতার শিক্ষা। এই রণ-কৌশল মুক্তিফৌজ ট্রেনিং-স্কুল বা কলেজে শেখেনি। শিখেছে রণাঙ্গনে। এমনিভাবে বাংলাদেশের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ লড়াইয়ের কায়দা শিখেছেন। শিখছেন অস্ত্র চালনা। শিখছেন পথ ঘাট অচল করে দেওয়ার কলাকৌশল। শিখছেন অল্প লোক দিয়ে অতর্কিতে বিরাট সশস্ত্র বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার কায়দা। খুব দ্রুত তাঁরা শিখছেন। কিন্তু তবু সময় লাগবে। দু-চার সপ্তাহে এ ধরণের লড়াইয়ে জয়-পরাজয়ের নিস্পত্তি হতে পারে না। এ লড়াই চলবে। এ লড়াইয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর চূড়ান্ত জয় কিছুতেই হতে পারে না।

এই লড়াইয়ে আমাদের অর্থাৎ আমরা যাঁরা বাংলা দেশের পূর্ব পশ্চিম এবং উত্তরে বাস করি, তাদেরও বিরাট ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী অনেক কিছু করছেন। কী কী করছেন, তা নিশ্চয়ই ঢাক পিটিয়ে বলা হবে না। তবে এটা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, বিশ্বের

বহু মানবদরদী নেতার চেয়ে এক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা বড়।

সরকার ছাড়া সাধারণ মানুষেরও অনেক কিছু করতে হবে। আজ সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা আমাদের দেখতে হবে তা হল, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেন ওপার এবং এপারের কিছু অসাধু লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে। ওপারের স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই বিধ্বস্ত ওপারের ব্যবসা-বানিজ্যও। শহর ছেড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন গ্রামে। গ্রামীন অর্থনীতির ওপর তাই বিরাট চাপ। গ্রামে গ্রামে খাদ্যাভাব। অভাব কেরোসিন, দেশলাই, টর্চের ব্যাটারী, মোমবাতি, ওষুধপত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের।

আমাদের সরকার চান আর না চান, এসব জিনিস এপার থেকে ওপারে যাবে। ওপারের লোকেদেরও দেখতে হবে, আমাদেরও দেখতে হবে, যাতে না এ নিয়ে বিরাট কালোবাজারী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ওপারে এবং এপারে আঞ্চলিক কমিটি গড়ে তুলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা যায়। এবং তা করতেই হবে।

আবার ওপারের বহু কাঁচা মালও এপারে আসবে। আসবে মাছ, আসবে পাট। আগেও আসত। এখন অনেক বেশি করেই আসবে। ওপারের উৎপাদকরা যাতে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত না হন, সেটাও আমাদের দেখতে হবে। এ ব্যাপারেও ওপার এবং এপারের আঞ্চলিক কমিটিগুলি সক্রিয় হলে ফাটকাবাজদের জব্দ করা কঠিন হবে না। আমরা যেন ভুলে না যাই, নেপালের সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকে যে ভারত-বিরোধী, তার প্রধান কারণ,অসাধু ব্যবসায়ীদের ক্রিয়াকলাপ। পূর্ব বাংলার বিপন্ন চাষী যেন এদের শিকার না হন। ওপারে যেন এরা নিজস্ব দালালবাহিনী না সৃষ্টি করতে পারে।

দুই দেশের সরকারকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। দুই দেশের মানুষকেও এইক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। শুধু ভাবাবেগ চলবে না। সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে সুশৃঙ্খল ভাবে ওপার এবং এপারের মানুষকে এগোতে হবে। তাহলে বাংলাদেশকে কেউ পদানত করতে পারবে না।

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১।

খুনোখুনির রাজনীতিতে সাফল্য কার ?—
চারু মজুমদারের দলের

চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন নকশালপন্থী রাজনীতি কয়েকটা ব্যাপারে বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে। প্রথম সাফল্য, তাঁরা রাজ্যের রাজনীতিকে বেশ কিছুটা তাঁদের রাজনীতি নির্ভর করে তুলতে পেরেছেন। দ্বিতীয় সাফল্য, তাঁরা বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন সময়ে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছেন। তৃতীয় সাফল্য, যাঁরা রাজনৈতিক ভাবে তাঁদের বিরোধী, তাঁরা সবাই যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না সাহস পান তেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এবং তাঁদের সবচেয়ে বড় সাফল্য মূলত তাঁদের রাজনীতির আবর্তে সরকার ব্যতিবস্ত হয়ে উঠেছেন।

এই সব সাফল্য চারু মজুমদারের দলকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে কি যাবে না, সে বিতর্কে আমি যেতে চাই না। কারণ, তাত্বিক আলোচনা করার মত তত্বজ্ঞান আমার নেই। তবে একজন রিপোর্টার হিসাবে আমি দেখতে পাচ্ছি, এখনও পর্যন্ত তাঁদের রাজনীতি কতকগুলি বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছে।

অন্যান্য দলের নেতারা অবশ্য বলেন, এসব সাফল্য মোটেই সাফল্য নয়। তাঁরা এই প্রসঙ্গে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করেন। তাঁদের বক্তব্য, অমুক ওই কাজ করছে বলেই নকশালপন্থীরা এইভাবে চালিয়ে যেতে পারছে। তাঁরা আরও বলেন, নকশালপন্থীদের পিছনে কোনও গণ-সমর্থন নেই—ওরা শুধু ভয় দেখিয়ে, খুন করে নিজেদের কাজ হাসিল করছে।

যেমন ধরুন, সি পি এম নেতারা বলেন, পুলিস, নব কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি সক্রিয়ভাবে নকশালপন্থীদের

সাহায্য করছে বলেই ওরা এখনও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে—ওরা এখনও খুন-জখম করে ঘুরে বেড়াতে পারছে। আবার নব কংগ্রেস, সি পি আই এবং ফরওয়ার্ড ব্লক বলেন, সি পি এম খুনের রাজনীতি সুরু করেছে বলেই নকশালপন্থীরা খুনোখুনি চালাতে সাহস পাচ্ছে—সি পি এম যদি খুনের রাজনীতি বর্জন করে, তাহলে নকশালদের ঠাণ্ডা করতে সময় লাগবে না। অন্যদিকে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেন, আমরা কী করব, ওরা সবাইকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেন, আমাদের হাতে সময়মত ক্ষমতা দিলেন না, নিজেরাও সবাই মারামারি খুনোখুনি করবেন, দুষ্কৃতকারীকে প্রশ্রয় দেবেন; আর জনসাধারণও কোনভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না—এই অবস্থায় আমরাই বা কী করতে পারি?

কেন ওঁরা সফল হয়েছেন, কীভাবে ওঁরা কাকে কখন পক্ষে পেয়েছেন সেকথা ভিন্ন। কিন্তু মূলত এটা আজ বাস্তব সত্য যে, ওঁরা, অর্থাৎ চারুবাবুর দল কতকগুলি বড় রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন।

নব কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিদ্রোহী পি এস পি পর্যন্ত পার্টি, সি পি এম থেকে আরম্ভ করে এস ইউ সি পর্যন্ত মার্কসবাদীরা সবাই বলেন, ব্যক্তিগত আক্রমণের, ব্যক্তিগত খুনোখুনির রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। চারুবাবুর দল কিন্তু সেকথা বলেন না। কাগজপত্রে এবং দেয়ালের লেখায় তাঁরা খুব জোর গলায় ঘোষণা করেন: খতম অভিযান চলছে, চলবে।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম: চারুবাবুর দল ব্যক্তিগত খতমের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন, অন্যান্যরা তা করেন না।

এইবার আসুন আমরা দেখি, গোটা রাজ্যের, বিশেষ করে বৃহত্তর কলকাতার রাজনীতিটা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি বলা হয়, আজ গোটা রাজ্যের বিশেষ করে বৃহত্তর কল-

কাতার রাজনীতির একটা বড় দিক হল ব্যক্তিগত খুনোখুনি, ব্যক্তিগত খতম অভিযান, তাহলে কি খুব ভুল বলা হবে? বলব না, আর কোনও রাজনীতি নেই। বলব না, ভোটের রাজনীতি নেই, ছাত্র-যুবক-কর্মী-কৃষক-শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম বলে চিরপরিচিত সেই সব আন্দোলনের কিছুই নেই। বলব না, মজুরী বৃদ্ধি বা জমি পাওয়ার লড়াই নেই। কিন্তু এসব কিছুর উর্ধেই কি আজ খুনোখুনির রাজনীতি নয়? খতমের রাজনীতিই কী আজ অন্তত বৃহত্তর কলকাতায় সব কিছুকে ছাপিয়ে যায় নি? খতমের রাজনীতির দাপটে কি ওইসব রাজনীতি আজ সঙ্কুচিত নয়?

এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এই রাজ্যে যেখানে রাজ-নৈতিক দলের নেতা ও কর্মীরা চলাফেরা করতে সাহস পান না। যেখানে অনেকেই আক্রমণের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত—যেখানে বৃহত্তর কলকাতা আজও নানা পার্টির অঞ্চলে বিভক্ত।

এই পরিস্থিতি শুধু চারুবাবুর দলের ক্রিয়াকলাপের ফলেই হয়েছে তেমন নয়। এই পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য প্রায় সব রাজনৈতিক দলেরই কম-বেশী কিছু না কিছু ভুমিকা আছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ স্রেফ নির্ভেজাল সমাজদ্রোহীরাও নিচ্ছে। পুলিশের বক্তব্য, এখন যে সব খুনোখুনি হচ্ছে তার শতকরা আশি-ভাগই করছে অন্যান্যরা।

কিন্তু যিনি যত খুনোখুনিতে নেমেছেন, যিনি যত বদলা নিতে যাচ্ছেন ততই মূলত লাভবান হচ্ছে চারুবাবুর রাজনীতি। কারণ, তাঁর রাজনীতির একটা বড় দিকই হল খতম অভিযান। খতম জিনিসটা যত বাড়বে—সে খতম কে বা কারা করলেন সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র—ততই চারুবাবুর পথের জয় হবে। অন্যান্য দল বদলা নেওয়ার বা হানাহানির পথে যতই এগিয়ে যাবেন ততই খতমের রাজনীতির সাফল্য সূচিত হবে, ততই খতমের রাজনীতি অন্য সব রাজনীতিকে গ্রাস করবে।

তাহলে এই খতমের রাজনীতি সম্প্রসারিত হওয়ায় লাভ কার? চারুবাবুর, না অন্যান্যদের-যে পার্টি ঘোষণা করে 'খতম অভিযান চলছে, চলবে' সেই পার্টির, না যে সব পার্টি বলেন আমরা খতমের বিরুদ্ধে তাঁদের?

চারুবাবুর দলের রাজনীতির আর একটা মস্ত বড় সাফল্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের সাহায্য লাভ।

আজ নানা দলের নেতারা অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, বিভিন্ন এলাকায় মূলত সি পি এম-কে জব্দ বা প্রতিরোধ করার মনোভাব নিয়েই নব কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দল নানা ভাবে সি পি আই এম (এল) এর ছেলেদের সাহায্য করছেন। কতকগুলি এলাকায় ওঁরা জয়েন্ট ফ্রণ্টও গড়েছেন। ওঁরা বলেন: সি পি এম মার দাঙ্গার পথে গিয়ে সব দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইল বলেই আমরা কিছু কিছু এলাকায় নকশালপন্থীদের সঙ্গে একজোটে সি পি এম-কে প্রতিরোধ করেছি। কিন্তু তা বলে আমরা কখনও নকশালপন্থীদের রাজনৈতিকে সমর্থন করিনি।

সি পি এম-এর ভ্রান্ত অহেতুক জঙ্গী নীতির জন্যই হোক অথবা নির্বাচনে সি পি এম কে জব্দ করার গোপন বাসনায়ই হোক, এটা বাস্তব সত্য যে, বহু এলাকায় বিভিন্ন সি পি এম-বিরোধী দল নকশালপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। নকশালপন্থীরা এই সুযোগটা বিশেষ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। এবং তাদের আরও কৃতিত্ব এই সময়ে তাঁরা তাঁদের মূল রাজনীতি থেকে বিচ্যুত হননি—খতমের রাজনীতি তাঁরা ঠিকই চালিয়ে গিয়েছেন।

এর ফলেই হয়ত আজ দমদমে ফরওয়ার্ড ব্লক, সি পি আই এবং নব কংগ্রেসকে সি পি এম-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে হয়েছে। কিন্তু গত আট-দশ মাসের

পারস্পরিক তিক্ততা কি তাঁদের এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় নি যে, আজ চট করে সর্বত্র দমন নীতি অনুসরণ করা এবসব দলের পক্ষে প্রায় অসম্ভব? কোনও কিছুর বিরুদ্ধে বা কোনও কিছুর পক্ষে আজকের পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং কংগ্রেসের পক্ষে একজোট হওয়া কি এতই সহজ?

আর তাছাড়া, আজ সবাই মিলেই কি ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা ভীতিপ্রদ রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেন নি যে, সাধারণ মানুষ বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরাও কোনও কিছুর বিরুদ্ধেই এগিয়ে আসতে সাহস পান না? এ জিনিসও কিন্তু মূলত নকশালদেরই সাহায্য করেছে। কারণ, তারা এখনই এখানে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চান, যাতে বিরোধীরা কেউ যেন তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না সাহস পায়।

চারুবাবুর দলের সবচেয়ে বড় সাফল্য সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার ক্ষেত্রে।

যুক্তফ্রণ্ট আমলেই বলুন, রাষ্ট্রপতির শাসনেই বলুন, আর বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রেই হোক—পর পর তিনটি সরকারকেই ওঁরা ব্যতিব্যস্ত রাখতে পেরেছেন। এর কোনও সরকারই ওঁদের ব্যাপারে কোনও সর্বসম্মত স্পষ্ট নীতি অবলম্বন করতে পারেন নি।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে নকশালপন্থীদের ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে মন্ত্রীসভার নানা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে চলেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সঙ্গে রাজ্যের আমলাতন্ত্রের ঝগড়া। রাজ্যের আমলাতন্ত্র হাতে যখন যে ক্ষমতা চেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তখন তা দিতে রাজী হন নি।

আজ এ সরকারেরও আরও সংকট—কারণ আজ খতমের রাজনীতির পথে নকশালপন্থীরা আরও অনেককেই টেনে নামাতে

পেরেছেন। আজ এই রাজনীতি এত ব্যাপক, আজ গোটা পুলিস-বাহিনী এবং জনসাধারণ খতমের রাজনীতির ভয়ে এত তটস্থ ও অথর্ব; আজ এই রাজনীতির বিরোধীরা নিজেদের মধ্যে এত বেশী কলহে ও হানাহানিতে মত্ত যে, শুধু নকশালপন্থীদের আলাদা করে নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

আজ তাই খুনোখুনি বেড়ে চলেছে, আর সরকার কিছুই করতে পারছেন না—চলছে শুধু ব্যর্থ দাপাদাপি।

২১শে মে, ১৯৭১।

বাঙলাদেশের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেরও সমস্যা কিন্তু প্রতিকার কী?

বাঙলা দেশের সমস্যা আজ পশ্চিমবঙ্গেরও সমস্যা। কারণ বাংলাদেশে এখন যা কিছু ঘটছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব সরাসরি ভাবে এই দেশের ওপরও পড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে অর্থনীতির উপর বাংলাদেশের সমস্যার প্রচণ্ড চাপ ইতিমধ্যেই পড়েছে। এই চাপ দিন দিনই বাড়বে। এর সঙ্গে সঙ্গেই আসছে আমাদের আইন ও শৃঙ্খলা এবং সামাজিক পরিস্থিতির উপর বাংলাদেশের সমস্যার চাপ। শরণার্থী আগমন যত বৃদ্ধি পাবে এই চাপও ততই বাড়বে। তারপরই আসবে আমাদের রাজনীতির উপর বাংলাদেশের সমস্যার চাপ।

এইসব চাপের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে বলা কঠিন। তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, অবিলম্বে বাংলাদেশের সমস্যার কোনও সুরাহা না হলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতি ও রাজনীতি একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে।

বাংলাদেশের সমস্যার প্রভাব নানাভাবে গোটা ভারতের উপরই পড়বে। কিন্তু যেভাবে তা পশ্চিমবঙ্গের উপর, ভারতের সীমান্তবর্তী চারটি রাজ্যের উপর পড়ছে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর ঠিক তেমন ভাবে পড়বে না। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরার উপর বাংলাদেশের সমস্যার প্রথম ধাক্কাটা এসে পড়েছে। কারণ এগুলি বাংলাদেশের সীমান্ত রাজ্য। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এসেছে পশ্চিমবঙ্গের উপর। কারণ, বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তই সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সমতল।

পশ্চিমবাংলার মানুষ তাই স্বভাবতই পূর্ব বাংলা অর্থাৎ বাংলা-

দেশের ব্যাপার নিয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকের চেয়ে বেশি চিন্তিত।

এর উপর তো আছে আত্মিক যোগের প্রশ্ন। এক ভাষা, মোটামুটি একই সংস্কৃতি, একই ঐতিহ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ কোনও প্রভাব এসে না পড়লেও পশ্চিমবাংলার মানুষ পূর্ব বাংলার মানুষের কথা বেশি করে ভাবতই।

নানা কারণেই তাই আমরা আজ বিশেষ ভাবে জানতে ব্যগ্র বাংলাদেশের বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের পরিণতি কী হতে পারে? এবং তার প্রভাব আমাদের উপর কীভাবে এসে পড়তে পারে?

প্রথমেই এ জিনিসটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, যদি বাইরে থেকে সক্রিয় সমর্থন না পান তাহলে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চূড়ান্তভাবে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব। যদি কখনও তেমন একক জয় সম্ভব হয়ও তা হলেও দু-চারবছরের মধ্যে তা হতে পারে না সে জয় হতে বহুদিন লাগবে।

পাক সেনাবাহিনী নির্দয়। তারা পৃথিবীর যে কোনও বর্বর খুনে বাহিনীর চেয়েও বেশি বর্বর। তারা আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান। তারা জনমতের ধার ধারে না। পূর্ববাংলার মানুষের মন জয় করতেও উৎসাহী নয়। তারা হাজারে হাজারে মানুষ খুন করতে সামান্যও কুণ্ঠিত নয়। এই রকম একটা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালানোও সহজ নয়। বিশেষ করে বাঙালীর পক্ষে—জাতিগতভাবে গেরিলা যুদ্ধ বা সম্মুখ সমর চালাবার অভিজ্ঞতা গত দু-শ বছরের মধ্যে যার নেই বললেই চলে।

মুক্তিবাহিনী পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালাতে গেলেও দুটো জিনিস তার চাই-ই। (এক) নিয়মিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ। এবং (দুই) পাক সেনাবাহিনীর নাগালের

বাইরে একটা নিরাপদ আশ্রয়। এই দুটো জিনিসের জন্যই মুক্তিবাহিনীর বাইরের সমর্থন চাই।

দ্বিতীয়ত, গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে পাক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করা গেলেও ওই ভাবে তাকে চট করে কান্টনমেণ্ট বা ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। সেজন্য চাই ভারী অস্ত্র এবং বিমান, বা নিদেন পক্ষে বিমান বিধ্বংসী কামান বা রকেট। আর চাই সম্মুখ সমরের নামার ক্ষমতা। অর্থাৎ পাক বাহিনীর চেয়ে বেশি সেনাবল এবং পাক বাহিনীর হাতে যে সব অস্ত্র শস্ত্র আছে তার চেয়ে বেশি ক্ষমতার, না হলেও অন্তত সমকক্ষ অস্ত্রশস্ত্র।

কোনও বড় রাষ্ট্র খোলাখুলি ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে এসব জিনিস সংগ্রহ করা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

সুতরাং, গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে পাক বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে গেলেও মুক্তিবাহিনীর বাইরের সাহায্য চাই; আবার সম্মুখ সমরে নেমে তাদের ঘাটি থেকে উচ্ছেদ করে পূর্ব বাংলা ছাড়া করতে গেলেও বাইরের সাহায্য চাই।

দুটো সাহায্যে আবার কতকগুলি পার্থক্য আছে। যেমন গেরিলা যুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাহায্য গোপনে দেওয়া গেলেও সম্মুখ সমরে প্রয়োজনীয় সাহায্য খোলাখুলি ভাবে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে দেওয়া যায় না।

আরও একটা জিনিস আছে। প্রতিবেশী কোনও রাষ্ট্র ছাড়া অর্থাৎ যার সঙ্গে সীমান্তের যোগাযোগ আছে সে ছাড়া অন্য কেউ এসব সাহায্য দিতেও পারে না। পূর্ব বাংলার সঙ্গে সীমান্তের যোগাযোগ আছে একমাত্র ভারতের, আর কয়েক মাইল এলাকায় বর্মার।

জলপথে প্রয়োজনীয় সাহায্য আনা যায় না তা নয়। কিন্তু নিয়মিত যতটা সাহায্য প্রয়োজন জলপথে তা আনতে গেলে

সমুদ্রতটে অন্তত কিছুটা সুরক্ষিত অঞ্চল থাকা চাই। তেমন কোনও সুরক্ষিত এলাকা এখন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নেই।

তাই এখন ভারত ছাড়া বা ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আর কারো পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়া সম্ভব নয়।

ভারত সরকার দুভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারেন। (এক) দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে গোপনে মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্য করতে পারেন। এবং (দুই) পাকবাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে খোলাখুলিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে নামতে পারেন।

যদি শুধু দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের জন্য ভারত সরকার ওদের সমর্থন করেন তাহলে দুটো দায়িত্বই তাকে নিতে হবে। প্রথমত, মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র শস্ত্র ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং দ্বিতীয়ত, যতদিন ওই গেরিলা যুদ্ধ চলবে ততদিন অন্তত এক কোটি শরণার্থীর জন্য এখানে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান জোগাতে হবে। কারণ, যতদিন পূর্ব বাংলায় খানসেনারা থাকবে এবং যতদিন ওখানে গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতা চলবে ততদিন শরণার্থী আগমণও বন্ধ হবে না; আগত শরণার্থীরাও ফিরে যাবে না।

আর, যদি দ্বিতীয় পথে এগোতে চান তাহলে ভারত সরকারকে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ে নামার ঝুঁকি নিতে হবে। যে লড়াই শুধু পূর্বে সীমাবদ্ধ থাকবে না, যে লড়াই পশ্চিম সীমান্তেও হবেই। এবং যে লড়াইর সময় চীন উত্তর সীমান্তে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে না নামুক চাপ সৃষ্টি করবেই।

নানা কারণে ভারত সরকার এখনই দুই নম্বর পথে এগোতে চান না। অর্থাৎ পুরোপুরি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

একটি কারণ, সরকার মনে করেন যে, তাতে বিশ্বের দৃষ্টি বাংলাদেশের প্রশ্ন থেকে সরে গিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষের দিকেই বেশি পড়বে। ফলে, বাংলাদেশের ক্ষতি হবে।

আর একটি কারণ, ভারত সরকার আশা করেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন বড় রাষ্ট্রের চাপে এবং গেরিলা-যুদ্ধ-উদ্ভূত নিজস্ব অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ সমস্যার একটা কোনও রাজনৈতিক সমাধানে রাজী হবে। এবং তারপর শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

প্রধানত এই দুই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করেই ভারত সরকার বাংলাদেশে সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ভারত সরকারের এই বিশ্লেষণ খুব বাস্তব নয়।

প্রথমত, বিশ্ববাসী বাংলাদেশের ঘটনাবলী জানলেও বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলি এখনও পাকিস্তানকে চটিয়ে বাংলাদেশকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে আগ্রহী নন। এই ব্যাপারে ডিগ্রীর তফাৎ থাকলেও ব্রিটিশ, মারকিন এবং রুশ মনোভাব মূলত একই। বাংলাদেশের ঘটনাবলীকে তাঁরা নিজ নিজ স্বার্থে এখনও পাকিস্তানের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবেই দেখছেন।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছেন চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন। সুতরাং অর্থনৈতিক সংকটে পড়লেও পাকিস্তান এখনই অর্থ নৈতিক ভাবে ভেঙ্গে পড়ছে না।

তৃতীয়ত, পাকিস্তান আরও বেশি চীনের দিকে চলে যাবে এই ভয়ে এবং নিজ নিজ অর্থ নৈতিক ও সামরিক স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়া বাংলাদেশের ব্যাপারে পাক সরকারের উপর বড় কোনও চাপ দিতে অনিচ্ছুক।

চতুর্থত, পাকিস্তান সরকার বিভিন্ন বড় রাষ্ট্রের মনোভাব বুঝে আরও বেশি করে শরণার্থী ভারতে ঠেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

এই দুই নতুন পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের সামনে এখন দুটি মাত্র পথ আছে : হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে খোলাখুলিভাবে এগিয়ে যাওয়া; আর না হয় কোটিখানেক শরণার্থী নিয়ে বিরাট বিশাল সংকটে দীর্ঘকাল হাবুডুবু খাওয়া এবং কিছু একটা সুরাহা হওয়ার আশায় বসে থাকা।

কোন্ পথে এগোবেন, ভারত সরকারকে তা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্থির করতে হবে।

২৮ মে, ১৯৭১।

এবার দিল্লী গিয়ে…

ছোটবেলায় আমরা এক রাজার রাজত্বে বাস করতাম। ওড়িশায়। রাজত্বের নাম বামরা। খুব বড় রাজ্য নয়—মাঝারি। তখন বছরে রাজ্যের মোট আয় ছিল মাত্র ছ' লাখ টাকা।

সেই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল দেওঘর। ছোট্ট সুন্দর শহর। মাঝখানে রাজপ্রসাদ। তার চতুর্দিকে ছড়ানো শহর। অফিসারদের কোয়ার্টার। রাজপরিবারের লোকেদের বাড়ীঘর। ছোট বাজার। বড় বাজার। ব্যবসায়ীদের অট্টালিকা। বড় বড় গেস্ট হাউস। স্কুল। হাসপাতাল। লাইব্রেরী। টেনিস, ফুটবল ও হকি খেলার নানা মাঠ। নাটমঞ্চ। হাতিশালা। ঘোড়াশালা। বিরাট মোটর গ্যারাজ। নানা রকম ফল ফুলের বাগান। ফোয়ারা। রাস্তার সর্বত্র ছড়ানো জলের কল।

ছোট্ট শহরটাকে বেশ ভালই লাগত।

মাঝে মধ্যে জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে মফস্বলে যেতাম। মফস্বলে মানে রাজ্যের অন্যান্য 'শহরে'। সেখানে কিন্তু দেখতাম একেবারে অন্য চেহারা। পাকা বাড়ি বলতে একটাই। সেটা ডাক-বাংলো। যেখানে গিয়ে অফিসাররা উঠতেন, থাকতেন। আর সবই কুটির। সব কাঁচা এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। ভাঙ্গা দোচালায় প্রাথমিক স্কুল। দু'একটা পাতকুয়া। সর্বত্র প্রচণ্ড দারিদ্র্যের ছাপ।

কলকাতা থেকে নয়াদিল্লী গেলে আমার প্রায়ই সেই বামরার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই দেওঘর আর মফস্বল শহরগুলির ব্যবধানের কথা।

নয়াদিল্লী বাড়ছে তো বাড়ছেই। চওড়া চওড়া রাস্তা আরও চওড়া হচ্ছে। নতুন ধপধপে সব বাড়ি উঠছে। রাস্তায় রাস্তায়

রঙিন ফোয়ারা। পুরানো 'দৃষ্টিকটু' বাড়িগুলি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। রাজপথগুলি আলোয় আলো। বাংলোগুলির সামনে প্রশস্ত সবুজ লন। প্রাইভেট বাড়িগুলির সামনে রং বেরঙের ফুলের বাগান।

হাত-পা ছড়ানো একটা সুন্দর শহর। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ গিজ গিজ করছে না। ফুটপাতগুলি বিপন্ন পরিবার আর হকারের ভিড়ে ডুবুডুবু নয়। ট্রাম-বাস-লরী-ঠেলা-রিক্সা-টেম্পোর ধাক্কায় ব্যতিব্যস্ত ভেঙে পড়া স্যাঁতসেতে পুরানো একটা শহর নয়। ক্রমবর্ধমান রাজধানী। তিলে তিলে তাকে সুন্দর করার জন্য কতই না চেষ্টা, কত না অর্থব্যয়।

কলকাতা থেকে যতবার নয়াদিল্লী যাই হিংসে হয়, দুঃখ হয়। আর মনে পড়ে সেই বামরা রাজ্যের কথা।

বামরার যে রাজার রাজত্বে আমরা বাস করেছি তিনি রাজাদের মধ্যে মোটামুটি দয়ালু বলেই পরিচিত ছিলেন। মদটদ খেতেন; শিকারে গিয়ে হৈ-হুল্লোড়ও করতেন; রাজপরিবারের লোকজনেরা অন্যায় অবিচার করলে চোখ বুজেও থাকতেন। কিন্তু তারই মধ্যে তিনি গরীব প্রজাদের কথাও ভাবতেন। রাজ্যের প্রায় সব পরগণার খবরাখবর নিতেন। 'হুজুর' বলে কোনও প্রজা দরবারে এসে দাঁড়ালে তার জন্য কিছু করতেন। এমন কি প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য মাঝে মধ্যে পাত্রমিত্র সহ রাজত্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বেরিয়েও পড়তেন।

রাজা সাহেবের প্রজা-দর্শন দেখবার সৌভাগ্য একবার আমার হয়েছিল। চাপরাশির সঙ্গে রাজধানীর উপকণ্ঠে একটা বাজারে গিয়েছিলাম বিকেলবেলা। হঠাৎ শুনি হৈ-চৈ। কী ব্যাপার? না রাজাসাহেব আসছেন। আমার সঙ্গের চাপরাশি চটপট একটু স্মার্ট হয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আমাকেও বলল, চুল ঠিক করে নেন।

রাজাসাহেব এলেন। প্রথমেই মাছের দিকটায় ঢুকলেন। একবারে সামনে পড়ে গেলাম, অমুকের ছেলে, অমুকের ভাইপো। রাজাসাহেব হেসে জিজ্ঞেস করলেন: কি, মাছ পাচ্ছো তো? তোমরা বাঙ্গালীরা তো আবার মাছ খুব ভালবাস। তারপর রাজাসাহেব নিজেই দেখতে এগোলেন, কী কী মাছ এসেছে।

বাজারে দু' রকমেরই মাছ এসেছিলো। পচা এবং তাজা। পচা মাছ দেখেই রাজাসাহেব শিউরে উঠলেন। বললেন: এইসব পচা মাছ খেলেই লোকের কলেরা হবে এবং সেই কলেরা দেওঘরে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন: সব পচা মাছ ফেলে দাও এবং বাজারে যাতে আর পচা মাছ না আসতে পারে তার ব্যবস্থা কর।

নয়াদিল্লীতে এবার একজন বড়দরের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাজাসাহেবের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ মনে পড়ল। দেখা হতেই কর্তাব্যক্তি বললেন: কলকাতার সবাই কলেরার টিকা নিচ্ছে তো?

আমি বললাম: যাঁরা পারছেন তাঁরা সবাই নিচ্ছেন। গরীবদের সকলের তো পয়সা খরচ করে কলেরার ইনজেকশন নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তারা ফ্রি ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে। আবার মাঝখানে শহরে কলেরার ইনজেকশনেরও অভাব দেখা দিয়েছিল।

তিনি বললেন: আমরা দিল্লীতে বড় চিন্তিত। এখানেও না আবার কলেরা আসে। তাহলেই তো গিয়েছি। এখানে অবশ্য ফ্রি কলেরার টিকা দেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি বললাম: হ্যাঁ, যদি কলকাতার গরীবদের এবং বাংলা দেশের শরণার্থীদের সময়মত ফ্রি কলেরা ইনজেকশন দেওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা হতে পারত তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কলেরায় অতগুলি প্রাণ যেত না।

ভদ্রলোক বললেন: তবে জানেন, আপনাদের ওখানে এত কলেরা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ বোধহয় যে আপনারা মাছ খান।

ইভাকুইরা নদীতে শব ভাসিয়ে দিচ্ছে। মাছ সেই সব খায়। আপনারা সেই মাছ খান। এবং, তাই কলেরা হয়।

আমি বললাম: আপনারা ভাগ্যবান্। আপনাদের এদিকে বছর বছর ইভাকুই আগমন ঘটে না। ৪৭-৪৮ সনেই এসপার-ওসপার হয়ে গিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য। ফি বছরেই রেফিউজি বা ইভাকুই আসে। এবার আসছে ভীষণ বেশি। দৈনিক লক্ষাধিক। এত লোকের জন্য কোনও ব্যবস্থা কবা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে যদি কলেরা হয় তো ফল মারাত্মক হবেই। আজ মানুষ সংকারের ব্যবস্থার অভাবে শব নদীতে ফেলে দিচ্ছে। নদীর জল সংক্রামিত হচ্ছে। তাতে কলেরা আরও ছড়াচ্ছে।

আমি আরও বললাম: তবে জানেন, পশ্চিমবঙ্গে যারা দু'বেলা মাছ খেতে পান বা খান তাঁদের মধ্যে বড় একটা কলেরা হয় না। কলেরা তাদেরই বেশি হয়, যাদের দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না। কলেরাও বড় লোকদের ছুঁতে পারে না। যেমন আমাদের বৈপ্লবিক খুনোখুনিও কোটিপতি শ্রেষ্ঠীদের না স্পর্শ করে শুধু খেটে খাওয়া গরীবদের গ্রাস করছে।

নরথ এভেনিউতে পশ্চিমবঙ্গের একজন এম পি-র বাড়ি বসে কথা বলছিলাম। আলোচনা হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা নিয়ে। উপস্থিত আর এক ভদ্রলোক ঝাঁঝালো সুরে আমাকে বললেন: এই যে বাংলার ছেলেদের বাংলার বাইরে কেউ চাকুরি দিচ্ছে না সেটা আপনারা লিখছেন না কেন? বাংলার ছেলে দেখলেই ওরা বলছে, ওরে বাবা নকশাল, ভাগাও ভাগাও। তা পশ্চিমবাংলার শতকরা কতজন ছেলেই বা নকশাল। সবাইকেই যদি নকশাল বলে পত্রপাঠ বিদায় করা হয় তাহলে বাংলার ছেলেরা তো আর বাংলার বাইরে চাকুরিই পাবে না। আপনারা এ নিয়ে লিখছেন না কেন? লিখলে সবার টনক নড়তো।

আমি বললাম : আপনার বক্তব্যটা ঠিক, কিন্তু ধারণাটা ভুল। সমস্যাটা আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু এ নিয়ে কিছু লিখলেই সকলের টনক নড়বে তা মোটেই নয়। খবরের কাগজে লিখলেই যদি কাজ হত তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা বহুদিন আগেই মিটে যেত।

এম পি এতক্ষণে চুপ করেছিলেন। হঠাৎ বললেন : মশাই চাকুরির কথা কি বলছেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণ অধ্যাপক সিমলা বেড়াতে গিয়েছিলেন। একটা হোটেলে গিয়ে হাজির হলেন। অধ্যাপকের নাম ঠিকানা দেখেই হোটেলওয়ালা বললে : নো রুম। অধ্যাপক বেরিয়ে আসছেন। শুনতে পেলেন পেছনে হিন্দীতে আলোচনা হচ্ছে—নকশাল হো সকতা।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বামরার কথা মনে পড়ে গেল।

আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন এক এস ডি ও। একদিন দেখি তাঁদের বাড়ির একটা চাকর বরখাস্ত হয়ে গিয়েছে। ঐ এস ডি ও-র এক ছেলে ছিল আমার সমবয়সী। জিজ্ঞেস করলাম, কী হল রে?

বললে : ও বড়রমার লোক। আমরা আগে জানতামই না। বড়রমার লোক সব চোর হয়।

বাড়ি ফিরে জ্যাঠামশাইকে জিজ্ঞেস করলাম : বড়রমার লোক নাকি সব চোর হয়?

জ্যাঠামশাই হেসে বললেন : তা ঠিক নয়। ও এলাকার লোক খুব গরীব। ওখানে চাষের জমি প্রায় নেই। বাঁশ খুব ভাল হয়। বামরা স্টেটের প্রায় অর্ধেক রোজগারই বড়রমা এলাকার বাঁশ বিক্রী করে। বাঁশঝাড় সবই স্টেটের। প্রত্যেক বছর বাঁশের ঠিকাদাররা যখন বাঁশ কাটতে যায় তখন বড়রমা অঞ্চলে চুরিটুরি হয়। ওখানের গরীবদের কেউ কেউ চুরিটুরি করে। তাবলে কি আর সবাই চোর? তা হয় নাকি? তবে দেওঘরের লোকের এই একটা অদ্ভুত ধারণা আছে, বড়রমার লোক সব চোর।

দিল্লী গিয়ে এবার আমার বারবারই বামরার কথা মনে পড়েছে। সেই বামরা এখনও আছে। কিন্তু এখন আর তা রাজার রাজত্ব নয়।

১৬ই জুন, ১৯৭১।

হত্যার আবর্তে নিমজ্জমান পশ্চিমবঙ্গ

আমরা কঠোরতম ভাষায় পাকিস্থানী সেনাবাহিনীর বর্বরতার নিন্দা করছি। কিন্তু আমরা একবারও ভেবে দেখেছি কি যে ওদের নিন্দা করার নৈতিক অধিকার আমাদের আছে কিনা? পূর্ববাংলায় ব্যাপকহারে যে বর্বরতা চলছে, আমরা এই পশ্চিমবঙ্গে, এই কলকাতা শহরে প্রতিদিন কি সেই রকম কিছু কিছু বর্বরতার নজির সৃষ্টি করছি না? যে বর্বরতা দেখে গোটা বিশ্বের মানুষ ওদের বলছে 'পশুর চেয়েও অধম' আমরাও কি প্রতিদিন অন্তত আট নটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই রকম পাশবিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছি না?

হুগলির ঘটনার কিছুটা এখন আমরা সবই জেনেছি। জেনেছি কীভাবে ন'টি তরুণকে হত্যা করা হয়েছে। জেনেছি কীভাবে তাদের মেরে কেটে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। এর চেয়ে বেশি বর্বর কি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী? এর চেয়ে বেশী বর্বরতার পরিচয় কি আর কেউ দিতে পারে?

সেদিন একটি ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিপক্ষের লোকেরা হঠাৎ তাকে দেখতে পেল। বহুদিন ধরেই খুঁজছিল। তাড়া করল। ছেলেটি একটি অফিস বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিল। প্রতিপক্ষের লোকেরা সেখানে ঢুকে তাকে ধরল। ছুরি মেরে ক্ষতবিক্ষত করল। তারপরও ছাড়ল না। তেতলার উপর থেকে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

একটি ছেলে একপক্ষের অন্তর্ভুক্ত। তার ভাই পরীক্ষা দিয়ে ফিরছিল বাসে চেপে। দাদার প্রতিপক্ষের ছেলেরা তাকে টেনে বাস থেকে নামাল। ছুরি মেরে ক্ষতবিক্ষত করল।

এক ভদ্রলোক রাজনীতি করেন। বয়স্ক। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে। একটি কোম্পানীতে কাজ করতেন। কোম্পানী বেশ কয়েক মাস ধরে বন্ধ। তাই বেকার। পাড়ায় তাঁর পার্টির ছেলেদের সঙ্গে প্রতিপক্ষের ছেলেদের লড়াই হল সকালে। রাত্রে ভদ্রলোক বাড়ি যাচ্ছিলেন। প্রতিপক্ষ ধরল। পরদিন সকালে তাঁর মুণ্ডহীন দেহ পাওয়া গেল একটি পুকুরের ধারে।

একটি ছেলে এক রাজনৈতিক পক্ষভুক্ত। তার একটি ছোট ভাই ছিল। বিকলাঙ্গ জড়। ভয়ে দাদা বাড়ি থাকে না। একদিন রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন তাদের এক খুড়তুতো ভাই এল বাইরে থেকে বেড়াতে। তাকে নিয়ে সেই বিকলাঙ্গ ভাই বাড়ি থেকে বের হল রাস্তায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষ ধরল। নিয়ে গেল। ছেলে দুটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার আকুল আবেদন নিবেদন জানালেন তাঁর আত্মীয়স্বজন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ভ্রূক্ষেপ করল না। তিন চার দিন পরে একটি পুকুরের ভিতরে বস্তাবন্দী অবস্থায় পাওয়া গেল দুই ভায়ের গলিত মৃতদেহ।

একটি ছেলে বাসে করে অফিসে যাচ্ছিল। পাড়ায় সে পার্টি করত। প্রতিপক্ষের এলাকা দিয়ে যখন বাস যাচ্ছিল তখন বাসটা আটকে সার্চ করা হল। সেই ছেলেটিকে ধরে রাখল প্রতিপক্ষ। পরদিন সকালে তার মৃতদেহ পাওয়া গেল একটি মাঠের মধ্যে।

এ সবের চেয়েও কি বেশি প্রতিহিংসাপরায়ণ পাক সেনাবাহিনী? তারা কি এর চেয়ে বেশি পাশবিক?

গোটা পশ্চিমবঙ্গকে আজ এই পাশবিকতা গ্রাস করেছে। বেশি করে, আরও বেশি করে মানুষ জড়িয়ে পড়েছে এই প্রতিহিংসা-পরায়ণতায়। প্রতিদিন বীভৎসতা বাড়ছে। প্রতিদিন দশ-বারোটা করে গরীব পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিম দশ-বারো জন

করে মা শোকে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। প্রতিদিন কতগুলি অবোধ শিশু কাঁদতে কাঁদতে বোবা হয়ে যাচ্ছে।

আমরা প্রতিদিন পাক সেনাহানীর মুণ্ডপাত করি। আমরা ওদের বর্বরতার বিরুদ্ধে বিশ্বের জনমত গঠনের জন্য চেষ্টা করছি। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ওই বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জন করছেন।

কিন্তু মাসের পর মাস ধরে যে পাশবিকতা এই পশ্চিমবঙ্গে, এই কলকাতায় চলছে আমরা কে কতটা তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাই? আমরা কে কীভাবে তার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করছি? আমরা কে কীভাবে সেই পাশবিকতা, সেই বর্বরতা বন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছি?

ক্রমে ক্রমে এই পাশবিকতা কীভাবে গোটা রাজ্যকে গ্রাস করছে আমরা কি তা এখনও দেখতে এবং বুঝতে পারছি না? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে, এই বর্বরতা, এই পাশবিকতা কীভাবে দিনকে দিন গরিব পরিবারগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে, কীভাবে আমাদের সমাজের কিছু ছেলে খুনোখুনিতে বেশি করে, আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ছে? এবং কীভাবে গোটা সমাজ সেই খুনোখুনির আবর্তে পড়ে সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়েছে? আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা কি এও দেখতে পাচ্ছেন না যে, একদিকে যখন বাঙালীর আত্মঘাতী বীভৎসতা বাড়ছে আর একদিকে ঠিক তেমনই সেই সুযোগে মুনাফাবাজ ও কালোবাজারীর লুণ্ঠন এবং শোষকের শোষণ বাড়ছে? আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না যে, দিন দিনই কীভাবে রাজনীতির আড়ালে চলে গিয়ে স্রেফ ক্রাইম বুক ফুলিয়ে এগিয়ে আসছে? দেখতে কি পাচ্ছি না যে, এই সুযোগে কী দ্রুতগতিতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে?

আমরা সবাই পুলিশকে গালিগালাজ করছি। কিন্তু আমরা কি এটা এখনও বুঝতে পারছি না যে, অপদার্থ পুলিশ হয় এই খুনোখুনি বন্ধ করতে ইচ্ছুক নয় অথবা তারা এই বীভৎসতা কমাতে এবং থামাতে সম্পূর্ণ অপারগ? আর পুলিশ অনিচ্ছুক বা ব্যর্থ বলেই কি আর কারও কিছুই করার নেই? যে রাজনৈতিক নেতারা এই সব কিছুর মূলে তাঁদের কি আজ কোনও দায়িত্ব নেই, কোনও কর্তব্য নেই?

কে এই অবস্থার জন্য কতটা দায়ী, কে বেশি বীভৎসতার পরিচয় দিচ্ছেন, কে এই জিনিস শুরু করেছিলেন, কে বেশি খুনোখুনি, মারামারি করছেন সে বিচারে গিয়ে আজ লাভ নেই। কারণ সে বিচারে বসলে আসল কাজ ব্যাহত হবে। এই হানাহানি, খুনোখুনি এবং পাশবিকতা বন্ধ করাটাই আজ সবচেয়ে বড় কাজ। আলোচ্য হওয়া উচিত। অতীতের ঘটনা নিয়ে অন্তহীন বিতর্কে বসলে ভবিষ্যতের কোনও রফা হবে না।

সব দল, সব মতের রাজনৈতিক নেতার কাছে তাই বিনীত নিবেদন, আপনারা দয়া করে এই বীভৎসতা, এই পাশবিকতার রাহুগ্রাস থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করার চেষ্টা করুন। আপনারা সবাই চেষ্টা করলে যে এখনও এই জিনিস থামাতে পারেন, সে বিশ্বাস সাধারণ মানুষের আছে। প্রয়োজন শুধু আপনাদের সদিচ্ছার।

আর কিছু নয়, আপনারা শুধু সেই ছেলেগুলির কথা ভাবুন, যাদের এই হানাহানিতে নামানো হয়েছে। চেয়ে দেখেছেন একবার কিভাবে তারা জীবনযাপন করে? আপনারা দয়া করে একবার সেই পরিবারগুলির কথা ভাবুন, যেসব পরিবার থেকে এই সব ছেলে এসেছে। আপনারা কি দেখতে পান না এই

হানাহানি কিভাবে শুধু গরীব শোষিত খেটে খাওয়া পরিবারগুলিকে ধ্বংস করে যাচ্ছে ?

আমার বিনীত নিবেদন, পারস্পরিক দোষারোপ বন্ধ করে আপনারাই ঠিক করুন, কীভাবে এই হানাহানি বন্ধ করা যায়। পারস্পরিক দোষারোপে সমস্যার সমাধান হবে না—বরং তা আরও বাড়বে।

আপনারা দয়া করে আর সময় নষ্ট করবেন না। পশ্চিম-বাংলাকে গ্রাস করতে খুব দ্রুত চতুর্দিক থেকে মহাকাল এগিয়ে আসছে। পশ্চিমবাংলার যুব সমাজ যাতে আত্মঘাত বন্ধ করে অবিলম্বে একযোগে সব অন্যায়, সব অবিচার, সব অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে তার সুযোগ করে দিন। আপনাদের কাছে করজোড়ে নিবেদন, পশ্চিমবাংলার যুবশক্তিকে এক হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিন—আত্মঘাতী বীভৎসতার আবর্তে জড়িয়ে রেখে এভাবে তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেন না।

৪ঠা জুন, ১৯৭১।

ভাই-ভাই এখন 'গুড বাই'

বসন্ত বোস রোডে বাংলা কংগ্রেস অফিসে অজয়ববুার সঙ্গে কথা বলছিলাম। দুপুর বেলা। ১৯৬৭ সনের নির্বাচনের ফলাফল সবে বেরিয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে তখনও যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হয়নি। কিন্তু কাগজপত্রে এ খবরটা বেরিয়ে গিয়েছে যে, অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হবে এবং তার মুখ্যমন্ত্রী হবেন তিনিই।

অফিসের ভিতরের একটা ঘরে অজয়বাবু বসেছিলেন। পাশে সুশীল ধাড়া। কীভাবে তিনি মন্ত্রিসভা গড়বেন, তাতে কে কে থাকবে, কে কোন্ দপ্তর পেতে পারেন—এইসব প্রশ্ন নিয়ে অজয়বাবু এবং সুশীলবাবুর সঙ্গে আলোচনা করছিলাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, কারা যেন জোর শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসছেন। আমরা তিনজনেই থেমে গেলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই 'বাংলা কংগ্রেস জিন্দাবাদ', 'অজয় মুখার্জী জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে একদল লোক হুড়মুড় করে ওই ঘরে ঢুকে পড়লেন। একজনের হাতে বেশ বড় একগাছি মালা।

ওরা ঘরে ঢুকতেই অজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে এক পা গিয়েই বললেন 'দিন।' গলাটাও একটু নীচু করলেন।

আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম আগন্তুকদের কথা শুনে। তাঁরা সলজ্জভাবেই কথাগুলি বললেন, কিন্তু তা সত্বেও বেশ স্পষ্টই শুনতে পেলাম: না, এ মালা আমরা সুশীলদার জন্যই এনেছি।

অজয়বাবুও একটু থমকে গেলেন। বেশ অপ্রস্তুত অপ্রস্তুত ভাব। তারপর চেয়ারে বসতে বসতেই বললেন: বেশ তো, বেশ।

আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম সুশীল ধাড়ার প্রতিক্রিয়া দেখে। এতটুকু সংকুচিত না হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এগিয়ে এলেন। ঝুঁকে বললেন : 'দিন' আগন্তুকরাও সঙ্গে সঙ্গে 'সুশীল ধাড়া জিন্দাবাদ' বলে তাঁর গলায় সেই মালা পরিয়ে দিলেন।

তারপর সুশীল ধাড়া যা করলেন সেটা আমার এখনও ছবির মত মনে পড়ে : তিনি গলার মালা খুলে অজয়বাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন দাদা একটু দাঁড়াবেন। সুশীলবাবু ঝুঁকে পড়ে মালা অজয়বাবুর দু'পায়ের উপর রাখলেন। প্রণাম করলেন এবং তারপর বললেন, 'এই মালার যথাযোগ্য স্থান দাদার শ্রীচরণে।'

অজয়বাবু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। সমস্ত ঘর হাসির হিল্লোলে ভরে উঠল। আগন্তুকরা গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে শ্লোগান দিলেন 'অজয়বাবু জিন্দাবাদ।'

সেই অজয় মুখার্জী এবং সুশীল ধাড়া এখন রাজনীতিতে একে অপরের ঘোরতর শত্রু। সেই অজয় মুখার্জি প্রকাশ্যে বলেছেন, সুশীল ধাড়াকে মন্ত্রী করার চেয়ে এই মন্ত্রিসভা না থাকা ভাল। সেই সুশীলবাবুও ফিলার দিচ্ছেন, অজয়বাবুকে বাদ দিয়ে নব কংগ্রেসের কাউকে মুখ্যমন্ত্রী করা হলে, তাঁর দল সেই সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাবে।

অজয়বাবু এবং সুশীলবাবুতে কোনও ঝগড়া হতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন ১৯৬৭ সন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বার বার উঠেছে। অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, একান্তে। ১৯৬৭ সনের ২ অক্টোবর উঠেছিল এ প্রশ্ন। ১৯৬৯-৭০ সনে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার চরম সংকটের দিনগুলিতেও উঠেছে সেই প্রশ্ন। ১৯৭১ সনে নির্বাচনী আসন রফার সময়ও বার বারই উঠেছে একই প্রশ্ন।

বার বারই কংগ্রেস এবং বাংলা কংগ্রেস রাজনীতির অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জবাব দিয়েছেন, না, তা অসম্ভব।

এতদিন ঘটনাপ্রবাহও প্রমাণ করে আসছিল যে তা সত্যিই অসম্ভব।

১৯৬৯-৭০ সনে আমি একবার মেদিনীপুরের এক প্রবীণ নেতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আচ্ছা, আপনি তো দু'জনকেই বহুদিন থেকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানেন। এই যে, সি পি আইয়ের লোকেরা বলেন, অজয়বাবুতে সুশীলবাবুতে লাগল বলে, তা কি হতে পারে? আপনার কী মনে হয়?

ভদ্রলোক সাধারণত কম কথা বলেন। হেসে জবাব দিলেন: পাগল নাকি। কতদিনের সম্পর্ক। প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল। ওরা দু'জনে আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশী। দামুর চেয়েও সুশীল ? ওর অনেক আপন জন। সেই বিদ্যুৎ বাহিনী, সেই আগষ্ট আন্দোলন—সে সব কি আজকের! সেই সম্পর্কে কে ফাটল ধরাবে।

অজয়বাবুর সঙ্গে সুশীলবাবুর কখনও মত পার্থক্য হয়নি, এমন নয়। কিন্তু তা নিয়ে এর আগে কোনও দিন দু'জনে বিরোধ দেখা দেয় নি। আমিই দেখেছি ১৯৫৭ সনের ২ অক্টোবর প্রথম যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো নিয়ে অজয়বাবুতে সুশীলবাবুতে মতপার্থক্য। অজয়বাবু বললেন: আমি এই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গড়ব। সুশীলবাবুর সে প্রস্তাবটা মনঃপুত হল না। তিনি বললেন: দাদা এখনই ওটা করা উচিত হবে না। এখনই ও কাজ করলে ভুল করা হবে। অজয় বললেন না, আমি ওটা করবই। সব ঠিক করে ফেলেছি। তোমরা সঙ্গে আস আর নাই আস, আমি এগোবই। সুশীলবাবু অনেকক্ষণ তর্ক করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললেন: দাদা আমি মনে করি ওটা করা উচিত নয়। তবে, আপনি যখন মনে করছেন ওই পথেই যাওয়া উচিত তখন আমাকেও ওই পথেই যেতে হবে। আমি চিরকাল আপনার সঙ্গে থেকেছি। এখনও থাকব।

চলতি বছরের গোড়ার দিকেও দু'জনের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিল নির্বাচনী সমঝোতা এবং আসন রফার প্রশ্নে। অজয়বাবু চেয়েছিলন নব কংগ্রেস বাংলা কংগ্রেস এবং সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি জোটের মধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে একটা রফা করতে। সুশীলবাবু চেষ্টা করেছিলেন সব কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে প্রধানত তিন কংগ্রেসের একটা নির্বাচনী সমঝোতা করতে। শেষ পর্যন্ত কোনওটাই অবশ্য হল না। অজয়বাবু তাঁর লাইনে তেমনভাবে এগোতে ভরসা পেলন না। আর সুশীলবাবু তাঁর লাইনে আনার জন্য নব কংগ্রেসের উপর জোর চাপ দিতে গেলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল।

তাতেও কিন্তু অজয়বাবুতে সুশীলবাবুতে ফাটল ধরল না। নব-কংগ্রেসের সংঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের আসন রফার আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর একবার প্রধানমন্ত্রী কলকাতা এসেছিলেন। অজয়বাবুর সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন: অজয়বাবু, আপনার পার্টির সুশীল ধাড়া বড়লোকদের চাপে দু'দলে আসন রফা হতে দিল না বলে শুনলাম। অজয়বাবু জবাব দিয়েছিলেন: আপনার পার্টি তো শুনছি ইলেকশান ফাণ্ডে কলকাতার বড়লোকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলছে। এও তো শুনছি যে, আপনার পার্টির কিছু নেতা গোপনে সি পি আইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলা কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চাইছে।

অজয়বাবুতে সুশীলবাবুতে তখনও সেই দাদা-ভাই সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী সুশীল ধাড়া সম্পর্কে কটাক্ষ করায় অজয়বাবু তাই ভীষণ চটে গিয়েছিলেন।

সেই সম্পর্কে ফাটল ধরল নির্বাচনের ফলাফল বের হবার পর।

নির্বাচনী ফলাফল এমন দাঁড়াল যে, অজয়বাবুকে মুখ্যমন্ত্রী না করলে আর সি পি এম বিরোধী মন্ত্রীসভা হয় না। রাজ্যপাল গোপনে

অজয়বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। অন্যদিকে শুরু হল নব-কংগ্রেস, সি পি আই, ফরওয়ার্ড ব্লক এবং মুসলিম লীগের আলোচনা। তাও গোপনে। কয়েকজন সি পি আই এবং নব কংগ্রেস নেতা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে অত্যন্ত সন্তর্পণে দিল্লী ও কলকাতায় বসে কলকাঠি নেড়ে স্টেজটা তৈরী করলেন।

স্টেজে উঠেই কিন্তু অজয়বাবু দেখতে পেলেন, নব কংগ্রেস এবং সি পি আই তাঁর ভাই সুশীল ধাড়াকে কিছুতেই সেই স্টেজের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতে রাজী নন। তিনি প্রথমে একটু আপত্তি জানালেন। বললেন: সুশীলকে নেওয়া উচিত। মুসলিম লীগ যখন সাতে তিন মন্ত্রী পাচ্ছে তখন বাংলা কংগ্রেস পাঁচে দুই পাবে না কেন?

ওঁরা বললেন: না, সুশীল ধাড়াকে আমরা কিছুতেই নিতে রাজী নই। আপনাদের দলের দুজনকে মন্ত্রী করতে রাজী হলে তো সুশীল ধাড়াই মন্ত্রী হবে! তা হতে দেব না।

বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আসন রফার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকেই নব কংগ্রেসের নেতারা সুশীল ধাড়ার উপর ভীষণ চটে ছিলেন। সি পি আইয়ের রাগ তারও আগে থেকে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে সি পি আই আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা, সুশীল ধাড়াই জোর করে অত তাড়াতাড়ি সরকারটা ভেঙে দিলেন। সি পি আই তারপরও আশা করেছিলেন, অজয়বাবুর দল নির্বাচনে খোলাখুলিভাবে তাঁদের সঙ্গে জোট বাঁধবেন। সুশীলবাবু তাতেও ঘোরতর বাধা দিয়েছিলেন। নব কংগ্রেস এবং সি পি আই তাই প্রথম সুযোগেই বদলা নিতে চাইলেন।

বসল মন্ত্রিসভা গড়ার আনুষ্ঠানিক বৈঠক। অজয়বাবুর বাড়িতে। সেখানে কোয়ালিশনের সব পার্টিই উপস্থিত। বাংলা কংগ্রেস থেকে সুশীল ধাড়াও। নেপথ্যে আলোচনায় সবই ঠিক

হয়েছিল। তবু আনুষ্ঠানিক বৈঠকে ভাগাভাগির কথা এল। সবাই বললেন: বাংলা কংগ্রেস শুধু মুখ্যমন্ত্রিত্ব পাবে; আর কিছু নয়।

সুশীলবাবু বললেন: না, বাংলা কংগ্রেস থেকে আরও একজন মন্ত্রী নিতে হবে।

সি পি আই এবং নব কংগ্রেস খুব জোর দিয়ে বললেন: না। অন্যরাও তাঁদের সমর্থন করলেন।

সুশীলবাবু বললেন: তাহলে আমাদের পার্টিকে সমগ্র বিষয়টি আবার আলোচনা করতে হবে।

অজয়বাবু কিন্তু একটা কথাও বললেন না।

সুশীলবাবু বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

বৈঠক ভাঙল। আমি বৈঠকে উপস্থিত একজন বিশিষ্ট নেতাকে জিজ্ঞেস করলাম: সুশীল ধাড়া নাকি ওয়াক আউট করেছেন?

নেতা জবাব দিলেন: আত্মসম্মান থাকলে এর পরে আর বৈঠকে উপস্থিত থাকা যায় না। সকলেই আজ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সুশীল ধাড়াকে মন্ত্রিসভায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।

আমি বললাম: অজয়বাবু কী বললেন?

উনি জবাব দিলেন: কী আর বলবেন। পরিস্থিতি পরিষ্কার। মুখ্যমন্ত্রীত্ব, না সুশীল ধাড়া? উনি মুখ্যমন্ত্রিত্বই বেছে নেবেন।

জানতে চাইলাম: যদি অপমানিত বোধ করে সুশীল ধাড়া উল্টো দিকে যান? যদি সি পি এম-এর সঙ্গে গিয়ে হাত মেলান? যেমন অজয়বাবু একদিন অতুল্যবাবু প্রফুল্লবাবুকে জব্দ করার জন্য সব কংগ্রেস বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, সুশীল ধাড়াও যদি তেমন করেন তাহলে আপনাদের কী হবে?

নেতা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন: আমরাও তো তাই চাই। সুশীল ধাড়া যে প্রমোদ দাশগুপ্তের স্বার্থেই কাজ করেন আমরা তা প্রমাণ করতে চাই।

আমি বললাম : কিন্তু সুশীল ধাড়া কি অত কাঁচা লোক। সে সুযোগ কি তিনি আপনাদের দেবেন ?

নেতা বললেন : দেখাই যাক না, কে কাঁচা আর কে পাকা।

আজ তিন মাস পরেও সেই লড়াই চলছে—কে কাঁচা আর কে পাকা।

১৮ই জুন, ১৯৭১।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার সমাধান কোন্ পথে

সেদিন একটা বনিক সভার সভাপতি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ত্রিশ লক্ষ বেকার। এই খবরটা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই সভাপতি আশংকা প্রকাশ করেছেন যে, এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান না করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের কোনও মঙ্গল হতে পারে না।

কয়েকদিন আগে পার্লামেণ্টে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একজন মন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা এতটা সংকট-জনক যে, রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের শ' চারেক পদের জন্য দু লক্ষের বেশি আবেদন পড়েছে।

মাসখানেক হল পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরহীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ও তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেছিলেন যে এ রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সম্পর্কে আমি সচেতন! এই সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বোতোভাবে চেষ্টা করা হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের এত আশংকা, এত প্রতিশ্রুতি, এত দৃঢ় সংকল্প সত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সত্যিকারের উদ্যোগ এখনও কিছু হল না। একটার পর একটা সরকার আসছেন, তাঁরা সবাই প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবেই কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই হচ্ছে না, পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। শহরে বেকারি, গ্রামে বেকারি। শহরাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে চাকুরির খোঁজে পাগল। গ্রামাঞ্চলেও লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের খোঁজে, পেটের তাড়নায় দিশাহারা।

এমন যে সরকার পশ্চিমবঙ্গ চালাচ্ছেন তাঁরাও গত এক মাসের মধ্যে রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কোনও সুষ্ঠু পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। এই বিরাট বেকারি কীভাবে ঘোচাবেন, কীভাবে গ্রাম ও শহরের কর্মহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন সে সম্পর্কে কোনও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনাও তাঁদের সামনে নেই। তাঁরা সেই পুরানো ধারণা নিয়েই এগোচ্ছেন যে বন্ধ কল কারখানাগুলি খুলতে পারলে এবং আর কিছু নতুন বড় কলকারখানা চালু করতে পারলেই পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা অনেকটা লাঘব হবে, লক্ষ লক্ষ ছেলের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

নিশ্চয়ই বন্ধ কলকারখানাগুলি খুলতে পারলে নতুন কিছু বড় কলকারখানা চালু করতে পারলে লাখ তিনচার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু ওভাবে যে ত্রিশ লক্ষ বেকারকে কাজ দেওয়া যায় না, ওভাবে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন কৃষকের অর্ধ বা পূর্ণ বেকারির কোনও সমাধান হতে পারে না এটা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের কারোরই যেন মাথায় ঢুকছে না।

কেন তা হতে পারে না সেটা বুঝতে হলে অবশ্য কতকগুলি অপ্রিয় সত্যকেও মানতে হবে।

পশ্চিমবাংলার শিল্পজগৎ এবং শ্রমজগৎ দুটোই প্রধানত বাইরের লোকের নিয়ন্ত্রনে। ফলে যখনই এখানে কর্মস্থানের ব্যবস্থা হয় তখনই এরা প্রধানত বাইরের লোক এনে সেগুলি ভর্তি করেন। যতদিন পশ্চিমবঙ্গে শ্রম ও শিল্প-জগতের এই অবস্থা রয়েছে ততদিন এই অবস্থা অব্যাহত থাকবেই। এই অবস্থা আইন করে পাল্টানো যাবে না। কারণ, তেমন আইনই আইনত হতে পারে না। এই অবস্থা অনুরোধ উপরোধের মাধ্যমেও তেমন একটা পাল্টানো যাবে

না। কারণ, এর সঙ্গে ওই সব বাইরের লোকের স্বার্থ এমনভাবে জড়িত যে, নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারতে রাজি না হলে তাঁরা তা করতে পারে না।

ধরুণ, বাইরে শিল্পপতিদের ব্যাপারটা। তাঁদের নিজেদের লোকদের মধ্যেও তো বেকারি রয়েছে। সুতরাং নিজেদের লোকের বেকারি তাঁরা আগে ঘোচাবেন না অপরের বেকারী ঘোচাতে নিজেদের লোকদের বেকার রাখবেন? ইংরাজের এই সমস্যাটা ছিল না। তাই ইংরেজ যখন কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়েছে বা বাড়িয়েছে, তখন অফিসের নানা কাজে তাঁরা স্থানীয় লোককেই বেশি নিয়েছে। ফলে ইংরেজ পরিচালিত কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য নানা পর্যায়ে প্রচুর বাঙালী ছেলে চাকুরি পেয়েছে। কিন্তু এখন তা হয় না। কারণ, এখন যাঁরা পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ শিল্পবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁদের নিজস্ব লোকদের চাকুরি দেওয়ারও বড় তাগিদ আছে।

তাছাড়া আজকের শিল্প বাণিজ্য পরিচালনায় বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা খুব বেশি রয়েছে। কারণ, এখন যে সব বাইরের লোক পশ্চিমবাংলায় শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনা করেন, তাঁদের গোটা লেনদেন গোপনীয়তা এবং চুরি-জোচ্চরি ব্যাপারটা বিশেষভাবে জড়িত। সেটা একটা বড় অঙ্গ। এইসব কাজের জন্য তাঁদের নিজস্ব বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন। ভিন্ন জাতের, বিশেষ করে স্থানীয় লোকদের একাজে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। একজন মারওয়াড়ী কলকাতায় তাঁর ব্যবসার গোপন কাজের জন্য একজন মারওয়াড়ীকেই চাইবেন। কারবারটা পশ্চিমবাংলায় হলে তিনি একজন মাদ্রাজী-কেও নিতে পারেন, কিন্তু কারবারটা মাদ্রাজে হলে তিনি একজন মাদ্রাজীকে না নিয়ে বাঙালীকে নেওয়াটাই বেশি পছন্দ করবেন। কারণ, স্থানীয় লোকের মাধ্যমে কাজ করে গোপনীয়তা বজায় রাখা কঠিন।

তাই যেহেতু এখন এখানের শিল্প বাণিজ্যের প্রায় সবটাই বাইরের লোকের নিয়ন্ত্রণে; যেহেতু বেসরকারী পর্যায়ে সম্প্রসারণ হলেও প্রধানত তা এদের মাধ্যমেই হবে এবং যেহেতু এদের কারবারের অনেকটাই গোপন লীলাখেলা সেইহেতু এরা সেই কারবার চালনার ব্যাপারে স্থানীয় লোককে নিতে চাইবেন না। বর্তমান শিল্পবাণিজ্যে না, সম্প্রসারিত শিল্পবাণিজ্যেও না।

এ তো গেল অফিসের ব্যাপারটা অর্থাৎ শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থানের ব্যাপার। যদি নিচের দিকে আসেন তাহলে দেখবেন সেটাও বাইরের লোকের নিয়ন্ত্রণে। পশ্চিমবাংলার শ্রমজগৎও মূলত বাইরের লোকের কব্জায়। দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের শতকরা ৭০ ভাগের বেশিই বাইরের লোক।

এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা একই রকম। যেহেতু তাঁদের নিজস্ব এলাকাগুলিতেও বেকারি আছে, যেহেতু তাঁদের আত্মীয়-স্বজনেরও কাজ চাই, যেহেতু শ্রমজগতে তাঁরাই প্রধান, যেহেতু সেখানে তাঁদেরই কর্তৃত্ব বেশি, যেহেতু কোথাও কোনও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে সেটা তাঁরাই সকলের আগে জানতে পারে এবং যেহেতু ফিল্ডে থাকায় ধারক হওয়ারও তাদের বেশি সুযোগ। সুতরাং এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব লোকজনেরাই কাজের সুযোগ বেশি পায়।

আমাদের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই। আমরা যাঁরা পশ্চিমবাংলার শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা শিক্ষিত লোক, তাঁরা একদা কায়িক শ্রমের কাজ করতেই চাইতাম না সত্যি। কিন্তু জানতে পারি কি ভারতের অন্য কোন রাজ্যের এই শ্রেণীর লোক এমন কোন্ কায়িক শ্রমের কাজ করেছেন যেটা পশ্চিমবাংলার মানুষ করতে রাজি হয়নি? হাওড়ায় বহু বছর ধরে মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালীরা ইঞ্জিনীয়ারিং কল-কারখানায় কাজ করছেন। অন্য কটা রাজ্যে পঞ্চাশ বছর আগে

এইভাবে মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কলকাখানায় হাতের কাজ করেছেন ?

একেবারে গায়ে গতরে খাটার যে কাজ, সেটা আমাদের দেশের সব রাজ্যেই মূলত গ্রামের গরীব শ্রেণীর লোক করতে যান। পশ্চিমবাংলার গ্রামের গরীব মানুষ কোন্ গায়ে খাটার কাজটা করতে অরাজী যেটা অন্য রাজ্যের গ্রামের গরীব মানুষ করেন ?

বলতে পারেন তাহলে প্রথম প্রথম বাইরের লোক এসব কাজে এল কী করে ? এর বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রধান কারণ হল, বাংলার গ্রামাঞ্চলেই কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পে তখন যথেষ্ট কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল তাই তাঁরা শহরে কাজ খুঁজতে যান নি। এখন কাজ নেই তাই যাচ্ছেন। এখন দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং দক্ষিণ হাওড়ার বহু চটকলে বহু বাঙালী শ্রমিক আছেন।

প্রয়োজনে মানুষ অনেকটা পাল্টায়। একদা কলকাতা শহরে কাগজের হকারি করতেন সব বাইরের লোক। আদি কলকাতায় এ কাজ এখনও তাঁদের দখলে। কিন্তু নতুন কলকাতায়, অর্থাৎ পুরানো শহরের চতুর্দিকে যে নতুন কলকাতা গত কুড়ি বছরে বেড়েছে, সেখানে দেখবেন কাগজ বিক্রী করেন সব বাঙালীরাই। টালিগঞ্জে রোজ ভোরে দেখি কলেজে-পড়া স্কুলে-পড়া মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা কাগজ বিক্রী করছে। এ কাজ করতে তাঁদের এতটুকু কুণ্ঠা নেই।

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলেও ভয়াবহ বেকারি। এরাজ্যে ভূমিহীন চাষীরা বছরে ছ' মাসের বেশি বেকার থাকেন। ছোট বর্গাদারদের অবস্থাও এর চেয়ে তেমন ভাল নয়।

এ রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে গরীবদের মধ্যে পূর্ণ ও অর্ধ বেকারির প্রধানত চারটা কারণ। (১) ভূমি ব্যবস্থা। এখনও অল্প লোকের ব্যক্তিগত কব্জায় অধিকাংশ চাষের জমি। (২) চাষ ছাড়া অন্য হাতের কাজের অভাব। (৩) শহরের কাজে তাঁদের স্থান নেই।

শহরাঞ্চলের গায়ে গতরে খাটার কাজের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি বাইরের লোকের নিয়ন্ত্রণে। এবং (৪) বিভিন্ন পুলিস বাহিনী বা সেনাদলে এদের নেওয়া হয় না। অথচ, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব রাজ্যের গ্রামাঞ্চল থেকে পুলিশ বাহিনী ও সেনাদলের লোক নেওয়া হয়।

পশ্চিমবাংলার গ্রামের গরীবরা এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে। যেখানে বাস করেন সেখানে কাজ নেই। বাইরে গিয়েও কাজ সংগ্রহের সুযোগ নেই। এ রাজ্যের শহুরে বেকাররাও আজ ওই অবস্থায়ই পড়েছেন। যে রাজ্যে বাস করেন সেখানে কাজ নেই। বাইরে কেউ নিতে রাজি নয় কারণ 'নকশাল ভি হো সকতার' আতঙ্ক।

এগুলি আমাদের বেকার সমস্যার খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক। রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যা দূর করতে হলে এইসব বিষয় বিশেষ ভাবে ভাবতে হবে।

তাছাড়া আছে আর একটা ব্যাপার। ভারী শিল্প বা বড় শিল্প গড়ে লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হলে কত সহস্র কোটি টাকা প্রয়োজন! অত টাকা জুটবে কোথা থেকে ?

দুর্গাপুরে একটা বড় কারখানা আছে। দু কোটি টাকা খরচায় তৈরী। মাত্র আশিজন শ্রমিক প্রয়োজন সেই কারখানায়। সুতরাং ভারী শিল্প খুলে আমাদের ভয়াবহ বেকার সমস্যার তেমন কোনও সুরাহার কথা ভাবাও মুর্খামি।

এ রাজ্যের বেকার সমস্যা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হলে বহু দিক ভেবে এগোতে হবে। তার জন্য সর্বাগ্রে চাই একটা সার্বিক পরিকল্পনা। গ্রাম এবং শহরের সব সমস্যা, আশপাশের রাজ্যগুলির অবস্থা এবং শিল্প বাণিজ্য ও

শ্রমে বাইরের লোকের নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবে সেই পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। একটা সার্বিক সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া শুধু বড় বড় কথা বলে এবং কয়েক শ' কোটি টাকা যেন তেন প্রকারেণ খরচা করে কেউ পশ্চিমবাংলার বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না।

তাই, সব কিছুর আগে অবিলম্বে এ জন্য একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে খুব দ্রুত কাজ আরম্ভ করতেই হবে। শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না। অন্ধকারে ঢিল মারলেও ফল মিলবে না।

৬ আগস্ট, ১৯৭১।

নব কংগ্রেসের নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব

রাজনীতির এক নিষ্ঠুর পরিণতি, চার বছর আগে রাজ্যের যে সব কংগ্রেসী নেতা অতুল্য ঘোষকে জব্দ করার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গে এ্যাডহক কংগ্রেস চেয়েছিলেন, আজ তাঁদের অনেককে জব্দ করার জন্যই নবকংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই রাজ্যে নতুন এ্যাডহক কংগ্রেস করেছেন। অদৃষ্টের কী পরিহাস, যাঁরা সেদিন চিৎকার করে বলেছিলেন এ্যাডহক না করলে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসে নতুন প্রাণ আনা যাবে না, গোষ্ঠীতন্ত্রের কবলমুক্ত করে পার্টির নতুন ভাবমূর্তি গড়া সম্ভব হবে না আজ তাঁদেরই প্রকাশ্যে এবং গোপনে কেঁদে কেঁদে বলতে হচ্ছে: এ কি অবিচার! একি একনায়কত্ব! এ কি সর্বনাশা চক্রান্ত! ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বাসনা চরিতার্থ করার জন্য দলের মূলে কুঠারাঘাত করে এ কি প্রতিহিংসাপরায়ণতা!

হায়, আজ কেউ তাঁদের এই ক্রন্দনে কর্ণপাত করবে না। তাঁরা কেঁদে কেঁদে গলা ফাটালেও কর্তৃপক্ষের হৃদয় এতটুকু গলবে না। কর্তৃপক্ষ ঠিকই করে ফেলেছেন কয়েকজনকে এবার বিদায় করে দেবেন। কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত আগেই নিয়ে রেখেছেন যে, নতুন গোষ্ঠীর হাতে প্রদেশ কংগ্রেসের অনেকটা তুলে দেবেন। কর্তৃপক্ষ আগেই হিসাব করে দেখেছেন যে, বেশি কেউ বিদ্রোহ করতে সাহস পাবে না। কর্তৃপক্ষ এটাও অনুমান করে নিয়েছেন যে, যতদিন কেন্দ্রে ক্ষমতা অটুট রয়েছে ততদিন নির্বাচনের টিকিট-লোভাতুররা দল ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না।

কর্তৃপক্ষ এই নতুন এ্যাডহক ঘোষণা করার আগে অবস্থাটা কিছুটা বাজিয়ে দেখেননি সেটা মনে করাও ভুল হবে। কলকাতায় অন্তত সাত-আটজন লোক জানতেন কি আসছে। তাঁদের মতামতও

নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা প্রকাশ্যে সে সব কথা কাউকে বলেন নি। প্রকাশ্যে বরং এমন একটা ভাব দেখিয়েছেন যে, তাঁদের আনুগত্য উল্টো দিকে। অর্থাৎ যাঁদের বিদায় করার জন্য এই ব্যবস্থা তাঁরা তাঁদেরই পক্ষে। সেই ভাবেই তাঁরা তাঁদের সমর্থনটাও আদায় করেছেন। আবার গোপনে বসে এ্যাডহকের তালিকাটাও প্রস্তুত করেছেন। কর্তৃপক্ষ তাই পরিস্থিতিটা জানেন। আগেই সব যাচাই করে নিয়েছেন। এবং বুঝে নিয়েছেন যে, যিনি যতই কাঁদুন বা চিৎকার করুন বিদ্রোহ করতে তেমন ভরসা পাবেন না। দু-একজন যদি বিদ্রোহ করেনও তাঁদের সঙ্গে বেশি কেউ যাবেন না।

কর্তৃপক্ষ হিসাব করেই এ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের (নব) নেতৃত্ব সম্পর্কে দলের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা খুব পরিষ্কার। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর। তিনি মনে করেন, এঁরা অনেকেই সুযোগসন্ধানী, আদর্শের কোনও বালাই নেই, সমাজতন্ত্রে কোনও বিশ্বাস নেই। প্রধানত ক্ষমতার লোভে এঁরা তাঁর সঙ্গে এসেছেন। যদিও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এঁরা মূলত আদি কংগ্রেসী। প্রধানমন্ত্রী তাই শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এবার তাঁদের বেশ কয়েকজনকে তিনি দল থেকে সরিয়ে দেবেন।

প্রধানমন্ত্রী চান, অপেক্ষাকৃত তরুণদের হাতে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর লোকের হাতে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব তুলে দিতে। তিনি তাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে পশ্চিমবঙ্গ নব কংগ্রেসের সভাপতি করতে চেয়েছিলেন। দেবীবাবু দলের ছাত্র ও যুবকদের নেতা। প্রধানমন্ত্রী তাই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের 'সর্বসম্মত প্রার্থী' তরুণকান্তি ঘোষের নাম বাতিল করে দিয়ে দেবীবাবুকে সভাপতি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দেবীবাবুকে তিনি এমন আশ্বাসও

দিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে দলকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য যে যে সাহায্য প্রয়োজন তা সব দেবেন।

কিন্তু তবু হল না। দেবীবাবু দুটো ভুল করলেন। প্রথমত, তিনি ভ্যাসিলেট করলেন। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন পাওয়ার পর যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোনো উচিত ছিল, এগোতে পারলেন না। দ্বিতীয়ত তিনি জেলা কমিটির সভাপতি সম্পাদকদের কনসেনসাস-বৈঠকের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। ওই বৈঠকে যে দেবীবাবুর পক্ষে মতামত যাবে না, যাবে উল্টো দিকে, সেটা সবাই জানত। কিন্তু তবু দেবীবাবু ওই বৈঠকে রাজী হয়ে গেলেন। যাঁদের আশ্বাসে তিনি ওই বৈঠকে রাজী হয়েছিলেন, তাঁদেরই কেউ কেউ কিন্তু মনে প্রাণে তাঁকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি করার প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। এই সুযোগটা তাঁরা নিলেন। সরাসরি ভাবে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের বিরোধিতা না করেও তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, অধিকাংশ জেলা নেতা দেবীবাবুকে চান না।

তাঁরা আগে থেকেই জানতেন দেবীবাবুর নাম গৃহীত না হলে এ্যাডহক আসবেই। তাঁরা এও জানতেন, জেলার নেতাদের বৈঠক হলে দেবীবাবুর নামে কনসেনসাস হবে না। এবং তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে আরও জানতেন যে, একবার কোনও ব্যাপক বৈঠকে দেবীবাবুর নাম প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেলে তারপর এ্যাডহক করলেও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর দেবীবাবুকে প্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান করতে পারবেন না। তাঁরা তাই সেইভাবেই দেবীবাবুকে এবং তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষকে ফাঁদে ফেললেন।

এই ছোট্ট গোষ্ঠীটি এক ঢিলে দু পাখি মারলেন। তাঁরা একদিকে দলের ভিতরের পুরানো শক্তিশালী গোষ্ঠীকেও খর্ব করলেন; আর একদিকে দেবীবাবুকেও সভাপতি হতে দিলেন না। এখন তাঁরা চাইছেন দলের ভেতরে দুটো গোষ্ঠীর বিরোধ জিইয়ে রাখতে। তাঁরা চাইছেন যাতে দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ছাত্র ও যুব গোষ্ঠীর

প্রতিনিয়ত বিরোধ লেগে থাকে। এবং সেই সুযোগে তাঁরা এ রাজ্যে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করতে পারেন।

দেবীবাবু সম্পর্কে তাঁদের প্রধান শংকার কারণ ছিল এই যে, ওই ভদ্রলোক প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হলে দিল্লীতে পশ্চিমবাংলার আর একজন প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে যায়। এতে তাঁদের ঘোরতর আপত্তি। এই সুযোগ তাঁরা আপাতত কাউকে দিতে চান না। তাঁরা জানেন, তরুণকান্তি ঘোষ বা আব্দুস সাত্তারে সে ভয় নেই। কারণ দিল্লীতে তাঁদের খুঁটি বা ইমেজ নেই। তাই তাঁরা কৌশলে দেবীবাবুকে সরালেন এবং তরুণবাবুকে না আনতে পারলেও সাত্তার সাহেবকে নিয়ে এলেন।

এই পরিস্থিতিতে কে কীভাবে কার স্বার্থ কতটা রক্ষা করতে পারবেন জানি না, কিন্তু এটা খুব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গে নব কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠছে না। বিগত নির্বাচনে আশাতীত সাফল্যের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বহু নব কংগ্রেস নেতার ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, আগামী নির্বাচনের পরই তাঁরা এ রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন, তাঁদের দল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। সেই ধারণা হওয়ার পর থেকেই দলে নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। নেতাদের তাই দল গড়ার চেয়ে নেতৃত্ব দখলে রাখার দিকে নজর বেশি। দলের কাছাকাছি যে হাজার হাজার ছাত্র ও যুবক এসেছে তাঁদের সঠিক রাজনৈতিক পথে সংগঠিত করারও তেমন কোনও চেষ্টা নেতাদের নেই। তাঁদের অধিকাংশই বরং এই ছাত্র ও যুবকদের নানাভাবে খুশি রেখে নিজেদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধিতেই বেশি আগ্রহী।

কিন্তু এ জিনিসটা বোধহয় এ রাজ্যের বহু নব কংগ্রেসীই বুঝতে

পারেন নি যে, শুধু ইন্দিরা গান্ধীর নামের যাদুতে পশ্চিমবঙ্গে সব মুশকিল আসান হবে না। এখানে আসন পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি, চাই নিজস্ব ভদ্র ও জনদরদী ইমেজ এবং চাই রাজনৈতিক সততা। অধিকাংশ নব কংগ্রেসীই আর একটা জিনিস ভুলে যান। তাঁরা ভুলে যান যে, এ রাজ্যে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ জন সংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি বা আদি কংগ্রেস নয়—এখানে তাঁদের প্রধান বিরোধী শক্তি সি পি এম।

১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

অবাধ নির্বাচনের বাধা কি কেবল সন্ত্রাস? জাল ভোট নয়?

'অবাধ নির্বাচন' কথাটা এবার পশ্চিমবঙ্গে খুব উঠেছে। প্রায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই বলছেন, অবাধ নির্বাচন চাই—অর্থাৎ ভোটদাতারা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, যাতে ভোটে জনসাধারণের স্বাধীন রায় সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, যাতে প্রার্থীরা এবং প্রার্থীদের সমর্থকরা বিনা বাধায় প্রচার চালাতে পারেন এবং সেই রকম একটা অবস্থা চাই।

অবাধ নির্বাচনের সুযোগ নেই, এই অভিযোগটা এবার সর্বপ্রথম তুলেছেন সি পি এম! তোলা স্বাভাবিক কারণ এ রাজ্যের নির্বাচন প্রার্থী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে তাঁরাই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় পুজারী। মারামারি, খুনোখুনি এবং ভীতি প্রদর্শনের পথকে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন। মানুষ যাতে স্বাধীন ভাবে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে এবং জনসাধারনের স্বাধীন মতামত যাতে ভোট বাকসে প্রতিফলিত হতে পারে সেজন্য সি পি এম নেতারাই সর্বাধিক আগ্রহী।

তাই এবার গোড়া থেকেই সি পি এম নেতারা অবাধ নির্বাচনের দাবি তুলেছেন। তাঁদের প্রতিনিধি দল দিল্লী গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তারা মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের কাছে দরবার করেছেন। এবং মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে তাঁদের অধিকাংশ অভিযোগ অসত্য বলে যাওয়ার পরও ছাড়েন নি। এখনও বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে অবাধ নির্বাচনের সুযোগ নেই। কংগ্রেসীরা প্রচণ্ড সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

কিন্তু শুধু সি পি এমই বলবে আর কেউ কিছু বলবে না তা তো

হতে পারে না। অন্যরাও সি পি এম-এর বিরুদ্ধে বলছেন। কংগ্রেস ও সি পি আই দু পার্টিই বলছেন: সি পি এম হেরে যাবে মনে করেই এবং নিজেদের সন্ত্রাসকে চাপা দেওয়ার জন্যই কংগ্রেসী সন্ত্রাসের ধুয়া তুলতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এমই মারামারি খুনোখুনি এনেছিল, প্রধানত ওরাই আজও মারামারি খুনোখুনি চালাচ্ছে।

তবে এবার এ ব্যাপারে সি পি এম-এর একটা সুবিধা আছে গত নির্বাচনেও অর্থাৎ একবছর আগেও যে সব দল তাঁদের বিরুদ্ধে গুণ্ডামী এবং খুনোখুনির অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ সি পি এম-এর সঙ্গে। সুতরাং তাঁরা আর এবার সি পি এম-এর বিরুদ্ধে গুণ্ডামীর অভিযোগ তুলছেন না। তাঁরা বরং সি পি এম-এর সঙ্গে একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছেন।

আমার আজকের আলোচ্য বিষয় অবশ্য মারামারি খুনোখুনি নয়। কারণ, ১৯৬৭ সন থেকে এ নিয়ে বহু আলোচনা করে দেখা গিয়েছে ফল হয় না—যারা মারামারি করার তারা মারামারি খুনোখুনি চালাবেই। আমি আপনি যাই মনে করি না কেন রাজনৈতিক দলগুলি মারামারি খুনোখুনি করবেই—যতক্ষণ না মারামারি খুনোখুনি কবার ক্ষমতা তাদের লোপ পাচ্ছে। ১৯৬৭ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গে যে মারামারি খুনোখুনির রাজনীতি এসেছে তা আজও একেবারে বন্ধ হয় নি। এখনও প্রায় প্রতিদিনই পশ্চিমবঙ্গের কোথাও না কোথাও রাজনৈতিক মারামারি খুনোখুনি হচ্ছে। এবং উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ দলই এই মারামারি খুনোখুনিতে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা পরিবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা না একটা ছেলের প্রাণ যাচ্ছে। কিন্তু তবু মারামারি খুনোখুনি থামছে না। তবু নেতাদের চৈতন্যোদয় হচ্ছে না।

খুনোখুনি মারামারি থামবে কি থামবে না সেটা অনেকটা

নির্ভর করবে নির্বাচনের ফলাফলের উপর। তবে, একটা জিনিস বোধহয় এখন থেকেই আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার থাকা ভাল যে এবারের নির্বাচনের পর যদি মারামারি খুনোখুনির রাজনীতি ব্যাপক হয়, তাহলে তা প্রচণ্ড আকার নেবে। এবং সম্ভবত সেই জন্যই এখন থেকে আবার পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় সৈন্য এবং সি আর পি মজুত করে রাখা হচ্ছে। যে সরকারই আসুন এই সৈন্য এবং সি আর পি আপাতত এখানে থাকবেই।

আগেই বলেছি আজকের আলোচ্য বিষয় মারামারি খুনোখুনি নয়, আজকের আলোচ্য বিষয় অবাধ ও স্বাধীন নির্বাচন।

কেউ কেউ বলছেন, সন্ত্রাস চলছে, তাই কেন্দ্রে অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয়। সন্ত্রাস চললে যে অবাধ নির্বাচন হতে পারে না সে কথাটা ঠিকই। সন্ত্রাস চললে ভোটদাতারা ভয় পান, প্রার্থীরা ভয় পান এবং কর্মীরাও ভয় পান। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার দুটো প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন, সন্ত্রাস কি শুধু এইবারই হয়েছে—১৯৬৯ বা ১৯৭০-এ সন্ত্রাস বা মারামারি খুনোখুনি ছিল না? ১৯৭০ সনে বৃহত্তর কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক পার্টিগত জোন ছিল না? তাহলে এবার যাঁরা সন্ত্রাসের কথা তুলে ত্রাহি রব ছাড়লেন সেবার তাঁরা সন্ত্রাসের কথা তোলেন নি কেন? আর, সন্ত্রাস কি এখানে কোনও এক পক্ষীয় ব্যাপার?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অবাধ বা স্বাধীন নির্বাচন কি শুধু সন্ত্রাসেই ব্যাহত হয়? জাল ভোট বা গণনার কারচুপিতে কি অবাধ বা স্বাধীন নির্বাচন ব্যাহত হয় না?

এই ব্যাপারটা বোধহয় একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। অবাধ বা স্বাধীন নির্বাচন মানে কি? এক কথায়, যেখানে

ভোটদাতারা সব প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা, গুণাগুণ, প্ল্যান-পরিকল্পনা স্বাধীনভাবে বিবেচনা করে বিনা বাধায় ভোট দিতে পারবে সেইটাই স্বাধীন নির্বাচন।

ধরুন তা হল। ধরুন একটা কেন্দ্রের ৯০ হাজার ভোটদাতার মধ্যে ৪০ হাজার ভোটারই এই রকম স্বাধীনভাবে এবং অবাধে ভোট দিলেন। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা গেল ওই ৪০ হাজার নির্ভেজাল ও আসল ভোটছাড়াও ওই কেন্দ্রে আরও ১০ হাজার ব্যালট পেপার বাক্সে পড়েছে। অর্থাৎ ১০ হাজার জাল ভোট দেওয়া হল—কিছু পড়ল প্রক্সি এবং কিছু ব্যালট পেপারে স্রেফ ছাপ মেরেই বাক্সে ফেলা হল।

এই ১০ হাজার জাল ভোটকে আপনি কী বলবেন? অবাধ স্বাধীন ভোট? জনসাধারনের ইচ্ছার প্রকৃত প্রকাশ? এই ভোট কী চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করবে না? ৪০ হাজার আসল এবং ১০ হাজার ভেজাল মিলে যে ফলাফল প্রকাশিত হয় সেইটার ওপর ভিত্তি করেই তো বিধানসভা গঠিত হয় এবং সেই হিসাবেই তো সরকার হয়। তাহলে এই সরকারকে কি অবাধ নির্বাচনে গঠিত সরকার বলা চলে?

জাল ভোট যে পড়ে এটা কেউই অস্বীকার করেন না তবে যাঁরা জাল ভোট দেন বা জাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাঁরা কেউই নিজেদের ব্যাপারটা স্বীকার করেন না। সবাই বলেন, আমি জাল ভোট দিই না, ও দেয়।

কিন্তু নিরপেক্ষ প্রত্যেক পর্যবেক্ষকই স্বীকার করতে বাধ্য যে, পশ্চিমঙ্গের নির্বাচনে এখন প্রচুর জাল ভোট পড়ে। ১৯৫২ থেকেই জাল ভোট চলছে। তবে এখন যত ব্যাপক ভাবে জাল ভোট চলে আগে তা চলত না—আগে তা অভাবনীয় ছিল। আগে ছিল শুধু প্রক্সি। এখন তার উপর এসেছে স্রেফ ছাপ মেরে ব্যালট পেপার বাক্সে ফেলা। প্রক্সি দিতে অন্তত কিছু লোক

লাগে। আর ছাপ মেরে ব্যালট পেপার বাকসে ফেলার ব্যাপারে একটা হাতই যথেষ্ট।

এই জাল ভোট জিনিসটার প্রতিবাদ আজ পর্যন্ত রাজ্যের কজন নেতা করেছেন? জাল ভোট যাতে না হতে পারে বা ছাপ মারা ব্যাপারটা যাতে বন্ধ হয়, সেজন্য কজন নেতা সচেষ্ট হয়েছেন? কেউ শুনেছেন আজ পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গের কোনও বড় রাজনৈতিক নেতা জাল ভোটের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও প্রস্তাব দিয়েছেন?

এই জাল ভোটের উপর চলে আবার গণনার কারচুপি। রামের ব্যালট পেপার শ্যামের ভাগে দিয়ে গণনা করা হয়। এটাও যে একটা পরিকল্পনা অনুসারে করা হয় একাধিক ক্ষেত্রে তা দেখা গিয়েছে।

এটা বন্ধ করার জন্যই বা রাজ্যের কজন নেতা, কটা পার্টি আজ পর্যন্ত সচেষ্ট হয়েছেন।

বরং অনেক রাজনৈতিক দলই দেখি সবচেয়ে আগে জাল ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ওটা এখন ভোট যুদ্ধের একটা বড় অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

আসল কথাটা কি জানেন, আসল কথাটা হল—আমার কিসে সুবিধা হবে! যখন যাতে যে রাজনৈতিক দলের সুবিধা তখন সেইটা সম্পর্কে তিনি বোবা বনে যাবেন। যখন যেটায় যার অসুবিধা হয় তখন তিনি সেইটা নিয়ে ত্রাহি রব ছাড়েন।

আসলে অবাধ নির্বাচন নিয়ে খুব কম দল মাথা ঘামায়। আসল কথা হল, আমি কিসে জিততে পারব। আমার জয়ের পথে যদি কোনও অসুবিধা দেখা দেয় আমি সেইটা নিয়ে চিৎকার করব। আর আমার জয়ের জন্য সব খারাপ ব্যাপারই ভাল।

ভোট ব্যাপারটা আর কিছু না করুক আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির মুখোশ অনেকটা খুলে দিয়েছে। ভোটের জন্য অর্থাৎ গদির জন্য অনেকেই এখানে কী পরিমাণ জালিয়াতি, সাম্প্রদায়িকতা এবং মিথ্যাচার করতে পারে জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে তা বুঝতে পারছেন। আজ হয়ত তাঁরা মারদাঙ্গার ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেন না—কিন্তু পরিস্থিতিটা বুঝতে তাঁদের বাকি নেই।

২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

বাংলাদেশ নিয়ে সি পি এম-এর মুখে কার কণ্ঠস্বর?

নয় মাসের এতবড় মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেল, শেষ হয়ে গেল ইয়াহিয়া খানের শেষ যুদ্ধও, স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকারের বয়সও আজ প্রায় চার মাস—কিন্তু এতদিনেও বোঝা গেল না বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে সি পি এম ঠিক কী বলতে চায়। এ ব্যাপারে যতই ওঁদের বক্তব্য শুনি, যত বেশি ওঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি পড়ি ততই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই—ততই ব্যাপারটা রহস্যজনক ও অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়।

সি পি এম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করেনি এমন নয়। সি পি এম গোড়া থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে বলেছে। যদিও প্রথম দিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে 'মুক্তি যুদ্ধ' বলতে সি পি এম এর ঘোরতর আপত্তি ছিল।

সি পি এম আসলে সবচেয়ে বিচিত্র এবং বিদঘুটে সব কথা বলেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের ভূমিকা নিয়ে বরাবর তারা চেষ্টা করেছে এই জিনিসটাকে ছোট করে দেখতে। বরাবর বলেছে, ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য তো দিচ্ছেই না, বরং তার ক্ষতি করছে।

এখনও এ ব্যাপারে সি পি এম-এর বক্তব্য পরিষ্কার হল না। শোনা গেল, নির্বাচনের পর পার্টির পলিটব্যুরো বুঝেছেন যে, এ ব্যাপারে তাঁরা যে সব কথাবার্তা বলেছেন তা ঠিক বলা হয় নি। আরও শোনা গেল এবার থেকে সি পি এম এ সম্পর্কে তার ত্রুটি স্বীকার করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, না, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকার ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে সি পি এম তার বক্তব্য মোটেই পাল্টায় নি।

পলিটব্যুরোর পরই হল পার্টির রাজ্য কমিটির বৈঠক। সেই বৈঠকের পর সি পি এম নেতারা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পার্টির বিভিন্ন বক্তব্য জানালেন। তার মধ্যেই এল বাংলাদেশের কথা—নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রভাব প্রসঙ্গ। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বললেন: 'ইন্দিরা—হাওয়ার' কথাটাই বাজে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে হাওয়া; সেটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই গিয়েছে। কারণ কংগ্রেসের কোনও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐতিহ্য নেই। কংগ্রেস সরকার প্রথমে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দিতে চায়নি। আমরাই প্রথম বাংলাদেশ নিয়ে আন্দোলন করি। আমাদের আন্দোলনের চাপেই ইন্দিরা সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। বাংলা দেশের হাওয়া তাই কংগ্রেসের পক্ষে যেতেই পারে না। যায়ও নি।

এর পরই আসুন আর এক সি পি এম নেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে। শ্রীনীরেন ঘোষ এই সেদিন রাজ্য সভায় বলেছেন: বাংলাদেশকে সাহায্যদানের ব্যাপারে ভারতের সব কথাই ভান মাত্র। কারণ, যে সমস্ত শরণার্থী ফিরে গিয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যে সাহায্য দিয়েছেন তা বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না। ২০ কোটি টাকার পাট ভারতে পাচার হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ভারত যে সব অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে তা যুদ্ধের পুরস্কার হিসাবে নিয়ে গিয়েছে।

মনে করার কোন কারণ নেই যে, সি পি এম নেতারা না ভেবেচিন্তে কথাগুলি বলেছেন। ইন্দিরা গান্ধী ভারত সরকার বাংলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে কিছু করেছেন সেটা মোটেই স্বেচ্ছায় করেন নি, করেছেন সি পি এম—এরই চাপে—প্রমোদবাবু স্বজ্ঞানেই এই কথাগুলি বলেছেন। নীরেনবাবুও নিশ্চয়ই পূর্ণজ্ঞানেই বলেছেন যে, বাংলাদেশকে সাহায্যদানের কথা ভারতের ভান মাত্র; বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য যেসব জিনিসপত্র দিয়েছে ভারত সেগুলি মেরে দিচ্ছে।

যদি কোনও পাগল বা অবোধ বালক এসব কথা বলত তাহলে ধরে নেওয়া যেত প্রলাপ বকছে বা না বুঝেসুঝে বলছে। এক্ষেত্রে তেমনভাবে কথাগুলি উড়িয়ে দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। দুজন বিশিষ্ট নেতা স্বজ্ঞানে কথাগুলি বলেছেন। একজন বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে আর একজন সংসদে। দুজনেই অনেক কিছু জানেন, অনেক খবরাখবর রাখেন। এবং অনেক জেনেশুনেও তাঁরা কথাগুলি বলেছেন।

তাই মনে হয়, ব্যাপারটা রহস্যজনক এবং অত্যন্ত জটিল।

যদি আরও পিছনের দিকে তাকান তাহলে ব্যাপারটা আরও রহস্যজনক মনে হবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকেই ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। একদিকে দায়িত্ব নিল প্রায় এককোটি শরণার্থীর, আর একদিকে পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুক্তিযোদ্ধাদের। ট্রেনিং দেওয়া হল, লোকজন দেওয়া হল, ট্রাক ট্রাক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হল, কোটি কোটি টাকা দেওয়া হল। একটা দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনামত বাংলা দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে নামল ভারত সরকার।

এর কোনও কিছুই ভারত সরকার তখনও বলতে পারে নি, এখনও বলতে পারে না। কিন্তু এত বিরাট ব্যাপার কি আর একেবারে গোপন রাখা যায়। কিছুটা কিছুটা অনেকেই জানতে পারলেন। জানতে পারলেন সি পি এমও। সীমান্তে সি পি এম-এর লোক আছে। সুতরাং না জানার কোনও কারণ নেই।

তবু সি পি এম বলে চলল, ভারত সরকার বাংলাদেশের সমর্থনে কিছুই করছে না। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করার কোনও ইচ্ছাই ইন্দিরা গান্ধীর নেই।

বাস্তব অবস্থা অনেকটা জেনেও কেন এই কথা বলেছিল সি পি এম? একটা উদ্দেশ্য হতে পারে, জনতাকে বিভ্রান্ত করা, সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা। আর একটা উদ্দেশ্য হতে পারে, ভারত সরকারকে প্রকাশ্যে স্বীকার করতে বাধ্য করা যে, ভারত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্যে করছে। এই জিনিসটা তখন পাকিস্তান ও আমেরিকা বিশেষভাবে চাইছিল।

আমি আর একটা মাত্র উদাহরণ দেব। মৌলানা ভাসানী আসাম হয়ে কলকাতা এলেন। ভারতে পদার্পণ করা মাত্রই তিনি সরকারী অতিথি। কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটে এক বিরাট খোলামেলা ফ্ল্যাট ভাড়া করা হল মৌলানা সাহেবের জন্য। মৌলানা সাহেব বললেন: আমি এখানে হইচই করতে আসি নি। আমি যার তার সঙ্গে দেখা করতেও আসি নি। আমি চাই ভারত সরকার আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করুন। লড়াইয়ে অনভিজ্ঞ নিরস্ত্র মানুষ সশস্ত্র পশুর সঙ্গে লড়াইয়ে পারবে না।

মৌলানা সাহেব আমাকে বলেছেন, দেশত্যাগের আগে তিন জন তাঁকে ভারতে যেতে বারণ করেছিলেন। একজন ঢাকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত, আর একজন ঢাকার চীনা রাষ্ট্রদূত এবং তৃতীয়জন মহম্মদ তোহা। মৌলানা সাহেব কলকাতা চলে আসার পরও 'উদ্যোগী' ব্যক্তিরা আশা ছাড়লেন না। তাঁরা কলকাতায়ও তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা শুরু করলেন। কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। তারপরই কলকাতায় একটা গুঞ্জন ছড়িয়ে দেওয়া হল: মৌলানা ভাসানীকে ভারত সরকার গ্রেফতার করে রেখেছে। এই প্রচার সবচেয়ে বেশি করে শুরু করলেন কলকাতায় মার্কিনী প্রভাবিত কয়েকজন ব্যক্তি।

কিন্তু এই প্রচারটি সবচেয়ে বেশি করে লুফে নিল কারা? সি পি এম। সি পি এম নেতা শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বিষয়টাকে বিধানসভায় পর্যন্ত তুললেন। এবং তারপর থেকে মৌলানা ভাসানী

দেশে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত একটানা প্রচার চলল : ভাসানীকে ভারত সরকার গ্রেফতার করে রেখেছে।

স্বয়ং ভাসানী সাহেব এ সম্পর্কে এখন কী বলেন? সম্প্রতি ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেছেন : রটানো হচ্ছে ইণ্ডিয়ায় আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। একদম মিথ্যা কথা। আমাকে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার পরম আদর এবং সসম্মানে রেখেছিলেন। আমার ওপর কোনও রকম বাধা-নিষেধ ছিল না।

সি পি এম নেতারা কিন্তু এখনও স্বীকার করেন নি যে, তাঁরা ভারত সরকার এবং মৌলানা ভাসানীর নামে একটা জঘন্য কুৎসা রটিয়েছিলেন।

কিন্তু ওইসব জিনিসের চেয়েও মারাত্মক হল নীরেনবাবুর বক্তব্যটি। একেবারে সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশকে সাহায্যদানের ব্যাপারে ভারতের সব কথাই ভান মাত্র। বিভিন্ন দেশ বাংলা দেশের শরণার্থীদের জন্য যে সাহায্য দিয়েছে ভারত তা মেরে দিয়েছে।

কখন নীরেনবাবু বলেছেন এই কথাগুলি? না যখন বাংলাদেশে একটা ছোট্ট প্রো-মার্কিনী ও প্রো-পাকিস্তানী গোষ্ঠী ভারত বিরোধী প্রচার ব্যাপক করে তুলতে চাইছে। ঠিক তখনই তিনি সংসদে এমন একটা কথা বললেন, যেটা তাদের প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করবে।

এবং এমন একটা কথা বললেন, যেটা তিনি নিজেও নিশ্চয়ই জানেন মোটেই সত্য নয়। বাংলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য, বাংলা দেশের শরণার্থীদের জন্য ভারত কত শত কোটি টাকা খরচা করেছে, আর কত টাকা এসেছে বিদেশ থেকে নীরেনবাবু এমন একজন এম পি হয়ে তা জানেন না? নীরেনবাবু তো একজন কমিউনিস্ট। খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি পৃথিবীর কটা কমিউনিস্ট দেশ বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ক'টাকা দিয়েছে? খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি বিশ্বের সব চেয়ে ধনী রাষ্ট্র আমেরিকা কত টাকা দিয়েছে বাংলার

শরণার্থীদের সাহায্যে? এবং সেই সঙ্গে তিনি তুলনা করবেন কি দরিদ্র ভারত কী করেছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্য করতে গিয়েই যে ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল শ্রীঘোষ তা বোঝেন না?

নীরেনবাবু কি এটাও জানেন না যে, বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার পরদিন থেকে ভারত সরকার নানা জিনিসপত্র দিয়ে বাংলার নতুন সরকারকে কী ভাবে সাহায্য করছে? রাজস্থান এবং ওড়িশার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েও যে আজ ভারত সরকার বাংলাদেশে চাল ও গম পাঠাচ্ছে সি পি এম সে খবর রাখে না?

বিশ্বাসই করতে পারছি না নীরেনবাবু এবং তাঁর দল এসব জানেন না বা বোঝেন না। তাহলে তিনি এবং তাঁরা এসব কথা বলছেন কেন?'

সি পি এম-এর আসল উদ্দেশ্যটা কী?

১৪ এপ্রিল, ১৯৭২।

কংগ্রেস দলে অবাঞ্ছিতের অনুপ্রবেশ

গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের একবার প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্যন্ত তার ফল কী হতে পারে আশা করি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা এতদিনে তা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন। তাঁদের প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আজ পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস এবং ছাত্র পরিষদের সামনে একটা বড় সমস্যা হল অবাঞ্ছিতদের দৌরাত্ম্য থেকে সংগঠনকে রক্ষা করা,—যাতে তারাই না বিভিন্ন ধাপে সংগঠনটা দখল করে বসতে পারে, যাতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে মারপিট করে তারা না দলের নাম ডুবিয়ে দেয় এবং যাতে কংগ্রেসের নামে জোর-জুলুম করে 'চাঁদা' তুলে তারা না সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে।

মস্তানরা একবার প্রশ্রয় পেলেই যে মাথায় চেপে বসতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত যাঁরা প্রশ্রয় দেন, তাঁদেরই যে মস্তানরা পুরোপুরি ডুবিয়ে ছাড়ে এটা যদি কংগ্রেস নেতারা সময় মত বুঝতেন তাহলে অবশ্য এতবড় সমস্যায় আজ তাঁদের পড়তে হত না। আজ জেলায় জেলায় কমিটিগুলি ভাঙতে হচ্ছে; আজ বার বার বিবৃতি দিতে হচ্ছে যে, যারা জোরজুলুম করে চাঁদা তুলছে তাদের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই, আজ ছোটবড় সব নেতাকে বলতে হচ্ছে, পুলিস যেন দলমত নির্বিশেষে, সব গুণ্ডা শ্রেণীর লোককেই সায়েস্তা করে। কংগ্রেস নেতারা যদি সময় মত সতর্ক হতেন তাহলে আজ তাঁদের এসব জিনিস করতে হত না। আজ কৃষ্ণনগরের মত ঘটনাও ঘটত না।

অনেকে বলেন, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকদের সাহায্য নেওয়া ছাড়া কংগ্রেসের উপায়ও ছিল না! না হলে কিছুতেই সি পি এম-এর উৎপাত বন্ধ করা যেত না।

আমি নানা কারণে এই যুক্তিতে বিশ্বাস করি না। প্রথমত, গুণ্ডা দিয়ে কখনও গুণ্ডামী দমন করা যায় না। তাতে এক গুণ্ডামী হয়ত বন্ধ হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর এক গুণ্ডামী জন্ম নেয়। দ্বিতীয়ত, গুণ্ডা শ্রেণীর লোকরাই সি পি এমকে ঠাণ্ডা করেছে এটাও আমি বিশ্বাস করি না। সি পি এমকে ঠাণ্ডা করেছে মূলত সি পি এম-এর নিজেরই ক্রিয়াকলাপ।

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হাজার হাজার ছেলে কংগ্রেসে আসে। ১৯৬৭ বা ৬৯ সনে যখন যুক্তফ্রণ্টের প্রচণ্ড প্রতাপ, যখন প্রবল প্রতাপান্বিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং শ্রীজ্যোতি বসু এবং যখন পুলিসের তাবড় তাবড় অফিসাররা সি পি এম-এর চেলাচামুণ্ডাদের অঙ্গুলী হেলনে চলতেন তখন গুণ্ডারা কংগ্রেসে ঢোকেনি, কংগ্রেসের হয়ে গুণ্ডামী করার সুযোগও তখন ছিল না। তখন যারা কংগ্রেসে ঢুকেছিল তারা রাজনৈতিক ভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কংগ্রেস করতে গিয়েছিল। তখন গুণ্ডারা আশ্রয় নিয়েছিল প্রধানত যুক্তফ্রণ্ট অন্তর্ভুক্ত দলে।

তারপরও হাজার হাজার ছেলে এসেছে কংগ্রেসে। তারা সবাই গুণ্ডা নয়। বরং আমার ধারণা অধিকাংশই সুস্থ চেতনার ছেলে। অধিকাংশই রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। কিন্তু এই সময়েই কংগ্রেস একটা মস্ত ভুল করে বসল। বিভিন্ন এলাকায় কিছু গুণ্ডা শ্রেণীর ছেলেকে প্রশ্রয় দিল। তাদেরও দলের নামে কাজ করার অধিকার দিল। এবং ক্রমে ক্রমে যা হওয়ার তাই হল। কতকগুলি এলাকায় সুস্থ চেতনার ছেলেদের সরিয়ে দিয়ে এরাই প্রধান কংগ্রেসী হয়ে উঠল। অর্থাৎ সেই গ্রেসাস সাহবের থিওরিই কাজ করল—ব্যাড কংগ্রেসী গুড কংগ্রেসীকে সরিয়ে দিল।

গুণ্ডা শ্রেণীর ছেলেদের প্রশ্রয় দিয়ে কংগ্রেস হয়ত সাময়িকভাবে কিছুটা লাভবান হয়েছিল। সি পি এম বাহিনীর সঙ্গে মারদাঙ্গা

করার জন্য একটা কংগ্রেস বাহিনী গড়ে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু সেই সাময়িক লাভ এখন বিরাট লোকসানের ভয়াল রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে।

কংগ্রেস নেতারা আর একটা মস্ত ভুল করলেন নির্বাচনের পর। তাঁরা রাতারাতি সবাই কংগ্রেস অফিস ছেড়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে গিয়ে ঢুকলেন—মন্ত্রিত্বটাই হয়ে দাঁড়াল 'ফুলটাইম' জব, আর সংগঠনটা নেহাতই হালকা 'পার্ট টাইম' ব্যাপার। যখন সংগঠনের হাল ধরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যখন অবাঞ্ছিতদের সরিয়ে দেওয়ার এবং আরও অবাঞ্ছিতের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সংগঠনের হাল খুব শক্ত করে ধরা প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা তখন পুরোপুরি হালটা ছেড়ে দিলেন।

ফল হয়েছে কী? ফল হয়েছে যে আজ পুরো সময় প্রদেশ কংগ্রেস দেখার মত কেউই নেই। জেলায় জেলায় সাংগঠনিক সমস্যাগুলিব মোকাবিলা করার সময়ই কেউ পাচ্ছেন না। এই হঠাৎ বিরাট বিশাল ভাবে স্ফীত সংগঠনটি একটা বাঁধুনীর মধ্যে নিয়ে আসার একান্ত আগ্রহও কেউ দেখালেন না।

কংগ্রেসের ছেলেদের সামনে নির্বাচনের দেড় মাস পরেও আজ কোনও প্রোগ্রাম নেই। প্রথম কয়েকদিন তারা সোৎসাহে বিজয় উৎসব করল। তারপর এল মন্ত্রীদের সম্বর্দ্ধনার পালা। ঘটা করে তাও হল। এখন সে পর্বও শেষ। এরপর তারা করবে কী? যৌবন কখনও চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। সুষ্ঠু কাজ না পেলে সে অন্য কাজ করবে। গড়ার কাজ না পেলে সে শুধু ভাঙতেই নিজেকে ব্যস্ত রাখবে। এটা যৌবনের ধর্ম। কংগ্রেসের ছেলেরাও এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

প্রশ্ন তাই যখন দেখা দিল, কংগ্রেসের ছেলেরা এরপর কী করবে তখন দেখা গেল তাদের পথ দেখাবার কেউ নেই। একটা প্রোগ্রাম

নেওয়া হল, গ্রামে চল। কিন্তু এই প্রোগ্রাম নিষ্ঠার সঙ্গে নিলে এই প্রোগ্রামকে সর্বতোভাবে সফল করার চেষ্টা করা হলে এরই মাধ্যমে দলের ও রাজ্যের যে অশেষ উপকার হতে পারত, তা করা হল না। শুধু যুব কংগ্রেসের কয়েকজন নেতা এই প্রোগ্রামটার কথা বললেন। দু একটা অঞ্চলে সেই মত একটু আধটু কাজ হল। কিন্তু ব্যস্, ওই পর্যন্তই।

অথচ দেখুন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই কত কাজ না করা যায়। লুকোন জমি উদ্ধার করা যায়, জোতদাররা যে দিনমজুরদের বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত করছে, তা অনেকটা বন্ধ করা যায়, ভাগচাষীদের অন্যায় উচ্ছেদ রদ করা যায়; গরিব চাষীদের নিয়ে সমবায় সংস্থা গড়ে তাদের বাঁচার পথ করে দেওয়া যায়, ছোট সেচ বা গ্রামীন উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ করা যায়, ফাঁকিবাজ ও দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মীদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা যায়।

এই ভাবে আরও বহু কাজের কথা বলা যায় যেগুলি করা সম্ভব এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। পশ্চিমবাংলার গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন জোয়ার আনা যায় এই কর্মসূচীর সফল রূপায়ণে। কিন্তু এজন্য যে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা প্রয়োজন সেটা চাই সকলের আগে। শুধু কাগজে প্রোগ্রাম ছেপে এরকম আন্দোলনে বেশি দূর এগোনো যায় না।

এখনই যে রাজ্য কংগ্রেসের ব্যাপারটা আর কিছু করার উপায় নাই এরকম স্তরে পৌঁছে গিয়েছে তা নয়। একজোট হয়ে দৃঢ়ভাবে এগোলে এখনও কংগ্রেস নেতারা এই সংগঠনকে দিয়েই রাজ্যে অনেক পরিবর্তন আনতে পারেন। এখনও গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য থেকে দলকে বাঁচাতে পারেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা অবশ্য একটা ভাল কাজ করেছেন, সকলেই গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের আচরণে নিন্দা করেছেন। মুখে তাঁরা

বলেছেনও যে এই ধরনের জিনিস কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। কমিউনিস্টরা এটাও করতেন না। যুক্তফ্রন্ট রাজত্বে কেউই স্বীকার করেন নি যে, তাঁর দলে গুণ্ডাশ্রেণী লেকেরা ঢুকে পড়েছে এবং তাদের অত্যাচারে বহু সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। প্রকাশ্যে তাঁরা নিজ নিজ দলের গুণ্ডামীর প্রতিবাদ তো কোনও দিন করেন নি, বরং প্রশাসনকে যে যাঁর দলগত স্বার্থে পুরোপুরি লাগাবার চেষ্টা করেছেন ; গুণ্ডাদের প্রকাশ্যে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

কংগ্রেস বলে তার আদর্শ গণতন্ত্র। কংগ্রেস নেতারা বার বার বলছেন, তাঁরা পুরোপুরি গণতান্ত্রিক রীতিতে রাজ্য শাসন চালাতে চান। তাই যদি হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রশাসনকে দল নিরপেক্ষ করে তুলতে হবে। প্রশাসনকে বুঝতে দিতে হবে যে শেষ করলে কংগ্রেস এবং সি পি আইয়ের ঝাণ্ডাবাহী লোককে ধরাও কোনও অপরাধের কাজ নয়—বরং সেইটাই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ জিনিস অবশ্য রাতারাতি হতে পারে না। কারণ, যুক্তফ্রন্ট প্রশাসনিক দলগত নিরপেক্ষতার পুরোপুরি বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির শাসনেও কংগ্রেস এ ব্যাপারে তেমন কোনও ভাল নজির প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। যদি এখন প্রত্যক্ষ রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব হাতে পেয়েও কংগ্রেস সরকার প্রশাসনিক দলগত নিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনতে না পারে, যদি দলমত নির্বিশেষে গুণ্ডা শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হতে না দেয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ কিছুদিনের মধ্যে আবার সেই ভয়াল আবর্তে পড়বে।

এবং, কংগ্রেসও সেই আবর্তে পড়ে হাবুডুবু যাবে।

২১, এপ্রিল ৭২।

এই প্রথম পাটচাষীদের কথা কানে তোলা হল

ললিতনারায়ণ মিশ্রকে ধন্যবাদ, পাটচাষীদের ব্যাপারে দুটো সত্যি তিনি বলেছেন। এই প্রথম একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে শোনা গেলঃ বহুদিন যাবৎই পাটচাষীরা বঞ্চিত। অনেক কাল ধরেই তাঁরা দুর্দশা ভোগ করছেন। পাট চাষীদের হয়ে তদ্বির করার কেউ নেই। তাঁদের হয়ে কেউ লবি করেন না। তুলার সংকট দেখা দিলে প্রবল হৈ চৈ করা হয়েছিল। ফলে তুলা চাষীরা তাঁদের প্রাপ্য পেয়েছিলেন। এই প্রথম পাটচাষীদের কথা উঠেছে।

মন্ত্রীদের মুখে অর্থনৈতিক বিষয়ে এরকম স্পষ্ট সত্যি কথা বড় একটা শোনা যায় না তাই ললিতনারায়ণ মিশ্রকে আবার ধন্যবাদ।

আর ধন্যবাদ কোচবিহারের কংগ্রেস এম-পি বিনয় দাস চৌধুরীকে। তিনিই এই প্রসঙ্গটা লোকসভায় তুলেছিলেন। সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতার যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতে এটাও দেখা যাচ্ছে যে, তথ্যসহ বেশ জোরের সঙ্গে তিনি পাটচাষীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। অবহেলিত পাটচাষীদের হয়ে হালফিল এত জোরের সঙ্গে কেউ সংসদে বক্তব্য তুলে ধরেছেন বলে মনে পড়ে না।

একটা জিনিস দেখে অবশ্য আমি একটু আশ্চর্য। সংবাদপত্রে লোকসভার পাট-বিতর্কের যে বিবরণ বেরিয়েছে তাতে সি পি এম-এর কোন সদস্যের নাম নেই। তাঁরা কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেছেন বলে অন্তত কলকাতার খবর কাগজগুলিতে কোনও উল্লেখ নেই। ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের নাম আছে, ত্রিদিব চৌধুরীর বক্তব্যের সামান্য কিছুটা বেরিয়েছে; কিন্তু কোনও সি পি এম সদস্য কিছু বলেছেন বলে দেখতে পাচ্ছি না।

কারণটা কী? সি পি এম সদস্যরা কি পাটচাষীদের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না? না অন্য কোনও অসুবিধার জন্যই তাঁরা কিছু বলতে পারেন নি?

আসলে কিন্তু আজকের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খুব কম আছে। কাঁচা পাটের ব্যাপারে যত বড় লুণ্ঠন যত বড় শোষণ চলছে এত বড় লুণ্ঠন ও শোষণ ভূ ভারতে আর কোথাও চলছে কিনা সন্দেহ। শুধু যদি পাটচাষীকে ন্যায্য মূল্য পাইয়ে দেওয়া যায়, বছরের পর বছর ধরে চলে আসা এই ঠকাবার ঢালাও ব্যবস্থাটা যদি বন্ধ করা যায় তাহলেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির অশেষ উপকার হতে পারে।

আমরা যারা শহরের মানুষ তারা অবশ্য সাধারণত এসব জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাই না। ঘামাই না কারণ ব্যাপারটা পুরোপুরি জানি না ও বুঝি না। কিন্তু যদি টাকার হিসেবে তুলে ধরা হয় সমস্যাটা, তাহলে অনেকেই বুঝতে পারবেন এর গুরুত্ব।

অনুমান করতে পারেন? পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষী কাঁচা পাটের মোটামুটি একটা ন্যায্য মূল্য পেলেই রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফি বছর কত বাড়তি টাকা আসবে? আমি হিসেব করে দেখেছি, পাটচাষী মোটামুটি একটা ন্যায্য মূল্য পেলেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ফি বছর অন্তত একশ কোটি বাড়তি টাকা আসবে। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনায় গোটা রাজ্যের জন্য যে টাকা খরচা হয়েছে তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা পেতে পারে এ রাজ্যের অর্থনীতি যদি শুধু পাটচাষী তাঁর উৎপাদনের জন্য মোটামুটি একটা ন্যায্য মূল্য পায়। রাজ্যের পরিকল্পনায় চলতি পাঁচ বছরের বরাদ্দ ৩২২ কোটি টাকা। আর পাটচাষী মোটামুটি ন্যায্য মূল্য পেলেই পাঁচ বছরে বাড়তি আসতে পারে অন্তত ৫০০ কোটি টাকা। আমরা ভিক্ষার ঝুলি হাতে করে দিল্লী যাই, 'দে মা' বলে কাতর আবেদন জানাই— কিন্তু ন্যায্য পাওনাটা আদায় করতে পারলেই যে অনেক বেশি

টাকা আমাদের অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে পারি সেটা খেয়াল করি না।

ললিত মিশ্র কাঁচা পাট সম্পর্কে দুটো মূল কথা বলেছেন। প্রথম কথা: সরকার আইন করে কাঁচা পাটের একটা ন্যূনতম দর ঠিক করে দেবেন। দ্বিতীয় বক্তব্য: সরকার ধীরে ধীরে কাঁচা পাটের গোটা ব্যবসাটাই হাতে তুলে নেবেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন, সরকার কত টাকায় পাটের ন্যূনতম দর বাঁধবেন? কয়েক সপ্তাহ আগে ললিতবাবু এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে একটা দর প্রস্তাবও করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত দরটা আগাম বলে দিলে ফাটকাবাজদের সুবিধা হবে, তাই ওই দরটা বলতে চাই না। কিন্তু সিদ্ধার্থবাবুই তাঁর জবাবে লিখেছেন যে, ওই দরটা অত্যন্ত কম—চাষীর ওতে তেমন কোনও লাভই হবে না।

কাঁচা পাটের দর কত হওয়া তা উচিত নিয়ে নানা তর্ক আছে। বিনয়বাবু লোকসভায় হিসাব দিয়ে দেখিয়েছেন, কাঁচা পাটের কুইন্টাল প্রতি দর অন্তত ২০০ টাকা হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭০ সনে যে পাট তদন্ত কমিশন হয়েছিল, তাঁরা বলেছিলেন, কাঁচা পাটের ন্যায্য মূল্য দিতে হলে কুইন্টাল প্রায় ২৫০ টাকা হওয়া উচিত। এখন বিহার ওড়িশা, পশ্চিমবাংলার চাষী কাঁচা পাটের জন্য কুইন্টাল প্রতি গড়ে ৯০ টাকাও পান না। তবু নানা কারণে তাঁরা পাট চাষ করতে বাধ্য। একজন পাটচাষী তাঁর গোটা মাসের পরিশ্রমের জন্য ১০০ টাকাও পান না। এর কারণ কাঁচা পাটের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হয় না। পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় একজন কৃষি মজুর দৈনিক ৭ টাকা পান। চাষের মূলধনী খরচা এবং চাষীর মাথাপিছু দৈনিক পারিশ্রমিক ৬ টাকা ধরলেও কাঁচা পাটের কুইন্টাল ২০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত। দৈনিক ৭।৮ টাকা মজুরী ধরেই যখন কেন্দ্রীয়

সরকার গমের সংগ্রহ মূল্য স্থির করেছেন, তখন দৈনিক অন্তত পাঁচ-ছয় টাকা মজুরী ধরে কেন পাটের মূল্য ধার্য হবে না?

দ্বিতীয় প্রশ্ন, শুধু আইন করে ন্যূনতম মূল্য ঠিক দিলেই কি চাষী ন্যায্য মূল্য পাবেন? মোটেই না। এখনও সরকার নির্ধারিত একটা ন্যূনতম দর আছে। কিন্তু সে দর কোনও চাষী পান? বলতে পারেন, এবার সরকার আইন করে দর বেঁধে দিচ্ছেন। বলেছেন, তার নীচে যে কেনা বেচা করবে সে শাস্তি পাবে। খুব ভাল আইন। কিন্তু প্রশ্ন হল, যে চাষী পেটের দায়ে যে কোনও মূল্যে পাট বেচতে বাধ্য হন, তিনি কি মামলা করে ক্রেতার কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য আদায় করতে পারবেন? পাঁচ দশ বা পঞ্চাশ মন পাট বেচার জন্য মামলা মোকদ্দমা করতে যেতে পারবে কী? বিশেষ করে পাট ক্রেতা আসলে যখন সামান্য কয়েকটি মাত্র পরিবার।

সরকার বলেছেন, বাজারে যাতে দর না বেশি নামতে পারে সেজন্য জুট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া এবার প্রচুর কাঁচা পাট কিনবেন। কিন্তু আসলে কতটা কিনবেন? যতটা হয় তার মাত্র শতকরা দশ ভাগ। নব্বুই ভাগের ক্রেতা এখনও থেকে যাবেন সেই সামান্য কয়েকটি পরিবার—যাদের লীলাখেলা এর আগেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জুট কর্পোরেশন কি এখনই চাষীর কাছ থেকে পাট কিনতে যাবেন? পশ্চিমবঙ্গে খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যাচ্ছে, না; তা নয়—তাঁরা আপাতত বড় আড়তদারদের কাছ থেকেই পাট কিনবেন অর্থাৎ চাষী আগেও যেমন দালালকে পাট বেচতেন এখনও তেমনি বেচতে বাধ্য হবেন।

পাটচাষী ন্যায্য মূল্য পেতে পারেন একমাত্র গোটা কাঁচা পাট ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসাটা জুট কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলে। সেটা নিশ্চয়ই রাতারাতি সম্ভব নয়। এজন্য সরকার প্রস্তুত হচ্ছেন

কি? এজন্য জুট কর্পোরেশন উদ্যোগ আয়োজন করছেন কি? পশ্চিমবঙ্গে খবর নিয়ে জানা গিয়েছে, না, তেমন কোনও ব্যবস্থা এখনও হয়নি। দিল্লী পাঞ্জাব অঞ্চলের কিছু অফিসার নিয়ে এসে জুট কর্পোরেশনের অফিস বোঝাই করলে তা হবেও না। এ কাজের দায়িত্ব দিতে হবে প্রধানত পাট উৎপাদক রাজ্যগুলির লোকদের ওপর।

আর একটা কথা, 'অতি শীঘ্রই' কাঁচা পাটের গোটা ব্যবসাটা সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হবে এমন অস্পষ্ট কথা বললেও চলবে না। সরকারী পরিভাষায় 'অতি শীঘ্র' মানে পাঁচ বছর হতে পারে, আবার পনেরো বছরও হতে পারে। সরকারকে স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে হবে যে, তিন বছরের মধ্যে তাঁরা গোটা ব্যবসাটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন। স্পষ্ট কথা না থাকলে 'অতি শীঘ্রের' ফাঁকিতে কাজ গরুর গাড়ির গতিতে এগোবে।

তিন বছরের মধ্যে একাজ করা সম্ভবও নয়। জুট কর্পোরেশনের উৎসাহে তিন বছরে গ্রামে গ্রামে অন্তত তিন হাজার সমবায় সমিতি গড়ে উঠতে পারে। এবং তাদের সাহায্যে সরকার অনায়াসে গোটা ব্যবসাটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন।

তিন বছরের মধ্যে যদি পাটচাষী তাঁর ফসলের ন্যায্য মূল্য পান পশ্চিমবাংলার আটটা পাট উৎপাদক জেলা এবং ওড়িশা বিহার, আসাম ও ত্রিপুরার বিস্তারিত অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাহলে বিরাট জোয়ার আসবে। এবং সে জোয়ারে উপকৃত হবে গোটা পূর্ব ভারত।

২৬ মে, '৭২।'

পশ্চিমবাং   ত এত অবিচারের প্রশ্ন ওঠে কেন?

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, ফরাক্কার জল নিয়ে যে প্রচণ্ড বিরোধটা দানা বেঁধে উঠেছিল, আপাতত তা মিটে গিয়েছে। এই বিরোধ মেটাবার কৃতিত্বটা ঠিক কার প্রাপ্য তা জানি না। মীমাংসার ফর্মুলাকে কে বের করেছেন, তাও প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু কৃতিত্বটা যাঁরই হোক—প্রধানমন্ত্রীরই হোক, সিদ্ধার্থবাবুরই হোক অথবা নাটের গুরু কে এল রাওয়েরই হোক—বিরোধটা আপাতত মিটে গিয়েছে, সেইটাই সবচেয়ে ভাল কথা।

আপাতত ঠিক হয়েছে, কয়েকবছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। অর্থাৎ দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিশেষজ্ঞরা রায় দেবেন, কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য খরার সময়ও কত ক্যুসেক জল প্রয়োজন। সেই রায় অনুসারেই ভবিষ্যতে জল পাওয়া না পাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

কে এল রাও এর আগে এই রকম কিছু চিন্তা না করে পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা না বলে হঠাৎ রায় দিয়েছিলেন, যে ফারাক্কার খাল খরার সময় বিশ হাজার ক্যুসেকের বেশি জল পাবে না সেটা বোঝা দুষ্কর। উত্তর প্রদেশে বাঁধগুলি তৈরী হওয়ার আগেই কেন তিনি আগাম সেগুলির জন্য জল রির্জাভ করতে পরম উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন, তাও বোঝা মুশকিল। কেন তিনি গঙ্গার জলের সমস্যাটা এমনভাবে তুলে ধরতে চাইলেন, যাতে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটা বিরাট্ ঝগড়া লেগে ওঠে সেটাও রহস্য।

বিরোধটা যে বেশিদূর এগোতে পারল না, সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। যেভাবে ফারাক্কার জলের বিরোধটা এগোচ্ছিল, তাতে

অল্পদিনের মধ্যেই তিন রাজ্যে তীব্র ঝগড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠত। আমরা বলতাম, কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্য চল্লিশ হাজার ক্যুসেক জল চাই-ই। বিহার ও উত্তর প্রদেশ বলত, তাঁদের চাষের জল চাই-ই। আমরা বলতাম কলকাতা জাতীয় বন্দর—কলকাতাকে জাতীয় স্বার্থেই বাঁচাতে হবে। উত্তর প্রদেশ ও বিহার বলত, আমাদের চাষীর স্বার্থ আগে ; জল পেলে আমাদের রাজ্য দুটিতে কোটি কোটি টাকার বাড়তি ফসল ফলবে। বিরোধটা এইভাবে এগোতে এগোতে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পশ্চিমবাংলা বনাম উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে একটা তুমুল কাণ্ড লেগে যেত।

আজ একদল লোক অত্যন্ত সুকৌশলে এই রকম একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইছেন। সৃষ্টি করতে চাইছেন এমন একটা অবস্থা যাতে নানান সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে গোটা ভারতের বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের একটা তীব্র বিরোধ শুরু হয়ে যায় এবং ক্রমে ক্রমে সেই বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, যেখানে গোটা ভারত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠবে এবং পশ্চিমবঙ্গেও স্বাতন্ত্রতাবাদ বা বিচ্ছিন্নতাবাদ তীব্রভাবে মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াবে।

এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত তাদের হাতেনাতে ধরা অত্যন্ত কঠিন। তাদের ক্রিয়াকলাপও অত্যন্ত জটিল ও কুটিল। যিনি তাদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেন, তিনিও অনেক সময় বুঝতে পারেন না কী করছেন বা কার স্বার্থে কাজ করছেন। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে ফারাক্কার জলের বিরোধটাকে এঁরা ভীষণ ভাবে কাজে লাগাবার জন্য বেশ ভাল মতই আসরে নেমেছিলেন। কয়েক মাস ধরে দেখে আশ্চর্য হলাম, কী সব বিচিত্র লোকেরা হঠাৎ ফারাক্কার বিরোধ নিয়ে কী অদ্ভুতভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন।

তাই আমার মনে হয়, প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যাপারে অনেকটা

গভীরে যাওয়া উচিত। দেখা উচিত খুঁজে খুঁজে, কেন তাঁর মন্ত্রিসভার একজন সদস্য এইভাবে একটা জঘন্য বিরোধ পাকিয়ে তুললেন। এর পেছনে কারু কোনও হাত ছিল কিনা। এবং মন্ত্রী কে এল রাও সজ্ঞানে কোনও জঘন্য চক্রান্তের ক্রীড়নক হিসাবে কাজ করছিলেন কি না।

আমরা একটু ভাবপ্রবণ জাতি। অল্পেই মেতে উঠি। আবার অল্পেই অনেক কিছু ভুলে যাই। কোনও সমস্যার গভীরে যাওয়ার চেষ্টা কদাচিৎ করি। গুজবে চট করে কান দিই। এবং কোনও হুজুগ এলে আত্মহারা হয়ে পড়ি।

কেউ যদি বলেন, 'বাঙালী বিপন্ন' 'বাঙালীর উপর বড় অবিচার এবং অত্যাচার হচ্ছে' তাহলে তো আর কথা নেই। আমরা তখন অনেক সময় যুক্তি-তর্ক ভুলে যাই। সব ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব অপর কারুর ঘাড়ে চাপাতে পারলে আমাদের আত্মসন্তুষ্টির আর সীমা পরিসীমা থাকে না। আমরা তাই নিয়েই মশগুল হয়ে পড়ি।

এই ভাবপ্রবণতা, এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার আত্মসন্তুষ্টি আমাদের বার বার ক্ষতি করেছে। 'কেন্দ্র অবিচার করছে' এই শ্লোগান নিয়েই আমরা মত্ত থাকতে চাই। কেন্দ্রের অবিচার বন্ধ করার জন্য এবং নিজের শক্তি সঞ্চয় করার কাজে উদ্যোগী হতে কিন্তু আমরা তেমন সচেষ্ট হতে রাজি নই। কোনও বড় অফিসারকে জিজ্ঞেস করুন, হ্যাঁ মশাই, কাজটা হচ্ছে না কেন, দেখবেন সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঙালীর প্রতি অবিচারের বিরাট এক কাহিনী বলে যাবেন। কোনও মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, হ্যাঁ মশাই, কী হল, এই জরুরী ব্যাপারটার যে কিছুই হচ্ছে না! মন্ত্রিবর যদি আপনার বিশেষ পরিচিত হন, একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে চাপা স্বরে বলবেন, কী করি বলুন, দিল্লী বাগড়া দিচ্ছে। কোনও পশ্চিমবঙ্গীয় এম পি কে জিজ্ঞেস করুন, হ্যাঁ মশাই, এই রকম একটা

ব্যাপার পার্লামেণ্টে তুললেন না কেন? দেখবেন, অধিকাংশ এম পি ই জবাব দিচ্ছেন, ও: জানেন না, কী অদ্ভুত একটা ক্লীক মশাই। পশ্চিমবাংলার কোনও ব্যাপার বলতে গেলেই সময় হয় না।

আমরাও তেমনি। দিল্লীর অবিচার, দিল্লীর চক্রান্ত শুনলেই সব ভুলে যাই—অমনি মেতে উঠে, এগিয়ে গিয়ে দিল্লীর অবিচারের আরও দশটা কাহিনী বলে যাই।

কিন্তু আমরা কী একবার কাউকে জিজ্ঞেস করি, মাদ্রাজের বা মহারাষ্ট্রের বা হরিয়ানার মন্ত্রীরা, এম পিরা এবং অফিসাররা যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁদের রাজ্যের দাবি দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করেন, আপনারা তা করেন কি? আপনারা রাজ্যের দাবিগুলি নিয়ে সেইভাবে লেগে থাকেন কি?

বহুদিন আগে পুজো সংখ্যায় একটা গল্প পড়েছিলাম। কাহিনীটা এই রকম: নন্তু একটি ছেলে। বড়লোক বৃদ্ধের তরুণী ভার্যার একমাত্র সন্তান। নন্তু ভাল ভাল গৃহশিক্ষক এবং নকল বিদ্যার মহিমায় ধাপে ধাপে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ পাশ করল। তারপর তাঁর বৃদ্ধ পিতা বিশেষ গর্বের সঙ্গে তাঁকে সর্বভারতীয় পরীক্ষায় পাঠালেন। নন্তু সেখানে ডাহা ফেল করল। এবং ঘরে ফিরে এসে বলল, না, ওখানে কোনও সুবিধা করা যাবে না, দিল্লী বড় বাঙালী বিদ্বেষী। ব্যস, আর কোনও অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসা প্রয়োজন হল না। নন্তুর আত্মীয়স্বজন, বাপ-মা, পাড়া প্রতিবেশী সবাই বলতে সুরু করলেন, দেখলে বাঙালীর উপর কতবড় অবিচার, না হলে নন্তুর মত সোনার টুকরো ছেলেকে ফেল করিয়ে দেয়!

নন্তু যে এতদিন পড়ে পাশ করে নি, টুকে এবং বাবার পয়সার জোরে সাফল্য অর্জন করেছে, সেটা কেউ একবার ভুলেও স্মরণ করলেন না।

বাঙালী বলতে যাঁর উপর সবচেয়ে বড় অবিচার হয়েছে তিনি সুভাষচন্দ্র। কিন্তু অবিচার এবং জুলুম হয়েছে বলে সুভাষচন্দ্র কখনও ঘ্যান ঘ্যান করেন নি—দিনের পর দিন কান্না গান নি। তিনিও পাল্টা লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। গান্ধীজীর মত লোক পট্টভীকে নিয়ে সুভাষচন্দ্রকে হারাবার চেষ্টা করলেন। আর সব রথী মহারথীও তাঁর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু পারলেন তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে হারাতে?

তারপর তাঁরা ঘৃণ্য প্যাঁচ কষলেন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে। তাঁকে দল থেকে বের করে দিলেন। কিন্তু তা নিয়েও সুভাষচন্দ্র কান্না জুড়ে দিলেন না। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে তাঁর নিজের পথে এগিয়ে চললেন। বিদেশে গেলেন। সেখানে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে তুললেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন।

তখনও তিনি কোনও নীচতার পরিচয় দেন নি। তখনও বলেছেন, গান্ধীজী ভারতের নেতা। তখনও তিনি গান্ধী ব্রিগেড করেছেন। একদা সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীজীর আশীর্বাদ সহ এবং সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁর উপর অবিচার করেছিলেন বলে সুভাষচন্দ্র কখনও নীচ প্রতিশোধ নিতে যান নি—বা ঘ্যান ঘ্যান করেন নি।

এটাই হল বাঙালী পৌরুষ।

দিল্লী অবিচার করছে? ঠিক আছে। আমরা দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবিধানের চেষ্টা করব। দিল্লী আমাদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে? পরোয়া নেই। আমরা সংঘবদ্ধভাবে আমাদের কাজ করে যাব। কে আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারে? কার সে সাধ্য আছে? এত সম্পদ যে রাজ্যে, এত বুদ্ধি যে রাজ্যের মানুষের, এত শিক্ষিত যুবক যে রাজ্যে রয়েছেন, তাকে দাবিয়ে রাখতে পারে কে? যদি সে নিজে না ভ্রান্ত পথে চলে! যদি সে নিজে না আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে!

অক্ষমের বিক্ষোভ ঘ্যান-ঘ্যানানিতে পরিণত হতে বাধ্য। কিন্তু সক্ষম বিক্ষোভ জানায় দৃঢ় পদক্ষেপে—পাল্টা ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে।

এবং তার মধ্যে কখনও নীচতা আসে না। বিক্ষোভে না, সংগ্রামে না, বিজয়েও না।

আর সে কখনও অপরের চক্রান্তের ক্রীড়নকে পরিণত হয় না।

১৮ অগাস্ট, ১৯৭২ ॥

প্রদেশ কংগ্রেসের বিরোধ আদর্শগত নয়

প্রদেশ কংগ্রেসে ঝগড়া ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যাঁরা আশা করেছিলেন যে অন্তত লবণ হ্রদের কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে দলের ঝগড়া কিছুদিন চাপা থাকবে, সবাই মিলে এই অধিবেশন সফল করার জন্য লেগে পড়বেন তাঁরাও হতাশ হয়েছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের ঝগড়া কিছুতেই কমছে না। দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

হাইকমানডের আশীর্বাদ নিয়ে সিদ্ধার্থবাবু চেষ্টা করেছিলেন মোটামুটি একটা সমঝোতার মাধ্যমে দলীয় নির্বাচনটা শেষ করতে। তা কিছুটা হয়েছে, কিছুটা হয়নি। আদালতে বেশ কিছু মামলা ঝুলছে। আরও মামলা যে হবে না তেমন গ্যারানটি নেই।

প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এবং কর্মকর্তা নির্বাচনের বিরোধও এখনও পুরো মাত্রায় বর্তমান। নানা পক্ষ নানা বিবৃতি দিচ্ছেন। গোপনে, প্রকাশ্যে, টেলিফোনে, টেলিগ্রামে আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই। দিনের পর দিন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একাধিক মন্ত্রী নাকি হুংকার দিয়েছেন, তাঁদের মনোমত কাজ না হলে তাঁরা মন্ত্রিসভা থেকেই পদত্যাগ করবেন। এক-আধজন আবার এমন কথাও বলে রাখছেন যে, যদি তাঁদের উপর কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপাতত তাঁরা তা মেনে নিতে বাধ্য হলেও ভবিষ্যতে এর বিরোধিতা করবেনই এবং সেজন্য প্রয়োজন হলে তখন কর্মকর্তাদের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনতেও ছাড়বেন না।

"নির্বাচনী উত্তাপ" অন্যভাবেও ফুটে বের হচ্ছে। যেমন ধরুন, ধর্মতলার পুলিশী গুলি চালনার ঘটনাকে নিয়ে বিবৃতির লড়াই। এই

প্রসঙ্গে কুমুদ ভট্টাচার্য লক্ষ্মীকান্ত বসুদের বিরুদ্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন বিবৃতিদাতা এবং বিবৃতিতে আক্রান্ত ব্যক্তির নামটা চেপে রেখে তা পড়লে মনে হয় কোনও কংগ্রেস নেতা কোনও সি পি এম নেতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। আবার এর জবাবে লক্ষ্মীকান্ত বসুরা যেভাবে ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব ও সুব্রত মুখার্জিকে একহাত নিয়েছেন সেটা দেখলে মনে হয় কোনও কংগ্রেস নেতা যেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিচ্ছেন!

বিরোধ এবং ঝগড়াটা যে শুধু ওপরতলায় সীমাবদ্ধ তা নয়। বহু এলাকায়, বহু ফ্রনটে নীচেরতলা পর্যন্ত ঝগড়া পৌঁছে গিয়েছে। সেখানেও আস্তে আস্তে উত্তাপ বাড়ছে। দু'চারটা এলাকায় বেশ মাঝারি গোছের মারামারি পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। একাধিক ক্ষেত্রে বোমা-পাইপগানও ব্যবহৃত হয়েছে। তরুণকান্তি ঘোষের মত প্রবীণ মন্ত্রীর সুরক্ষিত দুর্গ-বাড়ি শিশিরকুঞ্জও প্রচণ্ড দলীয় আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

রাজ্য কংগ্রেসে যে বিরোধ চলছে তা কিন্তু কোনও পর্যায়েই আদর্শঘটিত নয়। কর্মপন্থা নিয়ে এই বিরোধ, তাও বলা চলে না। এই বিরোধ প্রধানত ব্যক্তিগত। এবং বিরোধ ব্যক্তিগত হলে সচরাচর যা হয় এখানেও তাই হয়েছে—বিরোধী গোষ্ঠীগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। বিরোধ কী নিয়ে তাও অনেকেই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না।

আপাতত একটা জিনিসে দেখা যাচ্ছে অনেকে একমত। সেটা হল, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে দলের একমাত্র সাধারণ সম্পাদক করা চলবে না। এঁদের মূল দাবি, প্রিয়বাবুকে সাধারণ সম্পাদকই রাখা চলবে না। নিতান্তই যদি তাঁকে সরানো না হয় তাহলে তাঁর সঙ্গে আর একজন সাধারণ সম্পাদক করতে হবে এবং সেই ব্যক্তি প্রিয়বাবুর গোষ্ঠীর হলে হবে না।

অন্য দিকে আবার প্রিয়বাবুকেই একমাত্র সাধারণ সম্পাদক করতে হবে এমন দাবিও অনেকেই তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য : প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে সরানো একটা বৃহৎ পরিকল্পনার প্রথম ধাপ মাত্র। এই ধাপে সফল হলে এঁরা দাবি তুলবেন, সুব্রতবাবুর হাত থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে নিতে হবে। এবং সেটা হয়ে গেলে তার পর দাবি উঠবে, সিদ্ধার্থবাবুকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরাতে হবে।

যাঁরা প্রিয়বাবু এবং সুব্রতবাবুর উপর ক্ষুব্ধ তাঁরা যে সকলে সিদ্ধার্থবাবুর উপরও ক্ষুব্ধ তা কিন্তু নয়। যেমন ধরুন, লক্ষ্মীবাবু এবং তাঁর সঙ্গী এম এল এ-রা। এঁদের সিদ্ধার্থবাবুর উপর রাগ প্রধানত এই কারণে যে, তাঁরা মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়বাবু এবং সুব্রতবাবুকে বড় বেশী "প্রশ্রয়" দিয়ে চলেছেন। তাঁরা কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এমনিতে সিদ্ধার্থবাবুকে সরাতে মোটেই আগ্রহী নন! এঁরাও অনেকেই মোটামুটি প্রিয়বাবু এবং সুব্রতবাবুর সমবয়সী এবং একই সঙ্গে দল গড়েছেন। নির্বাচনের পর কেউ শুধুই এম এল এ, কেউ বা নেতা ও মন্ত্রী। এঁদের বিরোধটা মূলত সেইখানে। তৎসহ রয়েছে ব্যক্তিগত আচার-আচরণের প্রশ্ন। প্রিয়বাবু এবং সুব্রতবাবুর আচরণে এঁরা অনেকে ক্ষুব্ধ।

এঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কিছু প্রবীণও। তাঁরাও প্রিয়বাবু সুব্রতবাবুর উপর ক্ষুব্ধ। কিন্তু তাঁদের মূল লক্ষ্য মোটেই প্রিয়বাবু বা সুব্রতবাবু নন। তাঁদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধার্থবাবু। কেউ বা মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য লালায়িত, কেউ বা মুখ্যমন্ত্রী আর একজন মন্ত্রীকে বেশী খাতির করায় ভীষণ চটে, কেউ বা বয়স অনুসারে মন্ত্রিসভায় মর্যাদা না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ।

লক্ষ্য সকলের এক নয় বলে এঁরাও মূলত সিদ্ধার্থবাবু-বিরোধী হয়েও একভাবে বিরোধী নন। তা হতেও পারেন না। যেমন ধরুন, জয়নাল আবেদিনের ক্ষোভ তাহলেই অনেকটা কমে যাবে যদি দেখা যায় সিদ্ধার্থবাবু "বরকাত বরকাত" একটু কম বলছেন।

তরুণকান্তির ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর সমস্ত রাজনীতির মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন।

আদর্শগত নয় বলেই প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান বিরোধের অনেকটা মিটিয়ে দিতে পারেন দলের নেতারা যদি অবশ্য তাঁরা সত্যিই এ ব্যাপারে আগ্রহী হন।

বিশেষ করে তরুণ কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সমঝোতা মোটেই অসম্ভব নয়। কারণ, এঁদের অনেকেরই বয়স, সামাজিক পশ্চাদপট এবং রাজনৈতিক কর্মজীবন মোটামুটি এক। এঁদের সমঝোতার জন্য যা প্রয়োজন তা হল (১) পারস্পরিক বোঝাপড়া, (২) কর্মক্ষেত্রের মোটামুটি একটা ভাগাভাগি, (৩) সকলেই মোটামুটি সমান—সকলের এই উপলব্ধি, (৪) "চক্রান্তকারী" প্রবীণদের কাছ থেকে এঁদের সবাইকে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা, এবং (৫) দলের একটা ব্যাপক কর্মসূচী—সমগ্র দলকে এঁদের নেতৃত্বে একটা কর্মযজ্ঞে মাতিয়ে তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী হাইকমানডের আশীর্বাদসহ যদি তরুণদের মধ্যে এই সমঝোতার কাজে নামতে পারেন তাহলে প্রদেশ কংগ্রেসের বিরোধ অনেকাংশে মিটে যাবে। তখন প্রবীণরা কেউই নিজ নিজ স্বার্থে এঁদের খেপিয়ে তুলতে পারবেন না, একের সঙ্গে অপরের ঝগড়া লাগাতে পারবেন না এবং দলের ভেতরে ডামাডোলও জিইয়ে রাখতে পারবেন না। তখন প্রিয়-সুব্রত বনাম লক্ষ্মী-নুরুল প্রশ্নও থাকবে না।

কংগ্রেস তাহলেই সত্যিকারের নতুন কংগ্রেস হতে পারবে। তা না হলে, ওপরতলার এই বিরোধ ধীরে ধীরে প্রচণ্ডভাবে নীচেরতলায় গিয়ে পেঁাছবে এবং যুক্তফ্রন্ট আমলে যা হয়েছিল কংগ্রেস আমলেও তাই হবে—সমাজবিরোধীরা সুবিধা বুঝে আলাদা আলাদা সাইডে গিয়ে দাঁড়াবে এবং নেতারা কার্যত তাঁদের ক্রীড়নকে

পরিণত হবেন। তখন কিন্তু শত চেষ্টা করেও আর সমঝোতা সম্ভব হবে না।

আর সেই সঙ্গে এই সরকারও পশ্চিমবঙ্গের কোনও ভাল করতে পারবেন না। যে সরকারী দলের মধ্যে প্রতিনিয়ত মারামারি ঝগড়াঝাটি চলে সেই সরকারী দল কিছুতেই দেশ গঠনের কাজ করতে পারে না।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭২।

সি পি এম-এর 'রণকৌশল' ও কংগ্রেসী টেকনিক

কুমীর যখন ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোহায় তখন সে চোখটি প্রায় বুঁজে এমনভাবে পড়ে থাকে যেন অত্যন্ত শান্তশিষ্ট একটি জীব, যেন নড়ে চড়ে একটু এদিক-সেদিক করার ক্ষমতাও তার নেই, যেন কোনও খারাপ কাজে কস্মিনকালেও সে যায় না।

আমাদের সি পি এমের এখন সেই রোদ পোহানো অবস্থা। চুপচাপ ডাঙ্গায় পড়ে আছে। আর, ভাল ভাল কথা বলে বোঝাতে চাইছে, পৃথিবীতে তার মত শান্তশিষ্ট এবং জনহিতৈষী পারটি নেই—কখনও কোনও খারাপ কাজে সে থাকে না!

সম্প্রতি সেই চুপচাপ ডাঙ্গায় শুয়ে পড়ে থাকা সি পি এম বলেছে, ছি ছি কংগ্রেস এখন দলের স্বার্থে সরকারকে ব্যবহার করছে, লবণ হ্রদে দলের অধিবেশনের প্রয়োজনে প্রশাসনকে লাগাচ্ছে! ছি ছি এমন কাজ কেউ করে!

সি পি এম যতদিন রাইটার্স বিলডিংয়ে বসেনি ততদিন অবশ্য এসব কথা সি পি এম নেতাদের মুখে বেশ ভালভাবেই চলে যেত, শুনে সাধারণ মানুষ বেশ বাহবাই দিত। কারণ, তখনও সি পি এমের ক্রিয়া-কলাপ দেখার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য জনসাধারণের হয়নি।

কিন্তু এখন দুদিকটাই দেখা হয়ে গিয়েছে। তাই, জনসাধারণের এখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না কার কোনটা আসল রূপ, কে কেমন বস্তু। ওই ঝিমিয়ে থাকা কুমীর যে মোটেই শান্তশিষ্ট জীবটি নয়, ধারে কাছে কেউ গেলেই যে সে খপ করে তাকে কামড়ে ধরবে এটা আজ অনেকেই জানে।

হ্যাঁ কংগ্রেস প্রশাসনকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করছে। এবং,

শুভবুদ্ধির কোনও মানুষই এ জিনিস পছন্দ করে না। কংগ্রেস অধিবেশনের প্রদর্শনীর যোগাযোগের ঠিকানা কেন হবে রাইটার্স বিল্ডিংস ?

কিন্তু এখনও কংগ্রেসী টেকনিক আর সি পি এমী কৌশলে একটা বড় পার্থক্য আছে। কংগ্রেস প্রশাসন ব্যবস্থাকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে, আর সি পি এম প্রশাসন ব্যবস্থাকেই একেবারে দলীয় ব্যাপার করে তুলতে চাইছিল। সি পি এম প্রশাসনকে দলীয় ব্যাপার করে তুলতে চাইছিল বলেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ওইভাবে ভেঙ্গে গেল।

এবং, এখনও সেই যুক্তফ্রন্টের শরিকরা অনেকে তাদের প্রচণ্ড কংগ্রেস-বিরোধিতার মধ্যেও সি পি এমের সেই ক্রিয়াকলাপ ভুলতে পারেনি। ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি, আর এস পি এখনও সেই সি পি এমের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীর ভয়ংকর সক্রিয়তা এবং জ্যোতিবাবুর পুলিশের চরম নিষ্ক্রিয়তার ভয়াবহ দিনগুলি বার বার স্মরণ করে। কংগ্রেসকে গালিগালাজ করার জন্য একটা বিরাট জনসভার আয়োজন করে এখনও ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষকে তাই বার বার সি পি এমের অত্যাচারের কথাও বলতে হয়েছে।

বেশ কয়েক মাস আগে একবার ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। একটা বিয়ে বাড়িতে। ডঃ ঘোষ বললেন : জান বরুণ, জ্যোতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তা আমি বললাম, জ্যোতিবাবু কনগ্রাচুলেসনস, আপনারা যে পথ দেখিয়েছিলেন, এরাও সেই পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আপনারা ভাল শিষ্য পেয়েছেন। সেইজন্য কনগ্রাচুলেসনস। জ্যোতিবাবু অবশ্য বললেন, না না, ওরা বড় বেশি করছে।

তাহলে প্রশ্ন হল, বেশি করছে, না কম করছে ?

সে প্রশ্নে-পরে আসা যাবে। মূল কথা হল, পথ-প্রদর্শক কে ?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ১৯৬৭ সনের আগে ব্যাপক গুণ্ডামি কেউ কখনও দেখেছে? প্রশাসনকে একেবারে দলীয় ব্যাপার করে তোলার চেষ্টা ১৯৬৭-র আগে কেউ করেছে? কংগ্রেস তো ১৯৪৭ থেকে কুড়ি বছর একাদিক্রমে রাজত্ব করেছে। তখন পুলিশ কীভাবে চলত, আর তারপর থেকেই বা কীভাবে চলছে?

১৯৬৭ সনের পর থেকেই দেখা যাচ্ছে সব দলের রাজনৈতিক কর্মীরা সব পাড়ায় বাস করতে পারেন না। এ জিনিস কুড়ি বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে কখনও হয়েছে? কখনও কোনও সি পি এম কর্মী ১৯৬৭ সনের আগে এ অসুবিধা ভোগ করেছেন?

এখন করছেন। কিন্তু কেন করছেন? কারণ, ১৯৬৭ সনে এবং ১৯৬৯ সনে কংগ্রেসী থেকে আরম্ভ করে নানা দলের কর্মীদের তাঁরাই মেরে পাড়া ছাড়া করেছিলেন। এবং সে কাজে পুলিশ তাঁদের সাহায্য করেছিল।

এর কোনও জিনিসটাই ভাল নয়। আজও যে বহু সি পি এম কর্মী পাড়ায় বা কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন নি এটা কংগ্রেস রাজত্বের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, এই অবস্থা এ রাজ্যে এনেছে সি পি এমই।

কিন্তু কংগ্রেসে সি পি এম-এ পার্থক্য কোথায়? কংগ্রেসী রাজত্বে আস্তে আস্তে কতকগুলি পাড়ায় সি পি এম কর্মীরা ফিরে যেতে পারছেন। কংগ্রেস যে শক্তিতে আজ রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফিরে গিয়েছে, সেই শক্তিতে সি পি এম রাইটার্স দখল করতে পারলে সি পি এম বিরোধীরা বা অ-সি পি এম কেউ টিকতে পারত পশ্চিমবঙ্গে?

প্রমোদবাবু জ্যোতিবাবু নিশ্চয়ই বলবেন, হ্যাঁ পারত।

কিন্তু সাধারণ মানুষও কি তাই বলবেন?

সি পি এম বলছে, কংগ্রেস দলীয় স্বার্থে প্রশাসনকে ব্যবহার করছে।

এ অভিযোগ কেউই একেবারে অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং এ জিনিস নিশ্চয়ই নিন্দনীয়।

কিন্তু প্রশাসনকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করার কথা সি পি এম-এর কারু মুখে মানায় কি?

এই বিষয়ে এর আগে বহুবার আলোচনা করেছি। বহু উদাহরণও দিয়েছি। এখন আর নতুন করে সে সব উদাহরণ তুলে ধরব না। শুধু দুটি উদাহরণ জ্যোতিবাবুদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

সেই সুধীন কুমার অনাদি দাস মোকসেদ আলি প্রসঙ্গ মনে আছে? অনাদি দাস ও মোকসেদ আলির সেই অভিযোগ মনে পড়ে? তাঁর দুজন যুক্তফ্রণ্টের এম এল এ-ই বলেছিলেন, সুধীনবাবু তাঁদের ভয় দেখিয়ে এম এল এ পদে ইস্তফা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

সুধীনবাবুর হাতে তখন গোয়েন্দা পুলিশের গোপন রিপোর্ট কে তুলে দিয়েছিল? দুজন এম এল এ-কে ব্ল্যাকমেল করার জন্য একজন বশংবদ মন্ত্রীর হাতে গোপন পুলিশ রিপোর্ট তুলে দেওয়ার চেয়ে জঘন্য কাজ আর কি হতে পারে?

দু নম্বর জিজ্ঞাসা: হেনা গাঙ্গুলিকে কারা খুন করিয়েছিল? কাকে রক্ষা করার প্রয়োজনে?

প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের এর চেয়ে মারাত্মক ঘটনা আর আছে?

কুমীর চুপটি করে মড়ার মত পড়ে থাকার চেষ্টা করলেই কিন্তু সবাইকে সে ঠকাতে পারে না।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭২।

ঘরে বাইরে সি পি আই-এর সঙ্কট

'কৌশল' পারটি সি পি আই এবার বড় মুস্কিলে পড়েছে। তাঁদের মুসকিলটা এসেছে দুদিক থেকে। একটা মুস্কিল ভেতরের; আর একটা বাইরের।

দলের ভেতরের মুশকিলটা নিয়ে একটা বড় রকমের সঙ্কট পাকিয়ে তুলেছেন বিশ্বনাথ মুখার্জি এবং তাঁর সহধর্মিণী গীতা মুখার্জি। তাঁরা দলের বর্তমান রাজ্য নেতৃত্বের উপর সম্প্রতি এতই চটেছেন যে রেগেমেগে একেবারে 'নিরুদ্দেশ' যাত্রা করেছেন। পার্টির কেউ 'জানেন না' তাঁরা কোথায় গিয়ে লুকিয়ে আছেন। বিধানসভায়ও তাঁদের দেখা নেই। দেখা নেই রাজ্য কর্ম-সমিতির বৈঠকেও। যে বিশ্বনাথবাবু এক দণ্ডও চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না তিনিই আজ এত চটেছেন যে রাগে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে গা ঢাকা দিয়েছেন!

আর বাইরের সঙ্কটটা হঠাৎ দেখা দিয়েছে ডাঙ্গে সাহেবের একটা মন্তব্যকে নিয়ে। এ আই টি ইউ সি সম্মেলনে কেরলের ধর্মঘট-বিরোধী আইন নিয়ে বেশ একচোট সমালোচনা হল। সেই সঙ্গেই এল পশ্চিমবঙ্গের শ্রম অরডিন্যান্সের প্রসঙ্গও। এতেও কতগুলি ক্ষেত্রে শ্রমিক ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষণার প্রস্তাব ছিল। কয়েকজন প্রতিনিধি কেরলের আইনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অরডিন্যান্সের তুলনা করে অচ্যুত মেনন-সরকার ও সিদ্ধার্থ রায়-সরকারের বিরুদ্ধে একই সঙ্গে কড়া সমালোচনা করলেন।

আর যায় কোথায়, ডাঙ্গে সাহেব তো শুনে ভীষণ খাপ্পা! বললেন: তোমরা কেমন মানুষ হে, অচ্যুত মেননের মত একজন

সাচ্চা মার্কসবাদীর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সঙ্গে সিদ্ধার্থ রায়ের মত একজন নির্ভেজাল বুর্জোয়ার সরকারের সঙ্গে তুলনা কর।

এমনিতেই নির্বাচনের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে সি পি আইয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। নানা অঞ্চলে নানা কারণে টেনসন চলছিল। ঠিক সেই সময় এল ডাঙ্গে সাহেবের এই মন্তব্য। কংগ্রেসীরা সব একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন: এত বড় কথা, আমাদের প্রিয় মানুদা, যিনি দেশবন্ধুর দৌহিত্র, এত প্রগতিশীল, এমন একনিষ্ঠ সমাজতন্ত্রী, তাঁকে বুর্জোয়া বলা! এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না! এর একটা বিহিত চাই-ই!

সি পি আই নেতারা পড়লেন মহা সঙ্কটে। একে ভেতরে গণ্ডগোল, তার উপরে এই বাইরের উৎপাত! একে ভেতরের একটা অংশ দলের নেতৃত্বের উপর চাপ দিচ্ছে, তোমরা বড় কংগ্রেস ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছ, তোমরা কংগ্রেসের লেজুড়ের মত চলছ—তার উপর এই বিপদ! নেতারা বললেন: আহা, আগে জানি ভাল করে ডাঙ্গে সাহেব কী বলেছেন, তারপর সবটা আলোচনা করে দেখা যাবে। এ নিয়ে এত চটাচটির কী আছে!

কিন্তু 'কী আছে' বললে কে শোনে! শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি যিনি ছাত্রী-জীবন থেকেই ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী এবং সম্প্রতি এ আই সি সি-র অন্যতম সাধারণ সম্পাদিকা হয়েছেন তিনি চান্সটা ছাড়েন কেন! এক জনসভায় তিনি আলটিমেটামই দিয়ে দিলেন সি পি আই-কে: হয় ক্ষমা চাও, না হয় কংগ্রেস-সি পি আই জোটই থাকবে না।

সি পি আই নেতৃত্ব আরও বিপদে পড়লেন। ভেতরের বামপন্থী-সাজতে-আগ্রহী গোষ্ঠীও ভীষণ চাপ দিলেন। বললেন, কভি নেহি, ক্ষমা চাওয়া কিছুতেই চলবে না। পারটির মূল বক্তব্যই হল কংগ্রেস একটা বুর্জোয়া দল। সুতরাং সেই কথা জোর গলায় বলতেই হবে।

তাই হল। বিহ্বল সি পি আই নেতৃত্বও বলতে বাধ্য হলেন: ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমরা আগেই বলেছি কংগ্রেস বুর্জোয়া পার্টি, এখনও তাই বলছি। একশবার তাই বলব।

হায় কৌশল পারটি, আপনাদের আজ কী মুশকিল! এত কৌশল করে আপনারা এতদিন চালিয়ে গেলেন, ১৯৬৭ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী, মধ্যপন্থী, দক্ষিণপন্থী যতগুলি সরকার হল কেমন কৌশলে তার প্রায় সবকটিরই শরিকী ভাগ পেলেন, আর আজ কিনা এই উটকো বিপদ!

তবে, এর কোনও বিপদই দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে বলে মনে হয় না। বিশ্বনাথবাবু ও তাঁর সহধর্মিণী আর যাই করুন পারটি ছেড়ে খুব বেশিদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন না। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেও যিনিই যত চিৎকার করুন না কেন দিল্লীর অনুমতি না পেলে আপনাদের ব্যাপারে কেউ এক পা-ও এগোতে সাহস পাবেন না।

কংগ্রেস-সি পি আই সম্পর্ক কী হবে সেটা সিদ্ধার্থবাবু বা পুরবী দেবী স্থির করবেন না। সেটা ঠিক করে দেবেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী যখন বলবেন, সি পি আই-এর সঙ্গে ভাই ভাই হয়ে আর কোনও প্রয়োজন নেই, তখন দেখবেন আপনারা কিছু না করলেও বা বললেও কংগ্রেসীরা আপনাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করছেন। আজ সি পি এম-এর সঙ্গে কংগ্রেসের যা-সম্পর্ক তখন আপনাদের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক দাঁড়াবে। তার আগে পর্যন্ত আপনারা নাম ধরে ধরে রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের চোর-জোচ্চোর বললেও দলগতভাবে তাঁরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক পা-ও এগোতে সাহস পাবেন না। শুধু গজ গজ করবেন—তার বেশি নয়।

আবার, কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের কী সম্পর্ক হবে সেটাও নিশ্চয়ই আপনারা স্থির করবেন না। সে অধিকার আপনাদের

সর্বভারতীয় নেতাদের, এমনকি ডাঙ্গে সাহেবেরও নেই। কারণ, সেটা স্থির হবে রুশ পররাষ্ট্র নীতির স্বার্থে ও মস্কোর নির্দেশে। বরাবর তাই হয়েছে, ভবিষ্যতেও তাই হবে—যদি না ইতিমধ্যে আপনারা মস্কোর নেতৃত্বকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নেন। তার আগ পর্যন্ত এই বুর্জোয়া-টুর্জোয়া বলে শুধু গায়ের ঝাল মেটাতে হবে। চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনাদের নেই।

আপনারা কি করতে পারেন ? না বড় জোর ব্যক্তিগতভাবে কারু পিছনে লাগতে পারেন। আপনারা কৌশল পারটি, তাই একটা পথ আগেই করে রেখেছেন। বলে রেখেছেন, কংগ্রেসের মধ্যে একটা আছে প্রগতিশীল অংশ, আর একটা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। যাঁকে যখন পছন্দ, যাঁকে যখন প্রয়োজন তখন তাঁকে অনায়াসে প্রগতিশীল বলে চালিয়ে দিতে পারেন। আবার যিনি যখন আপনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে, আপনাদের পথে প্রতিবন্ধক, তখন তাঁকে অনায়াসে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আক্রমণ করতে পারেন। আপনাদের বুদ্ধি আছে, কৌশলপন্থী বহু লোক আপনাদের সঙ্গে আছে, হাতে বেশ পয়সাও আছে—তাই কারু বিরুদ্ধে লাগলে আপনারা অনায়াসে তাকে নাস্তানাবুদও করতে পারেন।

সেইজন্যই দেখুন পার্ক-ষ্ট্রীটের জিৎপাল থেকে আরম্ভ করে রাইটার্স বিল্ডিংসের তরুণকান্তি ঘোষ, বরকাত সাহেব প্রভৃতি সব কেষ্ট-বিষ্টুই আপনাদের ভয় করেন। আপনারা যা যখন চান তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেইমত ব্যবস্থা করেন। এ আই টি ইউ সি সম্মেলনে জিৎপাল সাহেব কেমন ঢালাও ব্যবস্থা করেছিলেন! তরুণকান্তিও দেখুন নিজের কাগজে কী দীর্ঘ বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন : সি পি আই কংগ্রেস ঐক্য অমর রহে! অথচ ইনিই গোপনে সিদ্ধার্থ রায়ের বিরুদ্ধে, প্রিয় দাসমুন্সীর বিরুদ্ধে, দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীর বিরুদ্ধে পার্টির সবাইকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছেন। বলছেন : ওরা সব সি পি আই-এর লোক, ওদের হাতে দলের নেতৃত্ব থাকবে কেন ?

তবে মুশকিলটা হয়ে গিয়েছে আপনাদের র‍্যাঙ্ককে নিয়ে। তাঁরা পার্টির এই কংগ্রেস-ঘেঁষা নীতি সহ্য করতে রাজি নন, তাঁরা কাজে কর্মে আরও লেফটিস্ট বা বামপন্থী হতে চান, তাঁরা সরকার-বিরোধী ভূমিকাই বেশি পছন্দ করেন।

এই দাবি তাঁদের দিনকে দিনকে বাড়বে। দিন যত যাবে তাঁরা তত বেশি বামপন্থী ও সরকার-বিরোধী হতে চাইবেন। আর, তাঁদের কাছে সিদ্ধার্থবাবুদের প্রগতিশীল বলে চালানোও বেশিদিন আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অথচ, মস্কো যতদিন মত না পালটাবে ততদিন নির্ভেজাল কংগ্রেস-বিরোধী বা ইন্দিরা-সরকার-বিরোধীও আপনারা হতে পারবেন না।

আপনাদের তাই শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখতে গেলে চাই তেমন নেতা। যিনি এই অবস্থায় দুইদিক বজায় রেখে এগোতে পারবেন তেমন নেতা। এই কাজ ভাল লোক গোপাল ব্যানার্জিকে দিয়ে হবে না—এজন্য চাই সোমনাথ লাহিড়ির মত লোক—নিদেন পক্ষে বিশ্বনাথ মুখার্জি সুকুমার গুপ্ত কমবিনেশন।

আমার মনে হয়, তাই আগে আপনাদের নেতৃত্বে বদল প্রয়োজন। গোপালবাবু ভাল লোক—তাঁকে রেহাই দিন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩।

সংসদীয় শালীনতা বর্জন করা সুরুচি নয়

আমি শুধু ভাবছিলাম, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বুধবার বিধানসভায় যে কথাটা সি পি আই-কে বলেছেন সেই কথাটা সেইভাবে রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় বললে কী হত? আমি শুধু কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম, আপনারা তো আমাদের লেজুড় ধরে এই বিধানসভায় এসেছেন এই কথাটা সুব্রতবাবু বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সি পি আই সদস্যদের বললে সিদ্ধার্থবাবু তাঁকে কী বলতেন? আমি আরও ভাবছিলাম, এই কথাটা ছোটখাটো কোনও মন্ত্রী বললে মহামান্য স্পীকারই বা তাঁর সম্পর্কে কী মনোভাব দেখাতেন।

গোড়ায়ই বলে রাখা ভাল সি পি আই বা কোনও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আমার কোনও দুর্বলতা নেই। আমি মনে করি, সি পি আই 'কৌশল পার্টি' এবং সি পি আই নেতারা যত বেশি কৌশল করতে যাচ্ছেন ততই তাঁরা বিপদে পড়ছেন। এই প্রসঙ্গে একাধিকবার আলোচনাও করেছি। এই হাওড়া পুলের ব্যাপারেও সি পি আইয়ের কয়েকজন কৌশল করতে গিয়েছিলেন। এই ঠিকাদারির ক্ষেত্রেও তাঁদের গোপন স্বার্থ ছিল।

কিন্তু সি পি আই 'কৌশল পার্টি' বা সি পি আই নেতারা কৌশলপন্থী বলেই সিদ্ধার্থবাবুর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওই দলকে বা ওই দলের নেতাদের যা ইচ্ছা তাই বলার অধিকার আছে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। তিনি মুখ্যমন্ত্রী বলেই তাঁর কোনও বিশেষ অধিকার আছে তাও ধরে নেওয়া অসম্ভব।

সিদ্ধার্থবাবু বিধানসভায় সি পি আই সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন সেটা যে শুধু সংসদীয় রীতি বিরুদ্ধ তাই নয়, সেটা শালীনতা বিরোধীও। সংসদীয় রীতি বলে, কেউ কারু দয়ায় বিধানসভা বা

সংসদে আসে না—আসে জনগণের রায়ে। এই মর্মে স্পীকার অপূর্বলাল মজুমদার কিছুদিন আগেই এই বিধানসভায় মন্তব্য করেছিলেন। সংসদীয় রীতিতে ধরে নেওয়া হয়, যাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁরা ভোটদাতাদের সমর্থনেই এসেছেন, বিশেষ কারু দয়ায় আসেননি।

আর যদি দয়ার কথা তুলতে হয় তাহলে তো অনেক কিছুই এসে পড়ে। যে হাঙ্গর-ভাঙ্গররা নির্বাচনের টাকাটা জোগায় তারা অনেক পারটি ও প্রার্থীকেই বলতে পারে, আমাদের দয়ায়ই তো তোমরা এসেছ। যে মস্তানরা ভোটযুদ্ধের একটা বড় দিক চালায় তারাও বলতে পারে বহু প্রার্থী এবং দলকে, আমরাই দয়া করে তোমাদের জিতিয়েছি। যাঁরা জাল ভোট দেয় তারাও বলতে পারে অনেককে, আমাদের দয়ায়ই তোমরা এসেছ।

দয়ার কথা তুলতে গেলে ওই অনেক কথা এসে পড়ে এবং তার ফলে এই সংসদীয় গণতন্ত্রের অনেক ফাঁকই ধরা পড়ে। সেইজন্যই যাঁরা এই ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁরা ওসব কথা তোলেন না এবং সেইজন্যই ওসব কথা তোলা সংসদীয় রীতি-বিরুদ্ধ। সংসদীয় রীতি হল, ধরে নেওয়া যে সকলেই জনগণের রায়ে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন।

বলতে পারেন, ওসব তো মশাই 'অ-রাজনৈতিক' দয়ার কথা হল, সিদ্ধার্থবাবু যা বলেছেন তা স্রেফ রাজনৈতিক দয়ার প্রশ্ন। সত্যিই তো সি পি আই-এর এবার যে এত লোক নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেটা কংগ্রেসের দয়ায়। কংগ্রেস সমর্থন না করলে অত সি পি আই জিতে আসতে পারতেন?

ধরেই না হয় নিলাম একথাটা ঠিক। কিন্তু এইরকম ঠিক কথা কি তাহলে আরো তোলা যায় না? যেমন ধরুন, বলা কি যায় না যে, কংগ্রেস যে আবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে,

সিদ্ধার্থবাবু যে আজকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেটাও সি পি আই প্রভৃতিদেরই দয়ায় ? সি পি আই যদি ১৯৬৯ সনে বলত, না, আমরা সি পি এম-এর সঙ্গেই চলব, আমরা ওদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব রাখব, তাহলে কি কংগ্রেস নির্বাচনে জিতে আর কোনও দিন রাইটার্স বিল্ডিংসের মুখ দেখতে পারত—না সিদ্ধার্থবাবু বঙ্গেশ্বর হয়ে বসতে পারতেন ?

হয়ত বলবেন, সি পি আই নিজ স্বার্থেই সি পি এম-কে বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়তে দেয় নি—সি পি আই নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রিত্বে মন্ত্রিসভা গঠনে সর্বতোভাবে বাধা দিয়েছে।

কথাটা ঠিকই। রাজনীতি প্রেম নয়—রাজনীতিতে মূর্খ ছাড়া আর সবাই নিজ স্বার্থের বিবেচনায়ই কাজ করে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে অজয়বাবু পদত্যাগ করার পর সি পি আই যে সি পি এমের নেতৃত্বে বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়ার ব্যাপারে সর্বতোভাবে বাধা দিয়েছিল সেটা নিজ দলের স্বার্থেই। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, কংগ্রেস যে এবারের নির্বাচনে সি পি আই-কে সঙ্গে নিয়েছিল সেটাও নিজ স্বার্থের তাগিদেই। কংগ্রেসের তখনও ভয় ছিল। কংগ্রেস নেতৃত্বের তখনও আশঙ্কা ছিল যে একা লড়তে গেলে তাঁরা হেরে যেতে পারেন, তাই সি পি আই-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন—সি পি আই-এর প্রতি প্রেমবশত কংগ্রেস নেতৃত্ব নির্বাচনী সমঝোতা করেননি। তবে, নির্বাচনের ফলাফল এমন হবে জানলে নিশ্চয়ই কংগ্রেস নেতৃত্ব সি পি আই-কে অতগুলি আসন ছেড়ে দিতেন না।

আবার, যদি এও ধরে নেই যে কংগ্রেস নেতৃত্ব স্রেফ দয়াপরবশতই সি পি আই-কে এতগুলি আসন ছেড়ে দিয়েছিল তাহলেও বলতেই হবে সিদ্ধার্থবাবুর মন্তব্যটা সুরুচির পরিচায়ক নয়। যে ব্যক্তি কাউকে সাহায্য করে পরে তার সঙ্গে মতান্তর হলে চিৎকার করে বলে, আমি তোমাকে খেতে পরতে দিয়ে বাঁচিয়েছি, আর তুমি

আমার সঙ্গে তর্ক করছ, তাঁকে আমরা আর যাই বলি ভদ্রলোক বলি না।

আর, যদি সাহায্যের কথা ওঠে তাহলে সিদ্ধার্থবাবুকে যত খোটা দেওয়ার সুযোগ অন্যান্যদের আছে তত আর কোনও ক্ষেত্রে রয়েছে কি? জ্যোতিবাবু স্নেহাংশুবাবু সিদ্ধার্থবাবুকে বলতে পারেন: যখন তুমি প্রফুল্ল সেন অতুল্য ঘোষের তাড়া খেয়ে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হলে তখন আমরাই তো তোমাকে দয়া করে ঠাঁই দিয়েছিলাম। আবার অতুল্যবাবু এবং প্রফুল্লবাবুও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জন্য বলতে পারেন: চীন আক্রমণের পর কমিউনিস্টদের বিপদ দেখে তুমি যখন কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করছিলে তখন অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও আমরাই তো তোমাকে দয়া করে কংগ্রেসে ঢুকতে দিয়েছিলাম।

ওসব অতীতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বর্তমানে চলে এলেও দেখা যায়, সিদ্ধার্থবাবু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কারণ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চেয়েছিলেন। এখন যদি সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে কোনও বিষয়ে মতান্তর হলেই প্রধানমন্ত্রী প্রকাশ্যে বলেন, তুমি আমার দয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমারই মুখের উপর বড় বড় কথা বলছ, তখন সেটা কি খুব বাহবা দেওয়ার মত কথা হবে?

দায়িত্বশীল পদে বসার অনেক অসুবিধা। একটা বড় অসুবিধা, যা তা বলা যায় না। একজন সাধারণ এম এল এ-র মুখে যে কথা খুব খারাপ শোনায়, একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সেই কথাই অত্যন্ত কুৎসিৎ শোনাতে পারে।

কিন্তু এইসব ঝগড়াঝাটি, পরস্পরের প্রতি কটূক্তি এগুলির প্রয়োজনই বা কী, আসল বিচারে এসবের গুরুত্বই বা কতটুকু? এই যে ধরুন মণি সান্যালের অপসারণ নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছে, চূড়ান্ত বিচারে এর গুরুত্বই বা কতটুকু? আসল কথা হল, পুলটা হবে কি

না? প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এই পুল হবে কি হবে না সেই আলোচনা চলছে। বছরের পর বছর মানুষ শুনছে, হচ্ছে, হচ্ছে। কিন্তু এখনও কিছুই হল না। যদি এই পুল না হয় তাহলে মানুষ চটবেই। মণি সান্যাল ব্রিজ কমিশনারের চেয়ারম্যান থাকলেও চটবে, না থাকলেও চটবে। আর যদি পুলটা হয়ে যায় তাহলে মানুষ মণি সান্যালকে সরানোর ব্যাপারটা ভুলেই যাবে। আসল জিনিস পুল—মণি সান্যাল বা ভোলা সেন নন।

সি পি আই কার দয়ায় বিধানসভায় এসেছে বা আসেনি তা নিয়েও সাধারণ মানুষের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই। তাঁদের আসল প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান হবে কিনা; অন্তত সেগুলি সমাধানের নিষ্ঠাবান, সৎ এবং দৃঢ় একটা প্রচেষ্টা হবে কিনা।

মানুষ শুধু এই ব্যাপারে জানতে আগ্রহী। জানতে আগ্রহী বেকার ছেলেরা চাকরী পাবে কিনা, জানতে আগ্রহী গরীব মানুষের দারিদ্র কিছুটা ঘুচবে কিনা, জানতে আগ্রহী নিরন্নরা দুবেলা দু'মুঠো খেতে পাবে কিনা, জানতে আগ্রহী পশ্চিমবঙ্গের হাঙ্গর-ভাঙ্গরদের লীলাখেলা বন্ধ হবে কিনা। সি পি আই-কংগ্রেসের ঝগড়ায় বা সিদ্ধার্থবাবুর মুখে খুব কড়া কড়া কথা শুনতে তাঁরা মোটেই আগ্রহী নন। ওতে তাঁদের কিছুই এসে যায় না।

তাই, সিদ্ধার্থবাবু অন্য সব ভুলে গিয়ে কাজের কাজে মন দিলেই ভাল হয়। তাতে পশ্চিমবঙ্গেরও মঙ্গল হবে, তাঁর নিজেরও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৩।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে টাকার খেলা

কিছুদিন আগেই নাকি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর দিল্লির কর্তাদের জানিয়েছেন যে, এ রাজ্যে কংগ্রেসের ঝগড়ায় টাকার খেলা সুরু হয়েছে। কিছু শিল্পপতি নাকি এই ঝগড়াটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য টাকা ও গাড়ি দিয়ে নানা উপদলকে সাহায্য করছেন। তাঁরা নাকি এই সম্পর্কে কতগুলি উদাহরণও দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের সেই গোপন রিপোর্ট দেখি নি। সুতরাং, বলতে পারছি না এই রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তাঁরা কী কী বলেছেন বা কোন্ কোন্ উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যাঁরা গত দশ পনেরো বছর ধরে ঘনিষ্ঠভাবে দেখছেন তাঁরা সবাই বুঝতে পারছেন যে, এই টাকার খেলার অভিযোগটা মোটেই অসত্য বা ভিত্তিহীন নয়। বাইরের কারো পক্ষেই নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, কোন্ পার্টি বা কোন্ নেতা কত টাকা কার কাছ থেকে নিচ্ছেন। তবে টাকা খরচা বাড়লে সেটা নিশ্চয়ই সকলেরই চোখে পড়ে। গাড়ি, বাড়ি, পোস্টার, ফেসটুন বা মিটিং-এর ডায়াসের বহর —এসব দেখলেই বোঝা যায়, টাকা পয়সার অবস্থাটা কার কেমন। খরচাটা কী পরিমাণ বেড়েছে তাও মোটামুটি অনুমান করা যায়।

এইভাবে দেখেশুনেই আজ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস রাজনীতিতে প্রচুর টাকা আসছে। নেতা বলে পরিচিত ছোটোখাটো ব্যক্তিরাও যেভাবে বোঁ বোঁ করে নতুন নতুন গাড়ি চড়ে বেড়ান, যেভাবে কথায় কথায় এরোপ্লেনে হিল্লিদিল্লি ছোটেন, যেভাবে তাঁদের খরচা করতে দেখা যায় বা যেভাবে ভাল ভাল রঙ দিয়ে দেয়ালে

দেয়ালে লিখে নানা নেতার নামে 'যুগ যুগ জিও' ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে টাকা প্রচুর আসছে।

একটা গাড়ি বোঁ বোঁ করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরলে তার মাসিক খরচা অন্তত হাজার টাকা। একবার দিল্লি গিয়ে ফিরতে প্লেন ভাড়া লাগে প্রায় ন'শ টাকা, একটা বড় যুগ যুগ জিও দেয়ালে লিখতে রঙই লাগে প্রায় পঞ্চাশ টাকার। একটা মিটিং-এর ভাল ডায়াস ও মাইকের ব্যবস্থা করতে লাগে কম করেও হাজার টাকা। তার উপর তো আছে নিজেদের পকেট খরচা এবং ভাইদের দৈনন্দিন ব্যয়। আমরা কয়েকজন সাংবাদিক একটা মোটামুটি হিসাব করে দেখেছি, মন্ত্রীদের সরকারী গাড়ির কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস রাজনীতিতে এখন নিয়মিত সত্তর আশীখানা গাড়ি খাটে। অর্থাৎ, বাঁধা গাড়ি বাবদই খরচা হচ্ছে মাসে কম করেও সত্তর আশী হাজার টাকা। অন্যান্য খরচা এর চেয়েও অনেক বেশি।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কংগ্রেসী ছেলেরা, এখন যাঁরা অনেকে নেতা বলে পরিচিত এবং এই সেদিন পর্যন্তও যাঁরা খুব সাধারণ জীবনই যাপন করতেন, আজ তাঁদের চালচলন দেখলে চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যায়। খরচায় ও চালচলনে এঁরা অনেকে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা চেয়ারম্যানদেরও হার মানান। একজন মফঃস্বলের এম-এল-এ, কিছুদিন আগেও যাঁকে দেখেছি বেশ ভাল মানুষ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, এখন তাঁকেই বিধানসভার লবিতে দেখি নিয়মিত ৫৫৫ বা বেনসন অ্যাণ্ড হেজেস সিগারেট খাচ্ছেন।

কিন্তু তা বলে এটা বলা ভুল হবে যে পশ্চিমবঙ্গে গাড়ি বা টাকার খেলাটা এই সবে সুরু হয়েছে। আসলে এটা সুরু হয়েছে ১৯৬৭ সন থেকেই। তখন থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে টাকা ও গাড়ির ছড়াছড়ি দেখা যায়। তখন থেকেই দেখা যায়, ব্যাপক হারে নেতাদের বিলাসব্যসন বাড়ার ব্যাপারটা।

আমি যখন রিপোর্টিং-এ আসি তখন দেখেছিলাম প্রদেশ কংগ্রেসের তিনখানা গাড়ি আর গোটা বামপন্থী রাজনীতি একখানা মাত্র গাড়ি। সে গাড়ী ছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির। শোনা যায়, সেই গাড়িখানা আনন্দীলাল পোদ্দার জ্যোতিবাবুকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। আর কোনও বামপন্থী নেতা বা দলের তখন গাড়ি ছিল না। বামপন্থী নেতাদের ট্যাক্সি চড়তেও সচরাচর দেখতাম না। হেমন্ত বসুর মত নেতারা তো প্রায় সব সময়ই ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঘুরতেন।

আর সেই অবস্থা ১৯৭১-৭২ সনে কী রকম দাঁড়িয়েছিল জানেন? সব ফ্রন্ট নেতা এবং সব অফিস মিলিয়ে একমাত্র সি পি এমেরই নিজস্ব গাড়ির সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শুধু এই কলকাতায়ই অন্তত ১৫ খানা। সি পি আইয়ের ছিল ৩ খানা। অন্যান্য পার্টি ঠিক গাড়ি কিনে উঠতে পারেন নি। তাঁরা সাধারণত চেয়েচিন্তে বা ভাড়া করে গাড়ি চাপতেন। নেতাদের দেখতাম প্রায় সব সময়ই ট্যাক্সি চড়েন। একখানা গাড়ির দাম প্রায় ২২ হাজার টাকা। তাহলে ১৫ খানা গাড়ির দাম কত ভাবুন!

চালচলনেও নেতারা অদ্ভুতভাবে পাল্টে গিয়েছিলেন। যে নেতা বিড়ি খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা মারতেন তাঁকেও দেখেছি ২ টাকা প্যাকেটের সিগারেট খেতে, যে নেতা পার্টি অফিসের বেঞ্চিতে শুয়ে অধিকাংশ রাত কাটাতেন তাঁকেই দেখেছি এম-পি হয়ে দিল্লি গিয়ে বাংলোবাড়ির জন্য তদবির করতে। একজন ভীষণ বিপ্লবী মন্ত্রীকে একবার দেখেছিলাম উঠতে পারছেন না রাইটার্স বিল্ডিংসের ঘর থেকে, কারণ বেয়ারা একটু অন্য কাজে গিয়েছে, ব্যাগ বইবে কে!

পয়সা যে শুধু কংগ্রেসীদের হাতে এসেছে তাই নয়, পয়সা বামপন্থীদের হাতেও এসেছে। শুধু গাড়ি নয়, সি পি এম কলকাতা শহরে প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া দেয় কয়েক হাজার টাকা। ১৯৭১-

৭২ সনে গণ্ডগোল সুরু হওয়ার পর সি পি এম নেতৃস্থানীয় কমরেডদের জন্য মোটা সেলামী নিয়ে অনেকগুলি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে কলকাতার অপেক্ষাকৃত কম ঝামেলার অঞ্চলে। সি পি এম এবং সি পি আই দুই পার্টিই হোলটাইমারদের 'ভাতাও' অনেকটা বাড়িয়েছেন।

টাকা না হাতে এলে নিশ্চয়ই তাঁরা এসব করতে পারতেন না। হাতে তাঁদের প্রচুর টাকা এসেছে ও আছে। কত টাকার লেন-দেন হলে একটা পার্টির ক্যাসিয়ার বেমালুম দেড় লাখ টাকা সরাতে পারেন ভাবুন একবার!

১৯৬৭ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একদিকে যেমন এসেছে গুণ্ডামী, আর একদিকে তেমন এসেছে টাকা ও গাড়ি। সকল পক্ষেই এসেছে। গুণ্ডামীটাও যেমন কোনও এক পার্টির একচেটিয়া ব্যাপার থাকে নি, তেমনি টাকা ও গাড়ির ব্যাপারটাও কোনও এক দলের মনোপলি থাকতে পারে নি। সবাই তা পেয়েছেন।

প্রশ্ন হল, পেয়েছেন তো, কিন্তু দিয়েছেন কারা? এত টাকা, এত গাড়ি নিশ্চয়ই চাঁদা বা তোলায় (অর্থাৎ জোর করে আদায়ের) মাধ্যমে আসে নি। চাঁদা ও তোলার টাকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীচের লেভেলেই খরচ বা লোপাট হয়ে গিয়েছে। ভাইরাই তার সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁদের ট্যাক্সি খরচা, অস্ত্র-শস্ত্র কেনার খরচা, খাওয়া থাকার খরচা ইত্যাদি বাবদই স্থানীয় চাঁদা বা তোলার টাকাটা চলে গিয়েছে। কিছু লোপাটও হয়েছে। অ্যাক্সান স্কোয়াডের খরচা হাতি পোষার চেয়েও বেশি।

তাহলে ওপরের তলার নেতাদের এবং প্রাদেশিক ও জেলা পর্যায়ের খরচার টাকাটা এসেছে বা আসছে কোথা থেকে?

আমি যতটা জানি, এই টাকার একটা অংশ এসেছে পারমিট

লাইসেনস ইত্যাদি বাবদ (এ ব্যাপারেও কেউ বাদ যাননি), আর একটা অংশ এসেছে কিছু শিল্পপতিদের কাছ থেকে। শিল্পপতিরাও প্রায় সব দলকেই টাকা দিয়েছেন। কাউকে কম, কাউকে বেশি। কাউকেই একেবারে বঞ্চিত করেন নি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, শিল্পপতিরা নিজেরাই কী এত টাকা দিয়েছেন? বা যত টাকা তাঁরা দিয়েছেন তার সবটা কি তাঁদেরই টাকা?

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭-র পর থেকে যে তিনটা নির্বাচন হয়ে গিয়েছে তাতে সব পার্টি মিলিয়ে প্রায় ৬।৭ কোটি টাকা খরচা করেছেন। এর একটা অংশ, ধরুন ২।৩ কোটি টাকা না হয় চাঁদা ও তোলা বাবদ এসেছে। বাকি যে ৩।৪ কোটি টাকা তা দিল কে?

শিল্পপতিরা?

দীর্ঘদিন ধরেই তো আইনত কোম্পানীগুলির রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দেয়া বন্ধ। তাহলে এই তিন-চার কোটি টাকা নিশ্চয়ই শিল্পপতিরা দিয়েছেন তাঁদের কালো টাকা থেকে।

কিন্তু তাঁরা কি অত কালো টাকা অপরকে দেওয়ার পাত্র? এখনও যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনীতিতে তাঁরা মাসে ৬।৭ লক্ষ টাকা করে জুগিয়ে যাচ্ছেন সেটাও কি তাঁরা দিচ্ছেন নিজেদের কালো টাকা থেকে? এও বিশ্বাস্য? শুনেছি, কালো টাকার জন্য কলকাতার এক বিশিষ্ট হাঙ্গর তাঁর ছোট ভাইকে ছাদ থেকে ঠেলে মেরে ফেলেছিল। আর সেই গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের এত কালো টাকা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তুলে দেবে?

নাকি এটা বিদেশী টাকা? বিদেশীরাই কি তাঁদের বিশ্বস্ত শিল্পপতিদের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে টাকা খাটাচ্ছেন?

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের উচিত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ঢালাও টাকার রহস্যটা খুঁজে বের করা। তা যদি তাঁরা না

করতে পারেন তাহলে জানবেন, পশ্চিমবঙ্গের বিপদ আরো বাড়বে। যাঁরাই টাকা ঢালুন কোনও অসৎ মতলব ছাড়া ঢালছেন না।

কিন্তু তাঁরা কারা এবং তাঁদের উদ্দেশ্যটাই বা কী সরকারকে তা জানতে হবে না? সরকার এটা নিশ্চয়ই জানেন, কোন্ কোন্ মন্ত্রী বা নেতার মাধ্যমে টাকাটা আসছে। কিন্তু ওইটুকু জানলেই চলবে না। এদের সূত্র ধরে এই রহস্যের মূলে যেতে হবে।

২৫শে মে, ১৯৭৩।

সি-পি-আই অভিযানের লক্ষ্য কাশীকান্ত মৈত্র

সি পি আইয়ের একটা খেলা অংশত সফল হয়েছে—খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্ত মৈত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা একটা ভাল রকমের অভিযান সুরু করতে পেরেছেন। এই অভিযানে তাঁদের এতটা সাফল্যের অবশ্য কয়েকটি বিশেষ কারণও আছে।

এক নম্বর কারণ, মন্ত্রিসভারই দু তিনজন সদস্য গোপন স্বার্থে ও উদ্দেশ্যে কাশীকান্ত-বিরোধী অভিযানে যোগ দিয়েছেন।

দু নম্বর কারণ, খাদ্য দফতরের কয়েকজন বড় অফিসারও কখনও গোপনে, কখনও প্রায় প্রকাশ্যে এই অভিযানে মদত দিয়েছেন। ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের কয়েকটি বড় ঘর থেকে গত প্রায় দু'মাস ধরে যেভাবে বিভাগীয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে, তা অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব।

তিন নম্বর কারণ, কয়েজন রাম নাম সৎ হ্যায়ও কাশীবাবুর বিরুদ্ধে লেগেছেন।

কিন্তু যিনি যে কারণেই কাশীকান্ত বিরোধী অভিযানে যোগ দিয়ে থাকুন না কেন, লাভটা প্রধানত হয়েছে সি পি আইয়ের। প্রকাশ্যে প্রথমে সি পি আই-ই কাশীকান্তের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করতে চেয়েছিলেন এবং সেই অভিযান এখন পুরোদমে চালু হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন হল, সি পি আই কেন কাশীকান্ত বিরোধী অভিযান করতে চেয়েছিল?

যতটা জানা ও বোঝা গিয়েছে এর দুটো কারণ। প্রথম কারণ, কাশীকান্তের উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধিতা। কাশীকান্ত চিরকালই

উগ্র কমিউনিস্ট বিরোধী। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় থেকেও বা কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় ঢুকেও এবং কংগ্রেস সি পি আই ঐক্য থাকা সত্ত্বেও কাশীকান্তের কমিউনিস্ট বিরোধিতা কমে নি। তিনি হাটে-মাঠে কমিউনিস্ট বিরোধী, সি পি আই বিরোধী বক্তৃতা দিয়ে চললেন। এমন কি বারকয়েক বিধানসভায়ও সি পি আই বিরোধী আক্রমণ চালালেন।

সি পি আই তাই প্রথম থেকেই কাশীকান্তের উপর চ'টে ছিল। বলতে পারেন, তাহলে তো সি পি আইয়ের জয়নাল আবেদিনের উপরও সমানে চটা উচিত ছিল। তিনিও তো কমিউনিস্ট বিরোধী মন্ত্রী। হ্যাঁ, সি পি আই জয়নাল আবেদিনের উপরও চটা। কিন্তু জয়নাল আবেদিন তাঁদের এক নম্বর টার্গেট নয়। কারণ, সি পি আই জানে জয়নাল আবেদিন গলা সর্বস্ব কমিউনিস্ট বিরোধী। কাশীকান্ত তা নয়। তাই, মন্ত্রীদের মধ্যে কাশীকান্তই সি পি আইয়ের এক নম্বর টার্গেট হলেন।

দ্বিতীয় যে কারণে সি পি আই প্রকাশ্যে ঘোরতর কাশীকান্ত বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করল তাও রাজনৈতিক। সি পি আই নেতারা জানতেন, এ বছর গোটা দেশেই খাদ্য সংকট দেখা দেবে। জানতেন খাদ্য সংকট দেখা দেবে পশ্চিমবঙ্গেও। তাঁরা এও জানতেন গ্রামে চালের দাম বাড়বেই ও শহরে রেশনে চালের পরিমাণ কমবেই। এবং তার ফলে মানুষ সরকারের উপর ও বিশেষ করে খাদ্যমন্ত্রীর উপর চটবেই।

সি পি আই তাই আগাম কাশীকান্ত বিরোধী অভিযান সুরু করে দিয়ে এগিয়ে থাকতে চাইল—যাতে ভবিষ্যতে জনসাধারণকে বলতে পারে, আমরা তো আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম যে কাশীকান্তকে দিয়ে হবে না।

সি পি আই যদি পি ডি এ-তে না থাকত, যদি গোটা সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার মত রাজনৈতিক সুযোগ তাদের থাকত

তাহলে তারা এই কৌশল অবলম্বন করত না। যেমন অষ্টবাম রাজ্যের খাদ্যপরিস্থিতির জন্য গোটা সরকারকে দায়ী করছে, সি পি আইও তাই করত।

কাশীকান্ত মৈত্রও গোড়া থেকেই কতগুলি ভুল করেছিলেন।

তাঁর প্রথম ভুল হয়েছে এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর হাতে নেওয়া। কাশীকান্ত কংগ্রেসী মন্ত্রী হলেও কংগ্রেস পার্টির ভেতরের লোক নন। সংকটজনক পরিস্থিতিতে খাদ্য দফতর হাতে নিলে যতটা পার্টি সমর্থন প্রয়োজন কাশীকান্ত মৈত্র তা কিছুতেই পেতে পারেন না। বরং কংগ্রেসের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রীকে বলির পাঁঠা করার প্রবণতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক।

এই অবস্থার এক শোচনীয় শিকার হয়েছিলেন প্রথম যুক্তফ্রণ্টে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। মন্ত্রীসভা গঠনের সময় সবাই ধরে করে ডঃ ঘোষকে খাদ্য দফতর গছালেন এবং তারপর খাদ্য সংকট যত ভয়াবহ হল সি পি এম, সি পি আই প্রভৃতি ফ্রণ্টের প্রায় সব দল ততই ডঃ ঘোষকে বলির পাঁঠা করতে চাইলেন। এমনকি, একবার মন্ত্রীসভার রেশন কমাবার সিদ্ধান্ত হওয়া সত্ত্বেও সি পি এমের মন্ত্রীরা বাইরে গিয়েই বিবৃতি দিলেন—এটা ডাঃ ঘোষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত, রেশনে চাল কমাবার জন্য আমরা দায়ী নই, দায়ী একমাত্র খাদ্যমন্ত্রী।

আপনি জোর করে লেভি আদায় করতে গেলেও বিপদ। কারণ দল তাতে মরে। আপনি রেশন কাটলেও বিপদ। কারণ শহুরে লোক তাতে চটে। এই সংকটে ডঃ ঘোষ পড়েছিলেন। এই সংকটে কাশীবাবুও পড়েছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্য পরিস্থিতির জন্য বাইরে গালিগালাজ খেয়েছেন, কিন্তু সরকার ও দলের মধ্যে কখনও বিপদে পড়েন নি। কারণ, দল ছিল তাঁর সঙ্গে। তিনি ছিলেন দলের নেতা। ১৯৬৫-৬৬

সনে জোর করে লেভি আদায় করতে গিয়ে তিনিও কম বিপদে পড়েন নি। তাঁর পর এখনও পর্যন্ত আর কেউ ওপথে যান নি—অর্থাৎ যেতে সাহস পাননি। এবারও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় এবং তাঁর মন্ত্রীসভা বার বার বলেছেন, জোর করে লেভি আদায় করতে যাওয়া অনুচিত হবে। বলেছেন, প্রফুল্ল সেন, যে ভুল করেছিলেন আমরা যেন সে ভুল না করি। অথচ এখন সি পি আই তো বলছে, মন্ত্রিরাও কেউ বললে লেভি না আদায়ের জন্য কাশীবাবু দায়ী!

কাশীকান্তের দ্বিতীয় কাল, খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মধু। ফ্রি-স্কুল ষ্ট্রীটের খাদ্য ও সরবরাহ দফতর শুধু যে ভৌগোলিক অবস্থানে করপোরেশন বাড়ির পাশাপাশি তাই নয়—দুটো বাড়ির ভেতরের পরিস্থিতিও প্রায় সমান। দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। পারমিট, লাইসেন্সের একটা পীঠস্থান ওই বাড়িটা। ওই বাড়িটা বা ওই দুটো বাড়ি ভেঙ্গে না দিলে এখানের দুর্নীতি বন্ধ করা অসম্ভব। ওই বাড়ির মন্ত্রীত্ব যিনি বেশি দিন করবেন তাঁকে পস্তাতেই হবে। চোর অপবাদ তাঁর জুটবেই।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের ব্যাপারটাই দেখুন না। যখন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন তখন জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ জানত অত বড় চোর আর নেই। কোটি কোটি টাকা জমিয়েছে চুরি করে। যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব সুরু হওয়ার পর এ নিয়ে বহু গোপন তদন্তও হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও দিন কিছু পান নি। পান নি, কারণ প্রফুল্ল সেন নিজে কোনও দিন চুরি করেন নি। আজ যদি তাঁকে কেউ থাকতে বাড়ি না দেয়, খেতে টাকা না দেয়, বছরের জামা কাপড়টা কিনে না দেয় তাহলে তাঁর বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু সেই প্রফুল্ল সেনকেও চোর অপবাদ বিশেষভাবে নিতে হয়েছে, কারণ তিনি খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন।

তা বলে কি তাঁর আমলে খাদ্য দফতরে দুর্নীতি ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। বেশ ভালভাবেই ছিল। যেমন ছিল ডঃ ঘোষের

আমলে, যেমন ছিল বিশুদ্ধতম মারকসবাদী সুধীনকুমারের আমলে, যেমন ছিল ভাল লোক প্রভাস রায়ের আমলে এবং যেমন আছে কাশীকান্তেরও আমলে। অত কোটি কোটি টাকার পারমিট লাইসেন্সের ব্যাপার যেখানে, সেখানে দুর্নীতি থাকবেই এবং সেই দফতরের উপর পার্টির ধান্দাবাজদের নজরও থাকবেই।

কাশীকান্ত পার্টির ভেতরের লোক না হয়েও এই মধুভরা দফতরটা নিয়ে একটা বড় ভুল করেছেন।

আমি শুধু ভুষির ব্যাপারটা বলব। ভুষি নিয়ে বহুকাল ধরেই দুর্নীতি চলছে। ১৯৬৪-৬৫ সনের আনন্দবাজারের ফাইল যদি দেখেন দেখবেন তখনও ভুষির কালোবাজারী কেমন চলত। তখন প্রফুল্লবাবুর পেছনে পেছনে ছায়ার মত একজন কংগ্রেসী এম এল এ ঘুরতেন। লোকে তাঁকে বলত ভুষি দে। সেই ভুষি দে এবং তিন-চারজন রাম নাম সৎ হ্যায় তখন গোটা ভুষির চোরাকারবারটা চালাত। তারপর প্রফুল্লবাবু চলে যাওয়ার পর ওই ভুষি দে-ও বিদায় নিলেন। কিন্তু ওই রামনামরা ঠিকই থেকে গেল। কয়েকজন অফিসার তাদের সহযোগী হলেন। ওপরে সিন্নি চড়িয়ে তাঁরা গোটা ভুষির কারবারটা কব্জা করে নিলেন।

এবার কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরই কিছু লোক কংগ্রেসী ছেলেদের মাথায় ঢোকালো, এ কেমন ব্যাপার, ওরা কেন ভুষির কারবারটা দখল করে রাখবে? তোমরা এটা হাতে নিয়ে নাও। টাকাটা কিছু বাঙ্গালী ছেলের হাতে আসুক।

কংগ্রেসী ছেলেরা সেই ফাঁদে পা দিল। এইভাবে তাঁরা টায়ার বিক্রির ব্যাপারেও ফাঁদে পা দিয়েছিল। এমনি ভাবে টায়ারের চোরাকারবারটাও বাঙ্গালী ছেলেদের হাতে নিয়ে আসার প্রস্তাব হয়েছিল। হয়েও ছিল তাই। কিন্তু চাপ দিয়ে পরিবহনমন্ত্রী টায়ারের ব্যাপারটা সরবরাহ দফতর থেকে নিয়ে নেন। তাই টায়ারের চোরাকারবারের ফলাও কারবারটা আগেও যাদের হাতে

ছিল, এখনও তাদের আছে এবং ও ব্যাপারে তেমন হৈ চৈও হচ্ছে না।

কিন্তু ভূষির কারবারটা রামনামদের এবং অফিসারদের হাতছাড়া হল। ফলে, গোপন তথ্য সব ফাঁস হতে থাকল। অনভিজ্ঞ কাঁচা বাঙ্গালী ছোকরারা আর কত ভাল চোর হবে—ধরা পড়ার মত অনেক নজির তারা রেখেছিল! এখন তাই টপাটপ সব ধরা পড়ছে।

আর অফিসাররা এবং রামনামরা এখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

এ তদন্ত সম্পর্কেও তারা নিশ্চিন্ত। কারণ তদন্তের ভার পড়েছে এমন কিছু অফিসারের উপর, যাঁরা কমিউনিস্টদের বিশেষ সহযোগী ছিলেন বলে একদা কংগ্রেসীদের হাতে নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন। তাঁরা এখন বদলা নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং, এ সুযোগ কিছুতেই হেলায় হারাবেন না।

কাশীবাবু বলতে পারেন, তিনি এই ভূষির পারমিটের ব্যাপারে দায়ী নন। কারণ, তিনি দলের লোকদের নিয়ে একটা কমিটি করে দিয়েছিলেন এবং সেই কমিটি যার যার নাম সুপারিশ করেছে তাকে তাকেই পারমিট দেওয়া হয়েছিল। তিনি তার বাইরে কিছু করেন নি।

কিন্তু আইনত তিনি দায়ী না হলেও এই কেলেংকারীর নৈতিক দায়িত্ব তাঁর পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ ব্যাপারটা ঘটেছে তাঁর দফতরেই। এবং ভূষির কেলেঙ্কারি নিয়ে যখন প্রথম কথা উঠল তখনই তিনি এ সম্পর্কে তদন্ত করতে বললেন না কেন? কেন খাদ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যাপারটা জানালেন না? তিনি কি কিছুই জানতে পারেন নি?

আর দুর্নীতি দুর্নীতিই। তার কোনও জাতিভেদও হওয়া উচিত নয়। কিছু অফিসার এবং কয়েকজন রামনাম তাদের স্বার্থে ঘা পড়ায়

হৈ চৈ করিয়ে দিয়েছে, তাই এটা তেমন দুর্নীতি নয়—এ যুক্তি যদি কেউ দেখান তাহলে আমি তা মানতে রাজি নই। বাঙ্গালী ছেলেরা চুরি করলেও তা চুরি। যারাই দুর্নীতি করুক তাদের চরম সাজা হওয়া উচিত।

কাশীবাবুর আরও একটা জিনিস বোধ হয় মনে রাখা উচিত, ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটের মত একটা দুর্নীতির ডিপোর কর্তা হয়ে আর যাই করা যাক একই সঙ্গে রামনাম ও মস্কো-নামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো যায় না। ওরা দু-পক্ষই প্রচুর ক্ষমতাবান এবং অত্যন্ত কৌশলপন্থী। একদিকে শালিমার গুদামের কাপড় বাজেয়াপ্ত করব, ডি আই রুলে রামনামদের হাত থেকে ডাল কেড়ে নেব, আর একদিকে সি পি আই-র বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাব—ফ্রী-স্কুল স্ট্রীটের মন্ত্রী হয়ে এভাবে চলা অত্যন্ত কঠিন।

৬ই জুলাই, ১৯৭৩।

রাজ্যের বন্ধ্যা অর্থনীতিতে প্রাণ আনতে হবে

নেতিবাচক রাজনীতি আবার যেন পশ্চিমবংলাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। বন্‌ধ, ধর্মঘট এবং 'চলবে না'-র রাজনীতি আবার এ রাজ্যে ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। যেখানে জনসাধারণ আশা করেছিলেন 'কর্মযজ্ঞ' সুরু হবে, সেখানে ধীরে ধীরে আবার যেন '-কুকর্ম-যজ্ঞের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হচ্ছে। এতদিন আমরা ছিলাম মারামারি খুনোখুনী নিয়ে শংকিত, এখন তৎসহ চুরি জুয়াচুরির প্রশ্নটাও প্রবল হয়ে উঠেছে। ভূষি থেকে আরম্ভ করে সার পর্যন্ত নানা কেলেঙ্কারীর ঘটনা ও রটনা নিয়ে আসর গরম। সব মিলিয়ে রাজ্যের আবহাওয়াটা আবার বেশ খারাপের দিকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে রাজ্যের আসল অবস্থাটা কী? সাধারণ মানুষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে চরম বিপদগ্রস্ত। বাজারে গেলে পাগল হওয়ার অবস্থা হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রত্যেকটা জিনিসের দাম আগুন, শহরে রেশনে চাল কমেছে, গ্রামে বহু এলাকায় সংশোধিত রেশন দেওয়াই হয় না, বেকার ছেলেরা "হা চাকরী' 'হা চাকরী' করে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সেদিন এক বামপন্থী নেতা হাসতে হাসতে বলছিলেন: আট দশ মাস আগেও ভাবতে পারিনি আবার আসরে নামার এমন সুযোগ এত তাড়াতাড়ি পাব। লোকের মুড দেখে তখন ভয় হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম মিটিং মিছিল করাই যাবে না। তা, সিদ্ধার্থবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের হাল ফেরাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দীর্ঘজীবি হোন, আরও অন্তত বছর দুয়েক

থাকুন, আরও ঘন ঘন দিল্লী যান, আরও বেশি করে নিজের সর্ব-ভারতীয় ইমেজ তৈরীর চেষ্টা করুন—আমরা তাঁকে আরও বেশি করে আশীর্বাদ করব।

সত্যিই, মাস আট দশ আগেও কোনও বামপন্থী নেতা ভাবতে পারেন নি এত তাড়াতাড়ি এমন সুযোগ পাবেন। কর্মযজ্ঞের আবহাওয়াটাকে কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস সরকার এমনভাবে হেলায় হারাবে পশ্চিমবঙ্গের কোনও হিতাকাঙ্ক্ষী তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

অথচ দেখুন, এই রাজ্যকে নতুন করে গড়ার জন্য, এই পশ্চিমবঙ্গে একটা কর্মযজ্ঞ সুরু করার জন্য রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদ একটা সুন্দর পরিকল্পনা তৈরী করেও দিয়েছিলেন।

তাঁরা বলেছিলেন, একটা সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচী নেওয়া যাক। দশ হাজার একর করে জমি নিয়ে সেই এলাকার সার্বিক উন্নতির ব্যবস্থা করা যাক। চাষবাস, পশুপালন, ছোট ছোট শিল্প স্থাপন--সব কিছুর ব্যবস্থা করে প্রত্যেকটা অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুরু করে দেওয়া যাক।

তাঁরা হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, এইভাবে ১৫ বছরের মধ্যে গোটা রাজ্যের চেহারা ফিরে যাবে। ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গ। বেকারী সম্পূর্ণ দূর হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গে। গ্রামে গ্রামে মাসে বিশ দিন খেতে-না-পাওয়া রুগ্ন কঙ্কালসার মানুষ আর ঘুরবে না। শহরে শহরে চাকুরীপ্রার্থী ছেলেরা আর ঘুরে বেড়াবে না। চাকরীর জন্য, ভিক্ষার জন্য, ফুটপাথে ফল বা খেলনা বেচার জন্য বাঙ্গালীকে আর এই মহানগরীতে ভিড় করতে হবে না।

তাঁরা আরও বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমাদের সীমিত সম্পদ অথচ প্রচণ্ড প্রয়োজন, তাই সর্বত্র হিসাবমত সম্পদের সদ্‌ব্যবহার প্রয়োজন। বিজলির তার টানব অথচ বিজলি দেব না, কোথাও

জল দেব অথচ সার দেব না, কোথাও জল ও সার দেব অথচ জিনিসপত্র বিক্রীর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দেব না, কোথাও পাম্প সেট দেব অথচ তা খারাপ হলে সারাবার ব্যবস্থা থাকবে না এ করলে চলবে না। যেখানে জল দেব সেখানে সারও দেব, সেখানে পাম্প চালাবার বিজলি দেব, সেখানে পাম্প সারাবার ব্যবস্থাও করে দেব, সেখানে ছোট ছোট শিল্পেরও ব্যবস্থা করব, সেখানে পশুপালনের ব্যাপারেও সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দেব, সেখানে বাজার করব, পথঘাটও করব। উদ্দেশ্য, যাতে সবকিছুর পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়, যাতে গোটা সমাজ সমস্ত সম্পদ নিয়োগের পূর্ণ উপকার পায়।

এইভাবে তারা ধাপে ধাপে এগোতে চেয়েছিলেন। যাতে উৎপাদন বাড়ে, বেকারী দূর হয়, দারিদ্র্য কমে, রাজ্যের প্রত্যেকটা মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পায়।

আশ্চর্য এমন একটা সুন্দর পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করেও কিছু করলেন না। প্রথম যখন পরিকল্পনা পর্ষদ পরিকল্পনাটা দিলেন তখন মুখ্যমন্ত্রী ধন্য ধন্য করলেন। সব সভা-সমিতিতে বললেন, এই কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে আমরা রাজ্যে নতুন কর্মযজ্ঞ সুরু করব, আমরা রাজ্যের অর্থনীতির মরাগাঙে বান ডাকাব।

কিন্তু হায়, ওই পর্যন্তই। এখন সেই পরিকল্পনা ঠাণ্ডা ঘরে। এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৩৪টা অঞ্চলে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ সুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আসলে একটাও সুরু হয় নি। এখন সরকার বলছেন, তিনটার কাজ পরীক্ষামূলকভাবে সুরু করা যেতে পারে। সেই তিনটা সুরু হওয়ার কথাও আজ মাস চার পাঁচ হল। শুধু শোনাই যাচ্ছে। কখনও শোনা যায়, এবার কমিটি হয়েছে। কখনও শোনা যায় এবার বাজেট বরাদ্দ হল। কখনও শোনা যায় এবার প্রোজেক্ট রিপোর্টের জন্যর কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। কখনও শোনা যায়, একটা স্বতন্ত্র কোম্পানী হচ্ছে। কিন্তু

ব্যস, ওই পর্যন্ত। নীটফল, এতদিনে যেখানে ৩৪টা অঞ্চলে কাজ স্বরু হওয়ার কথা ছিল সেখানে একটারও কাজ স্বরু হয় নি।

আসল কথা হল, আমাদের উৎপাদন বাড়া চাই। উৎপাদন যদি না বাড়ে তাহলে রাজ্যের লোকের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হতে পারে না, বেকারি কমতে পারে না, জিনিসপত্রের দামও নামাতে পারে না। যে করেই হোক আমাদের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষি উৎপাদন শিল্প উৎপাদন দুই-ই বাড়াতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি আরও একটা বিশেষ কারণে প্রয়োজন। এই বিশেষ কারণটা হল, গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে। একদিকে রাজ্যে লোকসংখ্যা বাড়ছে, আর একদিকে অর্থনীতি পিছিয়ে যাচ্ছে। এই পশ্চিমবাংলাকে বলা হয় শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য। সেই রাজ্যে ১৯৪৯-৫০ সনের শিল্পোৎপাদনকে যদি ধরা হয় ১০০ তাহলে ৭১-৭২ সনের শিল্পোৎপাদন হল ৯৪.৩। অর্থাৎ ২০-২১ বছরে শিল্পোৎপাদন এখানে বাড়েনি, কমেছে। আমাদের সাতপুরুষের ভাগ্য শিল্পোৎপাদন যেভাবে কমেছে কৃষি-উৎপাদন সেভাবে কমে নি। বরং বেড়েছে। রাজ্যের ১৯৪৯-৫০ সনের কৃষি-উৎপাদনকে যদি ধরা হয় ১০০ তাহলে ৬১-৭২ সনের উৎপাদন হল ১৬৮.৮০। কিন্তু এই বৃদ্ধিও প্রয়োজনের তুলনায় তেমন বৃদ্ধি নয়। কারণ ১৯৪৯-৫০ সনেই আমাদের কৃষি বেশ অনুন্নত ছিল। দেশবিভাগের আগে বাংলার পূর্বাঞ্চলই ছিল কৃষিপ্রধান।

সবটা মিলিয়ে যদি ধরেন তাহলে গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট উৎপাদন বেড়েছে প্রায় শতকরা ৩৮ ভাগ। অর্থাৎ, বছরে শতকরা ৩.৮ ভাগ বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় ২ ভাগ। স্বুতরাং, প্রতিবছর আমাদের অর্থনীতি এগিয়েছে শতকরা মাত্র ১.৮ ভাগ। এর উপর তো আছে বন্যা। দশ বছরে বন্যায়ও অনেক শত কোটি টাকার উৎপাদন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

এই বন্ধ্যা অর্থনীতিতে প্রাণ আনতে হবে। তা যদি না আনা যায় তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। জিনিসপত্রের উৎপাদন যদি না বাড়ে আর বাজারে যদি কালো এবং সাদা দুই টাকারই পরিমাণ বাড়ে তাহলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বেই। স্বয়ং ভগবানও আমাদের অর্থনীতিতে তা আটকাতে পারবেন না। আর, অর্থনীতি যদি না অগ্রসর হয় তাহলে চাকরী-বাকরির সুযোগও বাড়তে পারে না। কিছু লোককে মাইনে দেওয়ার জন্য টেবিল চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি যুক্ত না হয় তাহলে তার ফলও ভয়াবহ হতে বাধ্য।

তাই, পশ্চিমবঙ্গের বাঁচার একমাত্র উপায় উৎপাদন বৃদ্ধি—কৃষি এবং শিল্প দুই ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি আজ একান্ত আবশ্যক।

আমাদের সীমিত সম্পদ নিয়ে সেই উৎপাদন বৃদ্ধি কীভাবে কত তাড়াতাড়ি করা যায় সেই পরিকল্পনাই তৈরী করেছেন রাজ্য পর্ষদ। সেই পরিকল্পনার মূল কথাই হল অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা।

সিদ্ধার্থবাবু এবং সাত্তার সাহেব সব ব্যাপারে এত দ্রুত কিন্তু এই অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যাপারে কেন জানি না তাঁরা শামুকের চেয়েও মন্থর। আমাদের সকলের তাই প্রধান কাজ হওয়া উচিত এই দুই শম্বুককে চালু করা—বন্‌ধ করে কাউকে চালু করা যায় না। বন্‌ধ করে অন্য অনেক উদ্দেশ্য সফল হতে পারে, কিন্তু রাজ্যের সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হবে না। সে জন্য প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি।

১৩ জুলাই, ১৯৭৩।

ভুষি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক

কাশীকান্ত মৈত্র আবার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রী আবার সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে আবার সেই পুরনো যুক্তি তুলে ধরেছেন। তাঁর সেই এক কথা—যদি কাশীবাবুর প্রস্তাব মত বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হয় তাহলে ভুষি কেলেঙ্কারীতে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নানা গোপন তথ্য জেনে ফেলবেন এবং তাতে তাঁদের সুবিধা হবে।

প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী প্রথমে যখন বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছিলেন আমি তখনই তা সমর্থন করেছিলাম। বলেছিলাম: খাদ্য দফতর সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিভাগীয় তদন্ত না হলে সব তথ্য প্রকাশ অসম্ভব। এবং জন স্বার্থেই খাদ্য দফতর সম্পর্কে ও ভুষি কেলেঙ্কারী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য প্রকাশিত হওয়া উচিত।

বিধানসভায় কাশীবাবুর দাবি এবং মুখ্যমন্ত্রীর জবাব শোনার পরও আমি আমার আগের মত এতটুকু পাল্টাই নি। আমি এখনও মনে করি, একটা পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন। এবং কলকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিই সেই বিচারপতির নাম ঠিক করে দিন যিনি এই তদন্ত পরিচালনা করবেন।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রয়োজন নানা কারণে।

প্রথমত, এই মামলায় ছোট-বড় এত রাজনৈতিক নেতা জড়িত যে কোনও পুলিশী তদন্তে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে না। পুলিশ অফিসারদের আমি খুব দোষ দেই না। তাঁরাও এই সমাজেরই মানুষ। যদি তদন্ত করতে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে খুব বড় বড়

নেতারাও এই ব্যাপারে জড়িত তাহলে তারা কিছুটা ভয় পেতে বাধ্য। আজকাল একজন ডি সি বা একজন ডি আই জি সরকারী দলের কজন মন্ত্রী বা নেতাকে চটাতে সাহস পেতে পারেন?

দ্বিতীয়ত, পুলিশ পরিচালিত মামলায় সরকারী প্রভাব থাকতে বাধ্য। মুখ্যমন্ত্রী যতই বলুন, আমি পুলিশকে নির্ভয়ে এগোতে বলেছি, পুলিশের পক্ষে নির্ভয়ে এগোনো সম্ভব নয়। ধরুন, দেখা গেল দু-তিনজন খুব নামকরা মন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা ও নেত্রী এই ব্যাপারে জড়িত। পুলিশ পারে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে তাঁদের গিয়ে ধরতে বা তাঁদের নাম প্রকাশ্যে টেনে আনতে?

তা যদি পারত তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রীর 'নির্ভয়ে এগোবার হুকুমের পর এতদিনে বেশ কয়েকজন নামজাদা লোকের নাম পুলিশ বলত। কিন্তু কই, তা তো বলে নি!

আর, তা যদি পারত তা হলে পুলিশ আগেও এ ব্যাপারে এগোতে পারত। খাদ্য দফতরের ভূষির যতটা পারমিট এবার ইস্যু হয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে তার প্রত্যেকটার একটা করে কপি এনফোর্সমেনট পুলিশে যেত। কই, পুলিশ তো মাসের পর মাস একটা লোককেও ধরে নি! কাগজে হইচই হল, নেতারা বিপাকে পড়লেন, তারপর ধরাধরি শুরু হল।

পুলিশ কেন এগোয় নি? কেন এতদিন চুপচাপ বসে ছিল?

দুটো কারণ ছিল: (এক) পুলিশ ভয়ে কিছু করতে পারে নি। পুলিশ দেখেছিল, যে-ব্যক্তি এই কেলেঙ্কারীর নাটের গুরু সে কলকাতার একটি ক্ষমতাবান বাড়ির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। যখন তখন সেই বাড়ির কর্তার শয়নকক্ষ পর্যন্ত চলে যায়। সেই বাড়ির কর্ত্রী তার "বউদি"। পুলিশ তাই সব জেনেও ভয়ে প্রথমে এগোয় নি। এবং (দুই) পুলিশের দু-একজনও এই বেওসা থেকে কিছু পেত। পুলিশের সবাই না হলেও অনেকেই কিছু পেলে চুপচাপ থেকে যায়। বিশেষ করে যেখানে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা জড়িত।

তাই, এতবড় কেলেঙ্কারীর সবকিছু শুধু পুলিশ দিয়ে উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগীয় তদন্ত। অবসরপ্রাপ্ত ভালমানুষ নয়, জবরদস্ত বিচারপতি দিয়ে তদন্ত। যিনি কাউকে ভয় না পেয়ে সব সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এগিয়ে যাবেন।

তৃতীয়ত, শুধু তো ভুষি নয়, খাদ্য দফতরের সব কিছু জানার জন্যই এই তদন্ত প্রয়োজন। খাদ্য দফতর একটা দুর্নীতির দুর্গ। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার জড়িত। বছরের পর বছর ধরে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কত পাপ জমেছে তার কোনও হিসেব নেই। এত পাপ কীভাবে জমলো, কীভাবে এই পাপ ওখানে শক্ত ঘাঁটি গড়লো, কীভাবে তাকে দূর করা যায়, কীভাবে পাপ ও পাপীদের জব্দ করা যায়—এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে একমাত্র বিচার-বিভাগীয় তদন্তে। পুলিশ পরিচালিত ভুষির মামলায় তা সম্ভব নয়।

ধরুন প্রভুদয়াল গুপ্তের প্রসঙ্গ। এই ব্যক্তি ভুষির মামলায় কোনও বে-আইনী কাজ করেছেন কিনা তা বলবে আদালত। মামলা চলছে। তাই আমি এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না।

কিন্তু প্রভুদয়াল গুপ্তের পরিবার সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে খাদ্য ও সরবরাহ দফতর থেকে এত কিছুর এত পারমিট লাইসেনস পেল কী করে তা কি শুধু ভুষির মামলায় বের হতে পারে? প্রভুদয়াল গুপ্ত-পরিবার নবগঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠান কোল মাইনিং অথরিটি থেকে অতবড় কয়লার লাইসেনস পেল কোন্ 'বউদির' জোরে তা কি ভুষির মামলায় বের হতে পারে? এবং এই 'বউদিটি' বা কেন প্রভুদয়ালের প্রতিই শুধু এত দয়ালু হন সে তদন্ত করার সাহস কি পশ্চিমবঙ্গের কোনও পুলিশ অফিসারের হতে পারে?

এইসব প্রশ্নের জবাব 'বেরিয়ে' আসতে পারে একমাত্র একটা নির্ভীক বিচার বিভাগীয় তদন্তে। একমাত্র তাহলেই জানা যেতে পারে ব্যবসায়ীরা কীভাবে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটকে গ্রাস করে রেখেছে।

এবং একমাত্র তাহলেই ফ্রি স্কুল স্ট্রিটকে ব্যবসায়ীদের কবলমুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এতে সমাজের জনসাধারণের এবং সরকারের সকলেরই লাভ হয়। পাপীরাও কিছুটা ভয় খায়। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পাপ একেবারে বন্ধ না হোক কিছুটা কমে। যেমন লাইফ ইনসিওরেনস করপোরেশনের শেয়ার কেনা-বেচার ব্যাপারে পাপ কিছুটা কমেছিল হরিদাস মুন্দ্রার ব্যাপারে প্রকাশ্য চাগলা তদন্তের পর। পুলিশি-মামলায় এ-জিনিস কিছুতেই হতে পারত না।

সিদ্ধার্থবাবু যে কারণে এই বিচার-বিভাগীয় তদন্তে আপত্তি জানিয়েছেন আমি তাও মানতে পারলাম না।

আগেও সাঁইবাড়ির তদন্তের ব্যাপার দেখিয়ে বলেছিলাম মামলা ও বিচার-বিভাগীয় তদন্ত একই সঙ্গে চলা বে-আইনী নয়। দেখলাম কাশীবাবু কলকাতা হাইকোর্টের রায় তুলে ধরে বিধানসভায় সেই কথাই বলেছেন।

সিদ্ধার্থবাবু তারপর বলছেন, বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হলে আসামীরা সব গোপন তথ্য জেনে ফেলবে।

এই যুক্তিও ধোপে টেঁকে না।

হরিদাস মুন্দ্রার যে সব কেলেঙ্কারী নিয়ে বিচার-বিভাগীয় তদন্তে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়েছিল সেইগুলির ব্যাপারেই হরিদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে বছরের পর বছর ধরে ফৌজদারী মামলা চলেছে। এবং তাঁর বহু মামলায় হরিদাস মুন্দ্রার কঠোর সাজা হয়ে গিয়েছে।

অত বড় ধুরন্ধরের অত কোটি কোটি টাকার মামলা যদি বিচার-বিভাগীয় তদন্তের প্রকাশ্য শুনানীতে ফেঁসে গিয়ে না থাকে তাহলে ভুষি কেলেঙ্কারীর মামলাটা তাতে ফেঁসে যাবে কেন? সে ভয়ের কারণ কী?

সাধারণত, এইসব জালিয়াতি জুয়াচুরির মামলার নজির যা সংগ্রহ করা হয় তা কাগজপত্রের নজির। সে নজির তো পুলিশের

হাতে। সেসব নজির বিচার-বিভাগীয় তদন্ত হলে নষ্ট হয়ে যাবে কেন? হরিদাস মুন্দ্রার অতগুলি মামলায় তো তা হয়নি।

আর, যদি অপকীর্তির নজির কাগজপত্রে থাকে তাহলে অভিযুক্তরা তা জেনে ফেললেই বা ক্ষতি কি? কাগজপত্রের প্রমাণ তারা নষ্ট করবে কী করে?

বিচার-বিভাগীয় তদন্ত ছাড়া এ-ব্যাপারে জনসাধারণকেও আশ্বস্ত করা যাবে না। নানা নাম শোনা যাচ্ছে এ-ব্যাপারে। এমন সব নাম যাঁদের পদমর্যাদা খাদ্যমন্ত্রীর চেয়েও বেশি। যদি মুখ্যমন্ত্রী বিচার-বিভাগীয় তদন্ত না হতে দেন, যদি সেইভাবে সব সত্য জনসাধারণকে জানতে না দেন তাহলে কিন্তু রটনা আরও বাড়বে।

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি নিয়ে রটনা প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে। শুধু রটনাও। দুর্নীতি দিন দিনই বাড়ছে। কালই আমাদের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে সিদ্ধার্থবাবুর এক অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর অপকীর্তির সংবাদ। এমনি নানা খবর শোনা যাচ্ছে আরও কয়েকজন মন্ত্রীর নামে। সর্বক্ষেত্রে প্রমাণ করার মত কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তা দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে না।

কিন্তু সংবাদপত্রে দুর্নীতির সংবাদ না বের হলেই মানুষের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকবে না তা নয়। যত চাপাচাপি হবে, তত রটনা বাড়বে। এবং যত রটনা বাড়বে ততই সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বাস কমবে ও হতাশা আসবে।

তাই, এই হতাশা এবং বিশ্বাসের অভাব যাতে জনমানসে না আসে তার জন্য প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ্য বিচার-বিভাগীয় তদন্ত। জনসাধারণকে সত্য জানতে দেওয়া হোক। যাতে মানুষের মনে সন্দেহ থাকতে না পারে সেই ব্যবস্থা করা হোক।

মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যবস্থাই করুন না। দিন না মানুষকে সব সত্য জানতে! বেরিয়ে আসুক না খাদ্য দফতরের সব পাপ! ঘুঘুর বাসাগুলি ভাঙুক! প্রভুদয়ালরা রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ কী করে হয় মানুষ তা জানুক না!

চাপাচাপির প্রয়োজন কী?

৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

কাজ না দেখিয়ে রাগ দেখালে পশ্চিমবঙ্গ এগুবে ?

মহামান্য সরকার বাহাদুর এবং প্রবল পরাক্রান্ত সরকারী নেতারা "এক শ্রেণীর সংবাদপত্রের" উপর ভীষণ চটিতং। এখন তাঁরা, প্রায়ই সভা-সমিতিতে এবং একান্ত আলাপ আলোচনায় এই এইসব সংবাদপত্রকে "সাবধান" করে দিচ্ছেন। বলছেন: তোমাদের চক্রান্ত জনগণ ধরে ফেলেছে। তোমরা যে চরিত্র হননের চেষ্টা করছ তাও আমরা বুঝে গিয়েছি। তোমরা সাবধান।

বহু পাঠক মহামান্য সরকার বাহাদুরের এবং প্রবল পরাক্রান্ত সরকারী দলের নেতাদের এইসব মন্তব্য শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। অনেকে আবার আশ্চর্যও। তাঁদের সকলেরই বক্তব্য: এ কেমন ব্যাপার মশাই, যাঁরা গণতন্ত্রের কথা বলেন তাঁরা সংবাদপত্রের সমালোচনা সম্পর্কে এমন অগণতান্ত্রিক মনোভাব দেখাচ্ছেন কেন ?

আমি অবশ্য এতে মোটেই আশ্চর্য নই। সামান্য একজন সাংবাদিক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা, বিপাকে পড়লেই আমাদের দেশের যে কোনও রাজনৈতিক দল এবং সরকার প্রথমেই আঘাতটা হানার চেষ্টা করেন সংবাদপত্রের উপর। যত তাঁদের বিপাক বাড়ে ততই সংবাদপত্রের উপর আক্রোশ বাড়ে।

সরকার বাহাদুরের এবং রাজনৈতিক দলগুলির এই প্রবণতা দিনকে দিনই বাড়ছে। ইংরেজিতে যাকে বলে "স্কেপ গোট" সেই বস্তু খোঁজার প্রবণতা দিনকে দিনই রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বাড়ছে।

১৯৬৫-৬৬ সনের কথা মনে আছে ? সেই খাদ্য সংকটের কথা ? সংবাদপত্রে সেই খাদ্য সংকটের খবর যেমনি বড় করে বের হওয়া সুরু হল অমনি প্রফুল্লচন্দ্র সেন চটলেন। "এক শ্রেণীর" সংবাদ

পত্রকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী "সাবধান" করে দেওয়া আরম্ভ করলেন। তারপর এল ১৯৬৭ সন। এল যুক্তফ্রণ্ট সরকার। যুক্তফ্রণ্টের নিজেদের ঝগড়া যত বাড়তে থাকল সংবাদপত্রের উপর ফ্রণ্ট নেতাদের ঝালও ততই বাড়তে আরম্ভ করল। একবার প্রফুল্ল ঘোষ পদত্যাগ করলেন। পরিকল্পনা মাফিক অন্যান্য ব্যবস্থা সেদিন হল না বলে তিনি সেই পদত্যাগপত্র আবার প্রত্যাহার করে নিলেন। খবরের কাগজগুলিতে সেই খবর বের হল। পরদিনই তৎকালীন প্রচার-মন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ি সব রিপোর্টারকে ডেকে বললেন: আপনারা এই সব আজগুবি খবর বানাচ্ছেন কেন বলুন তো? আপনারা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র করছেন কেন? তারপর এল ২ অক্টোবরের সেই ব্যাপার। অজয়বাবু ধরমবীর প্রফুল্ল সেনের পরিকল্পনা। সংবাদপত্রে আগাম তাও বের হল। অমনি অজয়বাবু লিখিত বিবৃতি দিলেন: এসব উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্ভট খবর। দশ পনেরো দিন পরে কিন্তু তিনিই প্রমাণ করে দিলেন সংবাদপত্রে যা যা বেরিয়েছিল সব সত্যি।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্টে আসুন দেখবেন একই জিনিস। সুরুতেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে ঝগড়া সুরু হল। অমনি প্রমোদ দাশগুপ্ত হুঙ্কার ছাড়লেন: সংবাদপত্রগুলি চক্রান্ত সুরু করেছে। এল সুধীন-কুমারের ঘটনা। সুধীনবাবু তাঁরই দলের দুই এম-এল-একে ব্ল্যাকমেল করে পদত্যাগ করিয়ে নিজে এম-এল-এ হয়ে মন্ত্রিত্ব রক্ষা করতে চাইলেন। অমনি সুধীনবাবু এবং তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক জ্যোতি বসু বললেন: এসব সংবাদপত্রের মিথ্যা রটনা। জ্যোতি-বাবুর নিজের সেই বি এম বিড়লার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতের খবর মনে আছে? মনে আছে তো যেসব সাংবাদিক সেদিন সেই বৈঠকের খবর ও ছবি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন জ্যোতিবাবু সেদিন তাঁদের উদ্দেশ্যে কী বলেছিলেন? মনে পড়ে সেদিন জনগণের গণতান্ত্রিক নেতা জ্যোতি বসু বলেছিলেন, এত বড় স্পর্ধা, আমাকে

ফলো করে। আমি যদি পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াতাম ?

উদাহরণ আর বাড়াবো না। মনে করার চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনারই এমন আরো বহু ঘটনা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, রাজনৈতিক দলগুলি, যাঁরা হাপুসনয়নে গণতন্ত্রের জন্য কাঁদেন তাঁরা কেমন যতই নিজেদের দোষে নিজেদের বিপদ বাড়িয়েছেন ততই কীভাবে সংবাদপত্রের উপর আক্রমণ বাড়িয়েছেন এবং নানা ধরনের চক্রান্ত আবিষ্কার করেছেন।

আমাদের বর্তমান মহামান্য সরকার বাহাদুর এবং সরকারী দলই বা সেই ধারা ভাঙবেন কেন তাঁরাও তাই যতই ব্যর্থতা বাড়ছে ততই সংবাদপত্রের উপর ক্ষেপে উঠছেন।

এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ক্ষোভের কারণ নেই। যত দেখবেন সরকার ও সরকারী দল সংবাদপত্রের উপর চটিতং ততই বুঝবেন ওদের বিপাক বাড়ছে।

এবার আসা যাক বর্তমান সরকার বাহাদুর এবং সরকারী দলের ক্ষোভের প্রসঙ্গে।

কী অভিযোগ ওদের ?

প্রথম অভিযোগ, ওরা ভীষণ কাজ করছেন, পশ্চিম বাংলাকে একেবারে রকেটের বেগে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অথচ সংবাদপত্র তা দেখাচ্ছে না। সংবাদপত্র শুধু ব্যর্থতাগুলি দেখাচ্ছে।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, ওরা কিছুই করছেন না, এটা কারুরই বক্তব্য নয়। গত দেড় বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী নানা খাতে মোট বেশ কয়েকশত কোটি টাকা খরচা হয়েছে। এর যদি অর্ধেকটাই চুরি বা অপব্যয় হয়ে থাকে তাহলেও তো নিশ্চয়ই কয়েক-শত কোটি টাকার কাজ হয়েছে।

কিছুই হচ্ছে কিনা প্রশ্ন তা নয়, প্রশ্ন হল: এই হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত, পাঁচ ছয় বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার আবর্তে বিধ্বস্ত

পশ্চিমবঙ্গে যতটা প্রয়োজন তার কতটুকু হচ্ছে? প্রশ্ন হল: রাজ্যের সাধারণ মানুষের মধ্যে যতটা সদিচ্ছা ছিল, প্রধানমন্ত্রী যতটা আগ্রহভরে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং তরুণ সমাজে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তার কতটা এই সরকার ও এই নেতৃত্ব সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন? প্রশ্ন হল: এই সরকার এবং এই নেতৃত্ব যেসব নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি কতটা প্রতিপালিত হয়েছে বা হচ্ছে? প্রশ্ন হল: সরকারী ও দলীয় কাজ-কর্মে যে নৈতিক মান রক্ষার কথা সুরুতে নেতারা বার বার ঘোষণা করেছিলেন তারই বা কতটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে?

এই কয়টি প্রশ্নের কথা তুলে সেদিন একজন মন্ত্রীকে সবিনয়ে বলেছিলাম: আপনারা দয়া করে এইসব প্রশ্নে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদেরই জবাব চান না। তাঁদেরই অভয় দিয়ে বলুন না, তোমরা যা যা মনে কর এইসব প্রশ্নে বল আমাদের, আমরা শুনব। দেখুন না আপনাদের দলের ছেলেরাই কী বলেন।

দেড় বছর আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার কলকাতা করপোরেশন হাতে তুলে নিলেন। সুন্দর শহর করে গড়ে তুলব এই কলকাতাকে। আজ কি তার হাল? দেড় বছর আগে যে কলকাতা ছিল আজ তার চেয়ে শহরের অবস্থা কতগুণে খারাপ? প্রায় সওয়া বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন দ্বিতীয় হুগলী সেতুর, ব্রিজের কাজ এতদিনে ক'ইঞ্চি এগিয়েছে? প্রায় একশ কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নে। কতটুকু উন্নতি হয়েছে এই এই ভগ্নপ্রায় শহরের? চল্লিশ হাজার ছেলে গত ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও সরকারী দফতরে চাকরী পাবে বলা হয়েছিল। আর একটা ডিসেম্বর প্রায় এসে গেল। এখনও ওর মধ্যে কহাজার ছেলের চাকরী পাওয়া বাকি জানাবেন কি? বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে শত শত নতুন শিল্প গড়ে উঠবে। গত দেড় বছরে কটা নতুন শিল্পের জন্য ক'খানা ইট পড়েছে জবাব দেবেন? বলেছিলেন, আগামী

ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ হাজার নতুন গ্রামে বিজলী যাবে এবং সেই বিজলীতে ৩৫ হাজার টিউবওয়েল চাষের জন্য জল তুলবে? ক'টা গ্রামে আসলে বিদ্যুৎ গিয়েছে, ক'টা টিউবওয়েল সেই বিদ্যুতে চালু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে যেনতেন প্রকারেণ শুধু খুটা আর তার টানার জন্য কত কোটি টাকা খরচা হয়েছে একবার সেই হিসাবটা দেবেন কি? বলেছিলেন, সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনা বা সি এ ডি পি চালু করে গ্রাম বাংলার চেহারাই পাল্টে দেব। এতদিনে ৩৪টা অঞ্চলে কাজও সুরু হওয়ার কথা ছিল। দেড় বছরে একটা অঞ্চলেও কাজ আরম্ভ হয়নি কেন জানাবেন কি?

আবার বলছি, আপনারা করেননি কিছুই, একথা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু, আপনারাই ভেবে দেখুন তো এই রাজ্যকে বাঁচাবার প্রয়োজনের তুলনায়, এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের একান্ত তাগিদের বিচারে এই রাজ্যের ভগ্নপ্রায় অর্থ-নীতিকে আবার শক্ত পায়ে দাঁড় করাবার জন্য এখনও পর্যন্ত আপনারা কতটা করতে পেরেছেন?

হয়ত বলবেন, চেষ্টা তো করছি, করব কি, পদে পদে যে বাধা, তাই তেমন এগোনোই যাচ্ছে না।

বাধা কোন কাজে না আসে? প্রতিবন্ধক কোথায় না দেখা দেয়? সেই বাধা দূর করে এগিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কার? আর, যিনি চেষ্টা করেও বাধা দূর করতে পারেন না, কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন না লোকে তাঁকে কী বলে?

আমি তো জানি ভদ্র ভাষায় তাঁকে বলা হয় অক্ষম। আর চলতি বাংলায় বলা হয় অপদার্থ।

দ্বিতীয় অভিযোগ চরিত্র হননের।

কোনও দুর্নীতির মুখোস খুলে ধরা চরিত্র হনন? অন্যায়? ভূষি কেলেঙ্কারীর ব্যাপারটা যে এত ব্যাপক, সংবাদপত্রে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না হলে কোনও দিন তা প্রকাশিত হত? শিল্প দফতর কোনও কাজ

করছে না, পৌর দফতর সম্পূর্ণ ব্যর্থ, বিদ্যুৎ দফতরের অপদার্থতায় রাজ্যে যা শিল্প আছে তারও নাভিশ্বাস উঠছে, খাদ্য দফতর ব্যবসায়ী ও মজুতদার-জোতদারদের অবাধ লুণ্ঠন প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছে—এসব বলা চরিত্র হনন? এসব বলা অন্যায়? কোনও মন্ত্রী দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, কোনও মন্ত্রী ব্যক্তিগত বিলাসব্যসনের জন্য সরকারী-অর্থের অপচয় করবেন, কোনও মন্ত্রী সরকারী পদ মর্যাদা দেখিয়ে বিভিন্ন পাওনাদারকে ঠকাবেন, কোনও মন্ত্রী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট খুলে রাজনীতি করার জন্য হাঙ্গর ভাঙ্গরদের কাছ থেকে গাড়ি ও পয়সা সংগ্রহ করবেন—এসব বললেই চরিত্রহনন করা হয়ে যাবে?

ব্যক্তিগতভাবে কোন্ নাগরিক কী করলেন তা নিয়ে জনসাধারণের কোনও মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়ই। কিন্তু যদি কোনও "পাবলিক ম্যান" বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁর পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে কোনও অন্যায় বা অসংগত কাজ করেন তাহলে তাও বলা যাবে না? সেক্ষেত্রেও চুপ করে থাকতে হবে? তা বললেই হয়ে যাবে ষড়যন্ত্র করা? হয়ে যাবে চরিত্রহনন?

কেন? মহামান্য সরকার বাহাদুর তাতে বিপদে পড়েন বলে?

মহামান্য সরকার বাহাদুর ও প্রবল প্রতাপান্বিত সরকারী দল যদি এতই স্পর্শকাতর হন তাহলে নিজেদের ঘরটা ঠিক রাখলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়। যদি ওদের ঘরের মধ্যে কোনও অন্যায় কোনও পাপ কোনও পাপী বাসা বেঁধে না থাকে তাহলে বাইরের লোক মিথ্যা ক'দিন চিৎকার করতে পারে? আর, ঘরে যদি পাপ ও পাপী থাকে তাহলে কিন্তু বাইরের লোকের মুখে কুলুপ এঁটেও তার প্রকাশ আটকানো যাবে না। সংবাদপত্র সে সংবাদ না ছাপলেও তা প্রকাশিত হবেই।

২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

॥ শেষ ॥